ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন

আল্লামা ইকবাল

আল্লামা ইকবাল সংসদ

ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন

আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল

IQBAL ACADEMY PAKISTAN ★ LAHORE ★

আল্লামা ইকবাল সংসদ

ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন
আল্লামা ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল

প্রকাশনা কমিটি
এডভোকেট মুজীবুর রহমান (চেয়ারম্যান)
ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
মীর কাসেম আলী
সৈয়দ তোসারফ আলী
ড. আবদুল ওয়াহিদ (সম্পাদক)

প্রথম প্রকাশ (বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ১৯৫৭)
তৃতীয় প্রকাশ (ইফাবা ২য়) : জুন ১৯৮৭
চতুর্থ প্রকাশ (আইস ১ম) : জানুয়ারী ২০০৩

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

প্রকাশনায়
আল্লামা ইকবাল সংসদ
৩৮০/বি মিরপুর রোড (৩য় তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা। ফোন : ৮১২৫১৮৮

মুদ্রণ
ক্যান্ডিড প্রিন্টিং প্রেস
ফকিরাপুল, ঢাকা

মূল্য : একশ' পঞ্চাশ টাকা মাত্র

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
Library
29703
LAHORE

ISLAMEY DHARMIYO CHINTAR PUNARGATHAN
Bengali version of 'Reconstructon of Religious Thought in Islam'
Written by Allama Dr. Muhammad Iqbal
and published by Dr. Abdul Wahid, Secretary Genarel, Allama Iqbal Sangsad,
380/B Mirpur Road (2nd Floor) Dhanmondi, Dhaka. Phone : 8125188
January 2003

Price : Taka 150.00, U S $ 10.00

অনুবাদ সম্পাদক

অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ

সম্পাদনা সহযোগী

অধ্যাপক সাইদুর রহমান এম. এ.

অনুবাদ ও অনুবাদক

'ভূমিকা', 'মানুষের খুদী : তার আযাদী ও অমরতা', 'ইসলামী ব্যবস্থায় গতিশীলতার নীতি' ও 'ধর্ম কি সম্ভব?'

কামালউদ্দীন খান এম. এস. সি.

'জ্ঞান ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা' ও 'দর্শনের চোখে প্রত্যাদেশমূলক ধর্মীয় অভিজ্ঞতা'

মোহাম্মদ মোকসেদ আলী এম এ

'আল্লাহ সম্বন্ধে ধারণা ও ইবাদতের মর্ম'

অধ্যাপক সাইদুর রহমান এম. এ.

'মুসলিম তমদ্দুনের মর্মকথা

আবদুল হক এম. এ.

আমাদের কথা

আল্লামা ইকবালের প্রধান পরিচয় কবি না দার্শনিক হিসেবে, এ নিয়ে সহজেই প্রশ্ন তোলা যায়। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হওয়ায় কবি হিসেবে তাঁর পরিচিতি যতটা ব্যাপক, দার্শনিক হিসেবে ততটা নয়। মূলত তিনি ছিলেন দার্শনিক এবং তাঁর কবিতায়ও দর্শন-চিন্তার ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

আধুনিক যুগে ইকবালকে ইসলামী দর্শনের প্রথম সার্থক ব্যাখ্যাতা বলে অভিহিত করা হয়। এ কথার যদি কোন তাৎপর্য থাকে, তবে স্বীকার করতেই হয়, 'রিকন্সট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম' গ্রন্থখানি তাঁর এই পরিচিতির মূল ভিত্তি। দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ এ গ্রন্থ অনুসন্ধিৎসু পাঠক ছাড়া বোঝা আসলেই কঠিন। গ্রন্থটি ইংরেজিতে লেখা। অত্যন্ত সহজ করে এর উর্দূ অনুবাদ করেছেন পাকিস্তানের ইকবাল বিশেষজ্ঞ ড. ওহীদ ইশরাত। আর পঞ্চাশের দশকে এই গ্রন্থের বাংলা তরজমা 'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন' প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বর্তমান বাংলা একাডেমী থেকে। ১৯৮১ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকেও এটি প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটি দীর্ঘদিন যাবৎ বাজারে না থাকায় ইকবাল ভক্ত এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকবৃন্দ আমাদেরকে গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ জানাতে থাকেন। পূর্ববর্তী অনুবাদটিই আমরা পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে পারায় শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

সূচীপত্র

প্রসঙ্গ কথা/দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	০০
ভূমিকা	০০
জ্ঞান ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা	১৫
দর্শনের চোখে প্রত্যাদেশমূলক ধর্মীয় অভিজ্ঞতা	৩৭
আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে ধারণা ও ইবাদতের মর্ম	৬৩
মানুষের খুদী : তার আযাদী ও অমরতা	৮৬
মুসলিম তমদ্দুনের মর্মকথা	১০৯
ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় গতিশীলতা	১২৫
ধর্ম কি সম্ভব?	১৫৩
পরিভাষা	১৬৮

প্রসঙ্গ কথা

এ উপমহাদেশে মহাকবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবালের আবির্ভাব সত্যিই এক দিক-দর্শনের মত। ইতোপূর্বে যে সব মহামানব ও মহামনীষী এদেশের বুকে জন্মগ্রহণ করে তাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন-তাঁরা প্রত্যেকেই মানব-জীবনের এক-একটা বিশিষ্ট দিক নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ও প্রচার করেছেন। ইস্‌লামী জীবনধারায় অতিমাত্রায় প্রত্যয়শীল আল্লামা ইকবাল জীবনের সকল দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সে আলোচনার ফল তাঁর বিভিন্ন রচনায় রেখে গেছেন।

তিনি ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ এবং মরমীবাদী। তাঁর চিন্তার ক্ষেত্র ব্যাপক ও গভীরতর ছিল বলে- প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর জীবনদর্শনের ফল রেখে গেছেন। এ উপমহাদেশের ইতিহাসে ইস্‌লামী চিন্তাধারার সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন শায়খ আহমদ সারহিন্দি। তিনি একদিকে আকবর প্রবর্তিত নানাবিধ বিদ'আতের বিরুদ্ধে যেমন সংগ্রাম করেছিলেন, তেমনি শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আলী আল্‌-আরাবী প্রবর্তিত 'হামা উস্ত' নামক মতবাদের বিকৃত রূপের বিরুদ্ধেও সত্যিকার ইস্‌লামী মতবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে- 'হামা আয্‌ উস্ত' নামীয় মতবাদের প্রবর্তন করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সময় শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী ইস্‌লামের তত্ত্বীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিক নিয়ে গবেষণা করে তার ফল প্রচার করেছেন। সে ক্রান্তিকালে তার মত মহামনীষীর আবির্ভাব না হলে এ উপমহাদেশে ইস্‌লামের যে কি দশা হত-তা কল্পনা করতেও শরীর শিউরে ওঠে।

তবে এ দু'জন মহামানবের চিন্তাধারা ইস্‌লামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন ধর্মের নানাবিধ ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ইস্‌লামের কোন তুলনামূলক আলোচনা করেননি। এঁরা দু'জনেই ইসলামী ভাবধারাকে পরিচ্ছন্ন করার জন্যে সাধনা করেছেন।

ইস্‌লামের ইতিহাসে-ইমাম আবু হামিদ আল্‌-গাযালী পূর্বেই পূর্বোক্ত ধারার প্রবর্তন করেন। মনীষার ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিত পূর্বে নানাদিক থেকেই ইস্‌লামের উপর প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষ আঘাত হানার চেষ্টা চলতে থাকে। মুসলিমগণ কর্তৃক সিরিয়া ও ইরান বিজিত হওয়ার পর থেকে, উত্তরদিক থেকে গ্রীক চিন্তাধারা এবং অপরদিক থেকে ভারতীয় চিন্তাধারা ইস্‌লামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। আব্বাসী খলীফা আবদুল্লাহ আল্‌-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খৃঃ) বাগদাদে একেডেমী অব্‌ সায়েন্সেসের প্রতিষ্ঠা করলে, মুসলিমেরা দেশ-বিদেশের চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে কতকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তার কারণও সুস্পষ্ট। গ্রীক চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তার কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও ইস্‌লামী চিন্তাধারার সঙ্গে তার কোন ঐক্যই নেই। গ্রীক ও ভারতীয় উভয় চিন্ত াধারায় জড়পদার্থকে চিরন্তন বলে ধারণা করা হয়েছে। গ্রীক চিন্তানায়কদের চিন্তার মধ্যে সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। জড় ও আকারের অথবা নির্বিশেষের সঙ্গে জড়ের সংযোগের ফলেই এ বিশ্বের সব কিছুর উৎপত্তি বলে এ্যারিস্টটল ও প্লেটোর ধারণা ছিল।

ভারতীয় চিন্তাধারায় সৃষ্টির অর্থ সমবায়। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের শেষে যখন এ জগতের উপাদানগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন সেগুলোকে পুনরায় বিন্যাস করারই অপর নাম সৃষ্টি। অথচ সবগুলো হিব্রুধর্মে সৃষ্টির অর্থ হচ্ছে শূন্য থেকে সৃষ্টি-Creation out of nothing। তেমনি মানব-জীবনে বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার করে তারই আলোকে এ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হওয়া ছিল গ্রীকদের লক্ষ্য। ভারতে বিচার-বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে বটে, তবে শুধুমাত্র বুদ্ধির দৌলতে সত্যিকার জ্ঞান-লাভ করা সম্ভবপর নয় বলেও ধারণা রয়েছে। বুদ্ধির প্রয়োগের পূর্বে মানব-অন্তরের মধ্যে বিরাজমান নানাবিধ অতীন্দ্রিয় শক্তির বিকাশকে অত্যাবশ্যক বলে ধারণা করা হয়েছে। তার ওপর স্বজ্ঞা বা intuition-কে জ্ঞানের কাজে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। ইসলামের ঐতিহ্য অনুসারে কিন্তু মানব-জীবনে বুদ্ধিই সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি নয়। মানব-জীবনে ইচ্ছা বা will-ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি ব্যতীত বোধি নামীয় অপর এক মাধ্যম রয়েছে, যার মাধ্যমে বিশ্বের সব বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মীয় সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এ স্বজ্ঞাকে সর্বপ্রথম প্রাধান্য দান করেন মনীষী প্লটিনাস। মধ্যযুগে তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে নানা আলোচনা হলেও আধুনিক যুগের সূচনায় তা একেবারে পটভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে স্পিনোজা ও শেলিং এবং অতি আধুনিককালে বের্গসোঁ ব্রাডলি ও ক্রোচো প্রমুখ চিন্তানায়কগণ এ স্বজ্ঞাকে জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

আধুনিক যুগের মানব-জীবনে ইচ্ছাশক্তির গুরুত্ব সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন আর্থার শোপেনহাওয়ার। তিনি এ বিশ্বের সর্বত্রই বেঁচে থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বা will to live-এর নিদর্শন পেয়েছেন। তার পরে জার্মান চিন্তাবিদ ফ্রিডরিশ নীট্‌শে সর্বজীবের মধ্যে শক্তিলাভের জন্যে ইচ্ছার ক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য করেছেন এবং তাকে সমর্থনও কুরেছেন। বিগত শতাব্দীতে আমেরিকার মনীষী উইলিয়াম জেমস আমাদের সবগুলো প্রত্যয়ের মূলে ইচ্ছার কার্যকারিতা আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতবাদ অনুসারে আমাদের মানসে বুদ্ধি নয়, ইচ্ছাই কার্যকরী। আমাদের নানাবিধ বিষয়ে ইচ্ছাই প্রত্যয়শীল করে তোলে।

স্থান-কাল সম্বন্ধেও নানা তর্কের উৎপত্তি হয়েছে। বৈজ্ঞানিক জগতে স্থান ও কালকে দুটো স্থিতি হিসেবে গণ্য করা হয়। অথচ এ স্থান ও কালের ধারণাকে কান্ট অভিজ্ঞতাপূর্ব মানসিক বিষয় বলে গণ্য করেছেন। কেবল স্থান ও কাল নয়, বস্তুর স্বরূপ নিয়েও বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মহলে নানা তর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সুদূর অতীতে বুদ্ধদেব বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার না করে, তাকে ঘটনার সমাবেশ বলতে চেয়েছেন। অতি-আধুনিককালে আলবার্ট আইনস্টাইনও বস্তু বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার না করে তাদের ঘটনা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আত্মা সম্বন্ধীয় ধারণায়ও পুরাকালের ও আধুনিক যুগের ধারণায় রয়েছে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। প্লেটো যে আত্মার ধারণা করেছিলেন তা ছিল শাশ্বত। এ মায়াময় পৃথিবীতে সে ছিল দেহের কারাগারে বন্দী। তাই যখন সেই শাশ্বত ধারণার রাজ্যের ছায়া তার কারাগারের দেয়ালে পড়ত তখন তার মনে সেই আনন্দলোকে ফিরে যাওয়ার জন্যে আকুল বাসনা দেখা দিত। শংকর মানবাত্মার ধারণাকে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাপ্রসূত বলে

বর্ণনা করলেও ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত জন্ম-জন্মান্তরের শৃঙ্খল থেকে তার মুক্তি নেই বলে মতবাদ প্রচার করেছেন। প্লেটো বা শংকর যে দেহ-নিরপেক্ষ আত্মার ধারণা করেছিলেন, বর্তমান যুগের সূচনায় তা দেকার্তে কর্তৃক প্রথম 'মন' নামক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তারপর স্পিনোজা তাকে তার সারসত্তার (Substance) একটা গুণরূপে ধারণা করেছেন। লেইবনীটজ এ বিশ্বের সর্বত্রই জীবাত্মার সমাবেশ আবিষ্কার করলেও তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ পরমাণুরূপে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে। তাদের প্রাতিভাসিক রূপ দেহের সঙ্গে তাদের কি সম্বন্ধ বর্তমান তা তিনি পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেন নি। কান্ট আত্মার, আল্লাহ্র ও জগতের ধারণার মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে বিধায় তাদের গঠনমূলক না বলে নির্ধারণমূলক বলে অভিহিত করেছেন। তবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা তুরীয়নীতি যে ক্রিয়াশীল, এ সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে আধুনিককালে ব্যবহারবাদীগণ (Behaviourists) আত্মাকে স্নায়ুরই একটা প্রতিক্রিয়া বলে অভিহিত করেছেন। তেমনি আল্লাহ সম্বন্ধে ধারণায়ও নানা মতবাদ দেখা দিয়েছে। এতে একথা সুস্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে, গাযালীর কাছে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল ইকবালের কাছে সে সমস্যাগুলো আরও জটিলরূপ ধরে দেখা দিয়েছে। গাযালী বৌদ্ধদের নির্বাণ ও ফান-াফিল্লাহ্র মধ্যে যে পার্থক্য, সমবায় ও শূন্য থেকে সৃষ্টির যে পার্থক্য, তা করতে ছিলেন ব্যস্ত। জড় পদার্থের চিরন্তন অবস্থিতিকে অস্বীকার প্রদর্শন করা যায় না, এবং দার্শনিকগণ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে জড়পদার্থকে প্রথমে আল্লাহ্র সৃষ্টি এবং পরবর্তীকালে চিরন্তন বলে ধারণা করাতে যে চিন্তার অসামঞ্জস্য রয়েছে তা প্রদর্শন করাতেই ছিলেন তিনি ব্যাপৃত। ইকবালের কাছে সমস্যা দেখা দিয়েছে চরম জটিলরূপে, এ জন্যে যে, আধুনিক যুগের সূচনা থেকে নানাবিধ অভিনব চিন্তা ও ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমস্যাগুলোকে জটিল থেকে জটিলতর পর্যায়ে ফেলে দিয়েছে। এসব ধারণার প্রতিফলন ইসলামের ওপর সুদূর-অতীতে যেমন হয়েছে, বর্তমান যুগেও তেমনি হচ্ছে।

কেবল তত্ত্বীয় জগতে নয়- রাষ্ট্রনীতির জগতেও নানাবিধ মতবাদ-যথা গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতি তন্ত্রের উৎপত্তি দেখা দিয়েছে। এগুলোর আলোকেই যে কোন রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও গতি সম্বন্ধে বিচার করা হয়। এগুলোও ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ধারণার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই ইকবাল এগুলো সম্বন্ধেও আলোচনা করে ইস্‌লামী জীবন-ধারার সঙ্গে এদের ঐক্য ও অনৈক্যের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারা আলোচনা করলে দেখা যায়, তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে একে একে আলোচনা করেছেন-

১. জ্ঞান ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, ২. দর্শনের চোখে প্রত্যাদেশমূলক ধর্মীয় অভিজ্ঞতা,

৩. আল্লাহ্ সম্বন্ধে ধারণা ও ইবাদতের মর্ম, ৪. মানুষের খুদী : তার স্বাধীনতা ও অমরতা, ৫. মুসলিম কালচারের মর্মমূল, ৬. ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মধ্যে গতিশীলতা, ৭. ধর্ম কি সম্ভব ?

উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক নানাবিধ মতবাদের সমালোচনা করে তিনি ইসলামী মতবাদের পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।

প্রথমত, জ্ঞানের রাজ্যে তিনি ইন্দ্রীয়জ জ্ঞান, যুক্তিলব্ধ জ্ঞান এবং স্বজ্ঞার ক্রিয়াশীলতা স্বীকার করে প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছেন যে, ইসলাম জ্ঞানের কোন পদ্ধতিকে তুচ্ছ

বলে পরিহার করতে চায় নি। বরং যে ইন্দ্রীয়জ জ্ঞানের ওপর আরোহ পদ্ধতির প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক-জগতে অনিবার্য- সে জ্ঞান লাভের জন্যে কুরআনুল-করীমে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। তেমনি যুক্তির ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে ধর্মীয় জ্ঞান লাভের পদ্ধতি হ'ল স্বজ্ঞা বা Intuition। সে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এ পদ্ধতিতে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পরস্পর থেকে ভিন্ন থাকে না বরং একই সত্তায় পরিণত হয়। এ জ্ঞানের বিষয়বস্তু প্রমাণ করার জন্যে কোন যুক্তি-তর্কের অবতারণা করার প্রয়োজন নেই। এ জ্ঞানের বিষয়বস্তু স্বতঃপ্রমাণ। প্রত্যাদেশ (revelation) এরূপ জ্ঞানের একটা রূপ।

দ্বিতীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনাকালে তিনি নানাবিধ মতবাদের আলোচনা শেষে আমাদের এ সিদ্ধান্তে উপনীত করেছেন যে, সারসত্তা যুক্তি দ্বারা পরিচালিত একটা সৃষ্টিধর্মী জীবনীশক্তি। এ জীবনীশক্তিকে আত্মারূপে ব্যাখ্যা করার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহকে মানুষের আকারে ধারণা করা হয়। এতে আমাদের অভিজ্ঞতার একটা অতিসহজ সত্যকে স্বীকার করে বলা হয়, জীবন উদ্দেশ্যবিহীন তরল পদার্থের মত গতিশীল নয়। এর বক্তব্য হল, জীবনে রয়েছে সমবায়মূলক এক ঐক্যের নীতির ক্রিয়াশীলতা এবং জীবন্ত দেহের সবগুলো প্রবণতাকে এ গঠনমূলক উদ্দেশ্যের জন্যে কেন্দ্রীভূত করে। দার্শনিক চিন্তার মধ্যে রয়েছে প্রতীক বা Symbolic character। এ জন্যে ধর্মীয় জীবনের এ মহান ভুয়োদর্শনকে দর্শন সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। তা সম্ভব হয় কেবলমাত্র স্বজ্ঞা দ্বারা এবং তার ভিত্তি হচ্ছে আমার কলব বা হৃদয়জাত উপলব্ধি।

তৃতীয় বিষয় সম্বন্ধে তিনি বলতে চেয়েছেন- দ্বিতীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমরা দেখতে পেয়েছি, এ জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে এক সৃষ্টিধর্মী যুক্তি দ্বারা পরিচালিত জীবনীশক্তি। অপরদিকে মানব-জীবনে রয়েছে অনন্তকালব্যাপী এ ধরণীতে রাজত্ব করার প্রবৃত্তি। অথচ মানুষ তার অভিজ্ঞতায় সততই মৃত্যুর ভয়াবহ দৃশ্য দেখে সর্বদাই বিচলিত হচ্ছে। এ জন্যে মানুষ সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করে অনন্তকালের বুকে অমরত্ব লাভ করতে চায়। তবে ব্যক্তিগত জীবনেই হোক অথবা সংঘবদ্ধ জীবনেই হোক এ নীরব পৃথিবী থেকে মানুষ কোন সহানুভূতি সূচক সাড়া পায় না বলেই অনন্ত-অসীম জীবনীশক্তি থেকে সে অমরত্ব লাভের জন্যে শক্তি কামনা করে। এ প্রার্থনার মধ্যে তার স্থিতির ইতিবাচক দিক ও নেতিবাচক দিক উভয়ই রয়েছে। যে ব্যক্তি প্রার্থনা করে সে তার নিজের অস্তিত্বের অসারতা ব্যক্ত করে সেই চরম ও পরম শক্তিশালী অনন্ত জীবনীশক্তির নিকট থেকে চরম ও পরম শক্তি কামনা করে।

মানবাত্মার স্বাধীনতা ও অমরত্ব সম্বন্ধে আলোচনাকালে তিনি বলতে চেয়েছেন-কুরআনুল করীমের মধ্যে কোন কোন আয়াতে পরিষ্কার-ভাবে এমন উক্তি করা হয়েছে যে, মানুষ আল্লাহর মনোনীত জীব, মানুষের মধ্যে নানা দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর প্রতিনিধি, মানুষ নানা বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও স্বাধীন সত্তা। তিনি আধুনিক দর্শনের নানা দিকপালের যুক্তি তাঁর এ মতবাদের সমর্থনে পেশ করেছেন। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় হল এই-মানবাত্মাকে আমরা যুক্তির দিক থেকে যতই অস্বীকার করি না কেন, তাকে অবশ্যগ্রহণীয় সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এ মানবাত্মার পথ প্রদর্শন ও পরিচালনা করার শক্তি থেকে প্রমাণিত হয়, মানবাত্মার স্বাধীনতা রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, মানবাত্মার পক্ষে অমরত্ব লাভ করার ক্ষমতা

আছে কি-না? ইকবাল কুরআনুল করীমের বিভিন্ন আয়াত থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, মানবাত্মার অমরত্ব তার কর্মফলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ কর্মফলের দরুনই আত্মা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় অথবা ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথে অগ্রসর হয়। এ জন্যে ব্যক্তিগত অমরত্ব লাভ আমাদের জন্মগত অধিকার নয়। এ অধিকার আমাদের কর্মফলের দ্বারা লাভ করতে হয়। অমরত্ব লাভ মানুষের জীবনের সর্বপ্রধান কামনার বিষয়। আমাদের সাধনার দ্বারা তা' লাভ করতে হয়।

মুসলিম সংস্কৃতির আলোচনাকালে তিনি বলতে চেয়েছেন-মুসলিম মনীষীগণ নানাভাবে চিন্তা করলেও বিশ্ব সম্বন্ধীয় চিন্তায় তাঁদের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। তাঁরা সকলেই এ বিশ্বে এক বিরাট ও বিপুল গতির নিদর্শন পেয়েছেন। মানব-জীবনের উৎপত্তিতেও তাঁরা একই ঐক্যসূত্র স্বীকার করেছেন এবং কালকে অতিশয় বিষয়ীমুখ সত্য বলে গণ্য করেছেন।

ইসলামের মধ্যে গতিশীলতা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে ইসলামী সমাজ জীবন কোনকালেই স্থানু নয়। এ জন্যে সে সমাজে নানা যুগে নানা আন্দোলন দেখা দিয়েছে। এ ইসলামী সংস্থার মধ্যেই যুক্তিবাদী মু'তাযিলারা যেমন দেখা দিয়েছেন, তেমনি মরমী-বাদী সূফীরাও দেখা দিয়েছেন এ যুক্তিসর্বস্ব মতবাদের বিরুদ্ধ পক্ষ হিসাবে। এ ধরনের নানাবিধ মতবাদের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার পরে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার আবির্ভাব হয় এবং তিনিই এসব মতবাদের উৎপত্তির মূলে যেসব বিদ'আত বা Innovation রয়েছে তার মূলোচ্ছেদে অগ্রসর হন। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে তাঁর পূর্ববর্তী চারটি মাযহাবের প্রদর্শিত নীতিকে সর্বশেষ ও চরমনীতি বলে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি। তিনিই ইজতিহাদের উপর সম্পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করে ইসলামী নীতিগুলোকে স্বীকার করে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের পুনরায় পাঠ করতে অগ্রসর হন। তার ফলে মুসলিম মানস পুনর্বার মুক্তিলাভ করে। তবে সর্বাবস্থায় এসব ধারণা কুরআনুল করীম বা হাদীস শরীফে বর্ণিত নীতিগুলোর পরিপন্থী হতে পারে না। তবে আপাতদৃষ্টিতে এ আন্দোলন মুক্তির আন্দোলনরূপে দেখা দিলেও অতীত সম্বন্ধে এতে কোন সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় এ আন্দোলনের হোতাগণ পরিশেষে হাদীসের ওপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হতে বাধ্য হন।

অপরদিকে তুর্কিতে যে স্বাদেশিক আন্দোলন দেখা দেয়, তার মূল মন্ত্র হল রাষ্ট্রকে ধর্মের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা। ওরা এ আদর্শ ইউরোপ থেকে গ্রহণ করেছে। এ আন্দোলনের নেতা হচ্ছেন কবি ও সমাজতত্ত্ববিদ্ জিয়া গক্-আল্প। অপরদিকে সাইদ হালিম পাশা ইস্লামের মধ্যে ভাববাদ ও বাস্তববাদ (Positivism)-এর সন্ধান পেয়ে ইস্লামের কোন বিশেষ স্বদেশ বা পিতৃভূমি রয়েছে বলে স্বীকার না করে তাকে সর্বদেশে কার্যকরী বলে গ্রহণ করেছেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, ইসলামী আদর্শকে কোন বিশেষ দেশে রূপায়িত করে ইরানী, তুরানী, বা ভারতীয় রূপ দান করলে তা' ইসলাম থেকে দূরে সরে যেয়ে এসব রূপ গ্রহণ করে। ইকবালের ধারণা, এতে জিয়া গকের মতবাদের সঙ্গে সাইদ হালিমের মতবাদের কোন বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। কারণ উভয় মতবাদই পরিণামে একইভাবে ফলপ্রসূ হয়। কারণ এভাবে ইস্লামের চর্চা হলে তা'তে ইস্লামের চেয়ে কোন বিশেষ দেশের রঙ অধিকতরভাবে ফলে ওঠে। ইকবালের মত হচ্ছে-আজকের দুনিয়ায় মানবতার দাবী হচ্ছে তিনটি, এ দুনিয়াকে এক আধ্যাত্মিক সত্তা হিসাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, ব্যষ্টির আধ্যাত্মিক সত্তার মুক্তি দিতে হবে এবং এমন

এক বিশ্বজনীন নীতি গ্রহণ করতে হবে যার কল্যাণে মানব সমাজের বিবর্তন একটা অধ্যাত্মিক ভিত্তিতে হবে। এ কথা অবশ্য সত্য যে, আধুনিক যুগে ইউরোপে এরূপ ধারায়ই অনেকগুলো ভাববাদী মতবাদ গঠিত হয়েছে। তবে মানব সভ্যতার অভিজ্ঞতায় এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, যুক্তি দ্বারা প্রত্যাদেশের মত মানুষের মনে প্রত্যয়ের সে আলোকে জ্বালানো যায় না। তাঁর মতানুসারে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি এমন এক সুদৃঢ় প্রত্যয় যে, মানুষ তার জন্যে অনায়াসেই জীবনপাত করতে প্রস্তুত হয়। ইস্‌লামের শৈশবাবস্থায় মুসলিমেরা জাহেলিয়ার আধ্যাত্মিক দাসত্বের মধ্যে বাস করেছে বলে ইস্‌লামের সত্যিকার স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে নি। আজকের দিনের মুসলিমদের পক্ষে তার প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি করা উচিৎ এবং তার সামাজিক জীবন পুনর্গঠন করা কর্তব্য। এতে তাদের পক্ষে ইস্‌লাম প্রদর্শিত মৌলিক নীতির আলোকে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হবে। এখনও অবশ্য ইস্‌লামের মূল উদ্দেশ্য যতটুকু ব্যক্ত হয়েছে তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, ইস্‌লামের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এ বিশ্বের বুকে একটা আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

সর্বশেষে আধুনিক যুগের একটা মস্ত বড় প্রশ্ন ইকবাল উত্থাপন করেছেন। তা হচ্ছে- এ যুগে কি ধর্মের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভবপর? প্রশ্নের মীমাংসার পূর্বে ইকবাল ধর্মীয় জীবনের অর্থের বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে তিনটি পর্যায় আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতবাদ অনুসারে প্রথম পর্যায়ে ধর্মীয় জীবনে রয়েছে অত্যন্ত জোরালো প্রত্যয়। ধর্মীয় জীবনের এ প্রবণতা সামাজিক জীবন গঠনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হতে পারে, তবে ব্যষ্টিজীবনের বৃদ্ধি বা প্রসারতার পক্ষে এ পর্যায় মোটেই অনুকূল নয়। এ পর্যায়ে ধর্মীয় নীতির কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করার পরে ধর্মীয় জীবনে দেখা দেয় সে অনুশীলনের মূল নীতির যথার্থ অনুসন্ধান। এ পর্যায়ে ধর্মীয় জীবন তার মূল নীতিকে দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তৃতীয় পর্যায়ে ধর্মীয় জীবনে মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা দেখা দেয় এবং ধর্মীয় জীবনের অনুশীলনে লিপ্ত মানুষের মনে সেই আদিম সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। এ পর্যায়েই ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবন ও শক্তি লাভের প্রবণতা দেখা দেয় এবং ব্যষ্টি তার ব্যক্তি-জীবনের স্বাধীনতা লাভ করে। ধর্মের এ তৃতীয় পর্যায় সম্ভবপর কি-না ইকবাল এখানে সে প্রশ্নই তুলেছেন এবং দেশ-বিদেশের নানা জ্ঞানীর মতবাদ নিয়ে আলোচনা করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ধর্মের পক্ষে আধুনিক যুগেও টিকে থাকা সম্ভবপর।

তাঁর এ বক্তৃতাগুলোর বক্তব্যের সার হচ্ছে এই-প্রত্যাদেশ বা revelation হচ্ছে স্বজ্ঞা নামক জ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায়। এ জ্ঞানের মাধ্যম আমাদের কলব বা হৃদয়। তার মাধ্যমেই আমরা এ জ্ঞানের মর্ম উপলব্ধি করতে পারি। এ জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক হচ্ছেন নবী মুরসালগণ। তাঁরাই এ জ্ঞানের আলোকে মানব-জীবনকে সুপথে পরিচালনা করেছেন। তাঁদের প্রত্যাদেশলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আমরা জানতে পারি, সতত ক্রিয়াশীল এক অনন্ত শক্তির দ্বারাই এ বিশ্বজাহানের সৃষ্টি। এ সৃষ্টি কিন্তু এক বিশেষ মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায়নি, অনন্তকালের অনন্ত ধারা বেয়ে সে সৃষ্টি গতিশীল রয়েছে। আমরা এ সৃষ্টির মধ্যে জড়পদার্থ বলে যে বিষয়কে গণ্য করি, তা প্রকৃতপক্ষে জড় নয়। তাকে অনন্ত প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি বলে তা' জড় বলে আমাদের কাছে প্রতিভাসিত হয়।

মানুষের সৃষ্টি হয়েছে বিবর্তনের এক ধারা বেয়ে এবং এ সৃষ্টিতে অর্থহীন অন্ধ কোন গতি নেই। এর মূল উদ্দেশ্য হ'ল এ জগতে আল্লাহর প্রতিনিধির উপস্থিতি। মানুষের জীবনে রয়েছে ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং মানুষ তার কর্মের দ্বারা আল্লাহর প্রতিনির্ধি হতে পারে। এ জন্যে মানুষের অমরত্ব লাভ মানুষের আয়ত্বের মধ্যে। কোন মানুষই জন্মগতভাবে অমর নয়, তাকে সাধনা করে অমরত্ব লাভ করতে হবে।

মানুষের পক্ষে ইস্‌লামী বিধান পালন করে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা উচিৎ। সে আদর্শ রাষ্ট্র গঠনকালে ভৌগোলিক বা ভাষাভিত্তিক কোন উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়ে চলা মানুষের পক্ষে উচিৎ নয়। কারণ তার ফলে মানবজাতিতে বহু বিভাগ দেখা দেবে। ইস্‌লামের মহান বিধানগুলোর ভিত্তিতে এবং ইজতিহাদের আলোকে মানব-জীবনে নানা যুগে পুনর্বিন্যাস দেখা দেবে, তাতে কোন সঙ্কীর্ণ মনোভাব যেন কোনদিনই না আসে।

ধর্মের প্রত্যয়শীলতা বা তার সপক্ষে যুক্তির অবতারণা তার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের রূপ। তৃতীয় পর্যায়ে ধর্মের রাজ্যে জ্ঞাতা সে আদিম সত্তার সঙ্গে একীভূত হতে চায়। এ পর্যায়েই জ্ঞাতা তার জীবনের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করে।

মহাকবি ইকবালের গভীর পাণ্ডিত্য ও সারা জীবনের সাধনালব্ধ ভূয়োদর্শনের সার রয়েছে এ পুস্তকের মধ্যে। তাই একে এ-যুগের মুসলিম জীবনের পথপ্রদর্শক এক মহাগ্রন্থ বলা চলে। ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাগুলো তথা এ মহাগ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধের অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন বাংলাদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্বজ্জন। ইকবাল-দর্শনের মর্ম গ্রহণে এ অনুবাদ নিশ্চয়ই সার্থক হবে বলে আমার ধারণা।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

ভূমিকা

পবিত্র গ্রন্থ কুরআন নিছক 'আদর্শ-প্রীতি'র চেয়ে 'কর্মে'র ওপরই বেশী জোর দিয়েছে। অবশ্য ধর্মীয় বিশ্বাস মূলত যে বিশিষ্ট প্রকারের সুগভীর জীবন্ত চেতনার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, অনেক মানুষের পক্ষে তা সত্যিকারভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া আজকের মানুষের চিন্তারীতি বাস্তবমুখী। অবশ্য ইসলাম নিজেও তার সাংস্কৃতিক জীবনের প্রথম দিকে বাস্তবমুখিতাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিল। আজকের মানুষ ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে সন্দেহ করে আরো এই জন্যে যে, সে অভিজ্ঞতা অলীক বা ভ্রান্ত হতে পারে। অবশ্য মুসলিম সূফীদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় ধর্মীয় অনুভূতির ক্রমবিকাশকে প্রকৃত রূপ এবং গতি-নির্দেশ দেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট কাজ করে গেছেন; কিন্তু তাঁদের পরবর্তীরা আধুনিক মন সম্বন্ধে অবজ্ঞার দরুন বর্তমানকালের চিন্তা-ভাবনা ও অভিজ্ঞতাবলী থেকে কোন নতুন প্রেরণা লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম রয়ে গেছেন। এমন সব রীতি-নীতিকে তাঁরা চিরন্তন মনে করে আঁকড়ে ধরে আছেন, যেগুলোর উদ্ভাবন হয়েছিল আমাদের আজকের সংস্কৃতি থেকে অনেকাংশে পৃথক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে : 'তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুজ্জীবন একটিমাত্র আত্মার সৃষ্টি ও পুনরুজ্জীবনের ন্যায়'। এ বাক্যে যে জৈবিক ঐক্যের উল্লেখ রয়েছে তাকে প্রাণবন্তরূপে বুঝতে হলে আজকের বাস্তবাশ্রয়ী মনের জন্য শরীর-তাত্ত্বিক বিচার-প্রণালীর চেয়ে বেশী প্রয়োজন মনস্তাত্ত্বিক বিচার-প্রণালী। যেখানে সে রকম বিচার-প্রণালীর অভাব সেখানে স্বভাবতঃই ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বিজ্ঞানসম্মত রূপ চাওয়ার দাবী উঠবে। এই বক্তৃতাবলীতে আংশিকভাবে হলেও আমি সে দাবী পূরণের চেষ্টা করেছি। এতে আমি মুসলিম দার্শনিক ঐতিহ্যের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখে এবং বর্তমান জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মুসলিম ধর্মীয় দর্শনকে পুনর্গঠনের প্রয়াস পেয়েছি। এ কাজের জন্যে বর্তমান সময়ই বিশেষভাবে উপযোগী। প্রাগাধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান আজ নিজেরই ভিত্তিমূলের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে আরম্ভ করেছে। এর ফলে গোড়াতে তার যে ধরনের বস্তুবাদের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, তা দ্রুত অন্তর্ধান করেছে। সেদিন অধিক দূরে নয় যখন ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে অনেক অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্রে নবতর মিলনভূমি আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, দার্শনিক চিন্ত াজগতে পরিপূর্ণতা কখনই আসতে পারে না। জ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে চিন্তাধারার নতুন নতুন পথ যখন খুলে যাবে, তখন আজ আমি যা বলছি তার থেকে ভিন্ন, এমনকি তার চেয়ে অধিকতর যুক্তিসহ মতামত উদ্ভাবিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মানুষের চিন্তাধারার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি এবং তার সম্বন্ধে একটি স্বাধীন সমালোচনামূলক মনোভাব রক্ষা করে চলা।

এক

জ্ঞান ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা

আমরা যে বিশ্বে বাস করি, তার চরিত্র ও স্বরূপ কি? এ বিশ্ব চরাচরের আবয়িক সংগঠনে কি কোন নিত্যস্থায়ী উপাদান আছে? আমাদের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? আর আমরা এ জগতের যে স্থানটি অধিকার করে আছি, আমাদের কোন্ ধরনের কাজ তার উপযুক্ত? ধর্ম, দর্শন এবং উচ্চাঙ্গের কাব্যের এটাই হল সাধারণ জিজ্ঞাসা। কিন্তু কাব্যিক প্রেরণা যে জ্ঞানের আলো দান করে, তার প্রকৃতি একান্তই ব্যক্তিগত, আর এই জ্ঞান রূপক, অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। ধর্ম তার অধিকতর প্রাগ্রসর চিন্তার জন্যে কাব্যকে অতিক্রম করে এবং ব্যক্তির গণ্ডি ছাড়িয়ে সমাজের গণ্ডিতে উপনীত হয়। পরম সত্যের প্রতি এর যে দৃষ্টিভঙ্গি, তাতে ধর্ম মানুষের সসীমতাকে অস্বীকার করে এবং মানুষের সেই দাবীকে বাড়িয়ে দেয় এবং এ সম্ভাবনাকে মেনে নেয় যে, মানুষ সেই সত্যের নিকটবর্তী হতে পারে। তা হলে জিজ্ঞাসা, দর্শনের নিছক যুক্তিবাদ ধর্মে প্রয়োগ করা চলে কি না?

দর্শন শাস্ত্রের মোদ্দা কথাই হচ্ছে মুক্ত জিজ্ঞাসা। যাবতীয় সনাতন বিধি-নিষেধের কর্তৃত্বকে দর্শন সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। মানুষের চিন্তাজগতে যেসব অন্ধ ধারণা থাকে, সেই সকল ধারণার গোপন উৎস ও আশ্রয়স্থানগুলো খুঁজে বের করাই দর্শনের কাজ। এইভাবে খোঁজ করতে করতে দর্শন এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে পারে যে, পরম সত্তা বলে আদৌ কিছু নেই; আর যদিও বা থাকে, তবে নিছক যুক্তির মাধ্যমে তাকে বুদ্ধিগোচর করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে ধর্মের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে ঈমান; বুদ্ধির মোহমুক্ত এই ঈমান পাখীর মতো তার সামনে চেয়ে দেখে বন্ধনহীন পথ। ইসলামের মহান মরমী কবির ভাষায়, বুদ্ধি মানুষের জীবন্ত চিত্তের পথ আগলে তার অন্তর্নিহিত অদৃশ্য সম্পদ কেড়ে নেয়। তথাপি এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ঈমান নিছক অনুভূতির চেয়ে বড়। ঈমানে খানিকটা জ্ঞানাত্মক উপাদানও রয়েছে। ধর্মের ইতিহাসে বুদ্ধিবাদী ও মরমবাদী- এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অস্তিত্ব দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, ধর্মের যা মূল বস্তু, আইডিয়া হচ্ছে তার অন্যতম। এ ছাড়াও অধ্যাপক হোয়াইটহেডের সংজ্ঞানুযায়ী ধর্ম তার মতবাদের দিক দিয়ে কতগুলো সাধারণ সত্যের বিন্যাস, যা অকপটভাবে পালন এবং তীব্রভাবে অনুধাবন করলে চরিত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এখন যেহেতু ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের ভেতর ও বাইরের জীবন-প্রবাহের রূপায়ণ ও নিয়ন্ত্রণ, সেই জন্য ধর্মের মূল সাধারণ সত্যগুলো সম্বন্ধে কোন কিছু অমীমাংসিত না থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। অন্যথায় সংশয়যুক্ত নীতির উপর ভিত্তি করে কেউই জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে সাহস পেত না।

বস্তুত, ধর্মের যা আসল কাজ সে হিসেবে তার মূল নীতি বিজ্ঞানের নীতির চেয়েও দৃঢ়তর যুক্তির উপর সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞান যুক্তিবাদী তত্ত্বদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে; প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান এ-ই এতদিন করে আসছে। মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় যেসব দ্বন্দ্ব দেখা যায়, তাদের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টাকে ধর্ম উপেক্ষা করতে পারে না; আর যে পরিবেশের মধ্যে মানুষকে জীবন যাপন করতে হয়, তারও সমর্থন না করে পারে না। সে জন্যেই সূক্ষ্মদর্শী অধ্যাপক হোয়াইটহেড মন্তব্য করেন : 'ধর্মের যুগ যুক্তিবাদেরই যুগ'। কিন্তু ধর্মকে যুক্তির গণ্ডিতে নিয়ে আসার অর্থ এই নয়, দর্শনের স্থান ধর্মের ঊর্ধ্বে বলে স্বীকার করা। ধর্মকে বিচার করার অধিকার দর্শনের আছে বটে; কিন্তু ধর্ম-ব্যাপারে দর্শনের যা বিচার্য তার প্রকৃতি এমন যে, সে বিষয়কে কেবল ধর্মের নিজ শর্ত মুতাবিকই বিচার করা চলে, অন্য কোন পথে তা দর্শনের আওতায় আসে না। ধর্মের বিচারকালে দর্শন তার তথ্যসমূহের মধ্যে ধর্মকে নিম্নতর স্থান দিতে পারে না। ধর্ম কোন বিভাগবিশেষের ব্যাপার নয়, ধর্ম সমগ্র মানুষেরই একটি অভিব্যক্তি। কাজেই ধর্মের মূল্য নির্ধারণে দর্শনকে স্বীকার করতেই হবে যে, ধর্মই সকলের কেন্দ্রস্থল; এবং চিন্তাজগতে সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় ধর্মকে কেন্দ্রিক গণ্য করা ছাড়া দর্শনের গত্যন্তর নেই। আবার চিন্তা ও স্বজ্ঞাকে পরস্পরবিরোধী ভাববারও কোন কারণ নেই। একই মূল থেকে উভয়ের উৎপত্তি এবং উভয়ে পরস্পরের পরিপূরক। এদের একটি সত্তাকে খণ্ড-খণ্ডভাবে উপলব্ধি করে আর অপরটি করে সমগ্রভাবে। ধর্ম তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সত্তার চিরন্তন রূপের উপর, আর দর্শন তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সত্তার অনিত্য রূপের উপর। ধর্ম চায় সমগ্র সত্তার আশু উপলব্ধি, আর দর্শন চায় সমগ্র সত্যকে উপলব্ধির জন্যে তাকে ধীরে-সুস্থে খণ্ড-খণ্ডভাবে পর্যবেক্ষণ করতে। উভয়েই নব নব শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। উভয়েই একই সত্তার দর্শন অভিলাষী, যা তাদের জীবনের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। বার্গসঁ যথাযথই বলেছেন যে, স্বজ্ঞা অন্য কিছু নয়- তা হল উন্নত ধরনের বুদ্ধি।

ইসলামের মতবাদসমূহ যুক্তির দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার যে সাধনা, তা শুরু হয় স্বয়ং রসূলুল্লাহর সময় থেকে। তিনি অহরহ প্রার্থনা করতেন : 'আল্লাহ্! সব জিনিসের চরম স্বরূপ সম্পর্কে আমায় জ্ঞান দাও।' এরপর আসেন পরবর্তী যুগের মরমী ও অমরমী যুক্তিবাদীগণ। এঁদের সাধনার অবদান ইসলামের তামদ্দুনিক ইতিহাসের এক পরম শিক্ষণীয় অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামের ভাবধারাসমূহ সুসামঞ্জস্য ও সুসংবদ্ধ করতে এঁরা একাগ্রভাবে চেষ্টা করেছিলেন। এদের সাধনার কথা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়। এঁদের লেখার মধ্যে একটি অকুণ্ঠ নিষ্ঠা যেমন প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি সে যুগের সব ধর্মীয় দোষ-ত্রুটিও প্রকাশ পেয়েছিল। এর ফলে সে যুগে যেসব ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল তার কোনটিই সম্যক ফলপ্রসূ হতে পারেনি।

আমরা সকলেই জানি, মুসলিম তমদ্দুনের উপর গ্রীক-দর্শন একটা বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু আমরা যদি সতর্কতার সঙ্গে কুরআন এবং গ্রীক-দর্শন প্রভাবিত বিভিন্ন

ধর্মমতের আলোচনা করি তা হলে দেখতে পাব যে, গ্রীক-দর্শন একদিকে মুসলিম চিন্তানায়কদের দৃষ্টিভঙ্গিকে যেমন বহুল পরিমাণে প্রসারিত করেছিল, অন্যদিকে কুরআন সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিকে রেখেছিল তেমনি আচ্ছন্ন করে। সক্রেটিসের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল শুধু মানব জগতের উপর। তাঁর কাছে মানুষের বিচারই ছিল মানুষের স্বরূপ বুঝবার প্রকৃষ্ট উপায়। মানুষের মহিমা বিচার করতে তিনি গাছপালা, কীটপতংগ এবং গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি। সত্যি, কুরআনের সংগে এ দৃষ্টিভঙ্গির কী আকাশ-পাতাল পার্থক্য! একটি ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকার মধ্যেও কুরআন দেখতে পায় এক ঐশী প্রেরণার আধার। পাঠকদের উদ্দেশে কুরআন প্রতিনিয়ত এই তাগিদ দিচ্ছে : 'তোমরা বাতাসের নিরন্তর গতি পরিবর্তন ও দিন-রাত্রির নিয়মিত আবর্তন লক্ষ্য কর; বিচিত্র মেঘমালা, নক্ষত্র খচিত আকাশ ও অসীম শূন্যে সন্তরমান গ্রহসমূহ অবলোকন কর।' যেমন ছিলেন সক্রেটিস তেমনি ছিলেন তাঁর শিষ্য প্লেটো। ইন্দ্রিয় অনুভূতির উপর ছিল তাঁর গভীর অবজ্ঞা। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা শুধু কতকগুলো ধারণাই সৃষ্টি হতে পারে, সত্যিকারের কোন জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়।

কিন্তু কুরআন বলেছে কি? আল্লাহর দানসমূহের মধ্যে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান। দুনিয়াতে এরা যা কিছু করবে তার জন্য আল্লাহর কাছে এদের জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু গোড়ার দিকের মুসলমানেরা কুরআন পাঠ করলেও কুরআনের এই ভাবাদর্শ তাঁদের মর্মগোচর হয়নি। আর হবেই বা কি করে? গ্রীক চিন্তাধারা তাঁদের উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, গ্রীক চিন্তার আলোকে তাঁরা কুরআন পাঠ করতেন। কুরআন যে মূলত প্রাচীন মতবাদসমূহের বিরোধী, মুসলমানদের এই সত্য সম্যক উপলব্ধি করতে ২০০ বছরেরও বেশী সময় লেগেছিল। যদিও সে উপলব্ধিও সম্যকরূপে স্পষ্ট ছিল না, তবুও এতেই মুসলমানদের মননজগতে দেখা দিয়েছিল একটা বিদ্রোহ। অবশ্য আজ পর্যন্তও সে বিদ্রোহের মর্ম পূর্ণরূপে উপলব্ধ হয়নি। কতকটা এই বিদ্রোহের জন্যে এবং কতকটা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে গাযালী ধর্মকে দার্শনিক সংশয়বাদের উপর স্থাপন করলেন, যা ধর্মের জন্য নিরাপদ ভিত্তি নয় এবং কুরআনের মর্মাদর্শ যা অনুমোদন করে না। গাযালীর প্রধান বিরোধী ছিলেন ইবনে রূশ্‌দ্। ইবনে রূশ্‌দ্ এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গ্রীক-দর্শনকে সমর্থন করলেন। এরিস্টটলের মতবাদের দ্বারা তিনি এতখানি প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন যে, জগত-আত্মার অবিনশ্বরতার মতবাদেও তিনি বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। এই মতবাদ এক সময় ফ্রান্স ও ইতালীর মননজগতের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু আমার মনে হয়, মানবাত্মার মূল্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে কুরআনের যে অভিমত, এটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই ইসলামের একটা মহান ও ফলবান ভাবাদর্শ ইবনে রূশদের কাছে অনধিগম্যই রয়ে গেল এবং ভুল করে তিনি এমন একটি নিস্তেজ জীবনদর্শনের উদ্ভবে সাহায্য করলেন, যা মানুষকে তার নিজের, তার স্রষ্টার এবং বিশ্ব সৃষ্টির সম্বন্ধে রাখে অন্ধ করে। আশারীয় চিন্তানায়কদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন

অপেক্ষাকৃত সৃষ্টিধর্মী, তাঁরা নিঃসন্দেহে সঠিক পথেই ছিলেন এবং ভাববাদের কতকগুলো অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপের আভাসও তাঁদের দর্শনে পাওয়া যায়। তবে মোটের উপর আশারীয় আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল গ্রীক যুক্তি-তর্কের সাহায্যে শুধু গোঁড়া সনাতন মতবাদসমূহকে সমর্থন করা আর মুতাজিলাদের ধারণায়, ধর্ম ছিল শুধু কতকগুলো নীতিবাদের সমষ্টি। ধর্মকে তাঁরা একটা প্রাণবন্ত বাস্তব হিসেবে কিছুতেই গ্রহণ করতে চাইলেন না। পরম সত্তায় পৌছতে চিন্তার অতীত যেসব উপায় রয়েছে, সেসবের দিকে তাঁরা খেয়ালই করলেন না। ফলে তাঁদের হাতে ধর্ম শুধু কগুলো যুক্তি-সর্বস্ব ধারণায় পর্যবসিত হল। এবং ধর্মের প্রতি তাঁদের যে মনোভাবের সৃষ্টি হল, তা ধর্মের প্রতি নিছক আস্থাহীনতারই শামিল। জ্ঞানের রাজ্যে, তা বিজ্ঞানেরই হোক বা ধর্মেরই হোক, বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই সম্পূর্ণ বর্জন করে চিন্তা যে সম্ভব নয় তা তাঁরা বুঝতেই পারেন নি।

তবে এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মান দার্শনিক কান্টের মতো গাযালীর ব্রতও প্রায় বাণী-বাহকের ব্রতের সমতুল্য ছিল। আমরা জানি, জার্মানীতে যুক্তিবাদের উদ্ভব হয়েছিল ধর্মের সহায়ক হিসেবে। কিন্তু যুক্তিবাদী দর্শন অচিরেই বুঝতে পারল যে, ধর্মের যেটা বিধি-ব্যবস্থার দিক সেটা কার্যত প্রমাণ করা যায় না। কাজেই সে দর্শনের পক্ষে ধর্মশাস্ত্রের ডগ্‌মাভিত্তিক বিধি-ব্যবস্থাগুলোর একেবারে পরিহারের পথই শুধু খোলা ছিল। আর ডগ্‌মাকে বিদায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক বিধান সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দিল তাকে হিতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলা চলে। এইভাবে যুক্তিবাদ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা দূরের কথা, অবিশ্বাসের রাজত্বকেই তুলল কায়েম করে। জার্মানীতে ধর্মীয় চিন্তার যখন এই অবস্থা, তখনই হল দার্শনিক কান্টের আবির্ভাব। তিনি লিখলেন 'ক্রিটিক অব পিয়োর রিজন' নামক একটি অমর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি দেখালেন যে, মানুষ যে যুক্তির এত বড়াই করে, তার ক্ষমতা একান্ত সীমাবদ্ধ। তাঁর সমালোচনার ফলে যুক্তিবাদীদের সমস্ত যুক্তি ও সিদ্ধান্ত ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কাজেই কান্টকে তাঁর দেশের প্রতি আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম দান বলে আখ্যায়িত করা খুবই ঠিক হয়েছে।

ইসলামী জগতে ইমাম গাযালীর দার্শনিক সংশয়বাদও অনুরূপ বিপ্লবাত্মক। জার্মানীর কান্ট-পূর্ব যুগের ন্যায় ইসলাম জগতেও যুক্তিবাদ এমন একটা রূপ নিয়েছিল, যার মূলে ঔদ্ধত্য ছিল প্রচুর, কিন্তু গভীরতা ছিল না আদৌ। এহেন যুক্তিবাদের মূলে ইমাম গাযালী হানলেন দুর্বার আঘাত। তবু ইমাম গাযালী ও কান্টের মধ্যে রয়েছে একটা মতপার্থক্য। কান্ট আল্লাহ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের সম্ভাবনাকে স্বীকার করতে পারেন নি। এর জন্য দায়ী তাঁর অনুসৃত চিন্তাপদ্ধতি। গাযালী দেখলেন যে, যুক্তি-তর্ক বা বিশ্লেষণী চিন্তার দ্বারা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের আশা বৃথা। তাই তিনি শুষ্ক চিন্তার সাহারা থেকে মরমী সুলভ অভিজ্ঞতার বাগিচায় হিজরত করলেন। সেখানে তিনি ধর্মের স্বাধীন সত্তার সন্ধান পেলেন। এইরূপে তিনি বিজ্ঞান ও তত্ত্বশাস্ত্রের নির্ভরতা ছাড়াই ধর্মের বেঁচে থাকার

অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ইমাম গাযালী তাঁর মরমী অভিজ্ঞতার আলোতে প্রত্যক্ষ করলেন গোটা অসীমের রূপে। এ থেকে এই ধারণা তাঁর মনে শিকড় গেঁড়ে বসলো যে, মানুষের চিন্তাশক্তি একান্ত সীমাবদ্ধ, তা কোন চরম সিদ্ধান্তে পৌছতে অসমর্থ। তাই তিনি চিন্তা এবং স্বজ্ঞার মধ্যে টানলেন একটা স্পষ্ট বিভেদ রেখা। কিন্তু চিন্তা এবং স্বজ্ঞার যে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে তা তিনি ধরতে পারলেন না। এটাও তিনি খেয়াল করতে পারলেন না যে, যেহেতু পর পর চলমান সময়ের সঙ্গে চিন্তা অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, সেই জন্যেই মনে হয় চিন্তা অসীমও নয় আর তা কোন সিদ্ধান্তেও আসতে পারে না। কিন্তু চিন্তা যে একান্তই সসীম ও সেই জন্যে তার পক্ষে অসীমের উপলব্ধি যে সম্ভব নয়, এরূপ মনে করার কারণ হচ্ছে জ্ঞানের জগতে চিন্তার গতি সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা। যথেষ্ট যুক্তির ভিত্তিতে বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত না হলে মনে হয় জগতে পরস্পরবিরোধী বস্তুর অভাব নেই এবং তাদের মধ্যে ঐক্য বিধানেরও সম্ভাবনা নেই। তখন স্বভাবত সন্দেহ হয় যে, বুদ্ধি কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পারে না। এমনকি যুক্তিগত বুদ্ধির দ্বারাও এই বৈচিত্র্যকে আমরা একটা সুসংবদ্ধ বিশ্বরূপে দেখতে পাই না। যুক্তি-আশ্রিত বুদ্ধির দ্বারা বস্তুনিচয়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা যে আমরা একেবারেই করতে পারি না, এমন নয়। পারি, তবে বিভিন্ন বস্তুর সাদৃশ্যকে অবলম্বন করে মাত্র। কিন্তু সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা আমরা করতে চাই তা একটা কাল্পনিক ঐক্য মাত্র। এর দ্বারা বিভিন্ন বাস্তব বস্তুর সত্তা প্রভাবিত হয় না। তবে চিন্তা যখন তার গভীর স্তরে প্রবাহিত হয়, তখন সে চিন্তা অন্তর্নিহিত অসীমে পৌছতে সমর্থ, যে অসীমের আত্মবিকাশ পথে অসীম ধারণাসমূহ কতকগুলো মুহূর্ত মাত্র। কাজেই চিন্তার আসল ধর্ম স্থিতিশীল নয়; বরং এটা একান্তরূপে গতিশীল। প্রথম থেকেই বীজের মধ্যে সমগ্র বৃক্ষের সম্ভাবনা বর্তমান থাকে, কালক্রমে বৃক্ষের বিভিন্ন অঙ্গ আত্মপ্রকাশ করে; তেমনি কালপ্রবাহের চিন্তা তার অন্তর্নিহিত অসীমতা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করে। সুতরাং আত্মপ্রকাশের দিক দিয়ে চিন্তা গতিশীল ও অখণ্ড; কালের বিভিন্ন অংশে খণ্ড-খণ্ডভাবে এর বিকাশ; এই বিভিন্ন বিকাশের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বিচার না করলে চিন্তার সামগ্রিক ধারণা করা কঠিন। এদের আলাদা আলাদা নিজস্ব সত্তা হিসেবে কোন তাৎপর্য নেই; এদের আসল তাৎপর্য পাওয়া যাবে সমগ্রের ভেতর। কারণ, এরা এই সমগ্রেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তিমাত্র। এই বৃহত্তম সত্তা হচ্ছে কুরআনে উল্লিখিত 'লওহে মাহফুয' বা সংরক্ষিত ফলকের মত; এই ফলকে জ্ঞানের অনির্দিষ্ট সম্ভাবনার সমস্তই বর্তমান আছে; এই বর্তমান সম্ভাবনার বিকশিত স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্যে চিন্তা ক্রমিককালের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে আত্মপ্রকাশ করে। এই সসীম ধারণাসমূহের লক্ষ্য হচ্ছে সেই ঐক্যে পৌছান, যে ঐক্যটি গোড়া থেকেই তাদের মধ্যে নিহিত আছে। বস্তুত, জ্ঞানের অগ্রগতিতে সমগ্র অসীমতার অস্তিত্ব বর্তমান আছে বলেই মানুষের সসীম চিন্তা সম্ভব হয়ে ওঠে। কান্ট ও গাযালী কেউ এটা লক্ষ্য করেন নি যে, চিন্তা জ্ঞানে রূপান্তরিত হওয়ার পরেই তার সসীমতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। প্রকৃতিতে যেসব সসীম জিনিস আছে তা পরস্পরের বাইরে, কিন্তু চিন্তার বিভিন্ন বিকাশ তেমন

নয়। আসলে চিন্তা কোন সীমারেখা মেনে চলতে পারে না। নিজের স্বাতন্ত্র্যের সংকীর্ণ আবর্তে আবদ্ধ থাকা চিন্তার ধর্ম নয়। এর বাইরে যে বিপুল জগত বিদ্যমান, তার কিছুই এর অনাত্মীয় নয়। যার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই বলে মনে হয়, তারই জীবনে ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ দ্বারা চিন্তা তার সসীমতার সীমাকে ধ্বংস করে দেয় এবং তার অন্তর্নিহিত অসীমতাকে উপলব্ধি করে। চিন্তার গতি এই জন্যেই সম্ভব যে, এর অন্তরে অসীম লুকিয়ে থেকে এর অনন্ত অভিযানের অনুপ্রেরণা সরবরাহ করে। চিন্তাকে সসীম মনে করা ভুল; কারণ, চিন্তার অঙ্গনেই হয় অসীমে ও সসীমে অভিবাদন বিনিময়।

গত পাঁচশ' বছর ধরে ইসলামে ধর্মীয় চিন্তা একরূপ গতিহীন হয়ে আছে। অথচ এমন একদিন ছিল, যখন ইউরোপীয় চিন্তাধারা প্রেরণা পেয়েছিল মুসলিম জাহান থেকে। আধুনিক ইতিহাসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হচ্ছে এই যে, আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে মুসলিম জাহান পাশ্চাত্য জগতের দিকে খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এতে অবশ্যই অন্যায় কিছু নেই, কারণ জ্ঞান-সাধনার দিক দিয়ে ইউরোপীয় সংস্কৃতি হচ্ছে ইসলামী তমদ্দুনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রূপেরই উন্নততর বিকাশমাত্র। আমাদের একমাত্র ভয় হচ্ছে, পাছে বা শুধু ইউরোপীয় সংস্কৃতির বাইরের চাকচিক্য আমাদের গতি আটকে ফেলে, আর তার আসল মর্মস্থানে পৌঁছতে বা আমরা হই অসমর্থ। কয়েক শতাব্দী ধরে যখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ছিল আচ্ছন্ন ও নিষ্ক্রিয় হয়ে, তখন ইউরোপীয় চিন্তানায়কগণ চিন্তা করেছেন সেই বড় বড় সমস্যা নিয়ে, যার সমাধানে মুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরাও ছিলেন গভীর আগ্রহশীল। মধ্যযুগের মুসলিম ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন মাজহাব চূড়ান্তরূপ লাভ করেছিল। তখন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার জগতে সাধিত হয়েছে অশেষ অগ্রগতি। প্রকৃতির উপর মানুষের শক্তি প্রসারিত হয়েছে, তাতে মানুষের মনে হয়েছে এক নতুন বিশ্বাসের সঞ্চার। যেসব শক্তির সমন্বয়ে তার পরিবেশ রচিত, তার উপর প্রাধান্যের এক নব বোধের উন্মেষ ঘটেছে। নতুন নতুন মতবাদের হয়েছে উদ্ভব, পুরনো সমস্যাগুলো নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে হয়েছে পুনর্বর্ণিত এবং বহু নতুন সমস্যা দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে। মনে হয়, মানুষের বুদ্ধি যেন তার সবচেয়ে মৌলিক তত্ত্বগুলো, যথা- স্থান, কাল ও কার্য-কারণকে যাচ্ছে অতিক্রম করে।

বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ধারার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধীয় ধারণারও ঘটেছে পরিবর্তন। আইনস্টাইনের মতবাদ বিশ্বের এক নতুন রূপ খুলে ধরেছে আমাদের সামনে, আর ধর্ম ও দর্শনের সাধারণ সমস্যাগুলো বিচারের নতুন নতুন পথের দিয়েছে ইশারা। কাজেই এশিয়া এবং আফ্রিকায় ইসলামের তরুণ সমাজে যে তাদের ধর্মের এক নবরূপ দাবী করছে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। ইসলামের পুনর্জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রয়োজন, ইউরোপ কি চিন্তা করেছে এবং তার সিদ্ধান্তগুলো ইসলামের ধর্মীয় চিন্তার শোধনে এবং প্রয়োজন হলে তার পুনর্গঠনে কতটুকু আমাদের সাহায্য করতে পারে, স্বাধীন মনোভাব নিয়ে তা বিচার করে দেখা। তাছাড়া সাধারণভাবে ধর্মবিরোধী এবং বিশেষ করে ইসলাম-বিরোধী যে প্রচারণা মধ্য এশিয়ায় দেখা দিয়েছে এবং যা

ভারতবর্ষের সীমান্তও পেরিয়ে এসেছে, তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এই আন্দোলন-প্রবর্তকদের মধ্যে এমন কয়েকজন রয়েছেন, যাঁদের জন্ম মুসলমানকুলেই। এঁদের একজন হচ্ছেন তুর্কী কবি তওফীক ফিতরাত, মাত্র কিছু দিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আমাদের একজন বড় ভাবুক-কবি আকবরাবাদের মীর্জা আবদুল কাদির বেদিলকে পর্যন্ত তিনি এই আন্দোলনের কাজে নামিয়েছেন। কাজেই, ইসলামের মূল সত্যগুলো নিয়ে আলোচনা করা এখন জরুরী হয়ে পড়েছে। এই বক্তৃতাগুলোতে আমি ইসলামের কয়েকটি মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে দর্শন-সম্মত আলোচনা করার প্রস্তাব করছি। আমি আশা করছি, মানব সমাজের প্রতি ইসলাম যে এক সুসংবাদ এনেছে, এই আলোচনা অন্তত সেই হিসেবে ইসলামের অর্থ সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য করতে পারে। বৃহত্তর আলোচনার একটি মূল কাঠামো দাঁড় করাবার উদ্দেশ্যে আমি এই প্রাথমিক 'বক্তৃতায় জ্ঞান এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতার স্বরূপ' সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই।

আল্লাহ এবং বিশ্বের সঙ্গে রয়েছে মানুষের বহুবিধ সম্পর্ক। এই সম্পর্ক সম্বন্ধে মানুষের মনে গভীরতর চেতনার উন্মেষ করাই হচ্ছে কুরআনের প্রধান উদ্দেশ্য। কুরআনী শিক্ষার এই মূল দিকটা লক্ষ্য করে গ্যেটে ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণভাবে এক আলোচনা প্রসঙ্গে একারম্যানকে বলেছিলেন :

> 'দেখুন, এই শিক্ষা কখনো ব্যর্থ হয় না। আমাদের সকল ব্যবস্থা-বিধান দিয়েও আমরা এটাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারি না এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে কোন মানুষই তা পারে না।'

ধর্ম এবং সভ্যতা এই দুই শক্তির মধ্যে একই সঙ্গে রয়েছে পারস্পরিক বিকর্ষণ ও আকর্ষণ।

ধর্ম ও সভ্যতার এই যুগপৎ বিরোধ ও আকর্ষণই ইসলামের সামনে সত্যিকার সমস্যারূপে দেখা দিয়েছিল। গোড়ার দিকে খৃস্টান ধর্মও এই একইরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। খৃস্টান ধর্মের বড় কথা হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাধীন সত্তার সন্ধান। এর প্রতিষ্ঠাতা তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন যে, আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নয়ন সম্ভব; তবে সে উন্নয়ন মানুষের আত্মা-বহির্ভূত জাগতিক শক্তিসমূহের দ্বারা নয়, বরং তার আত্মার অভ্যন্তরে এক নতুন জগতের আবিষ্কারের মাধ্যমে। ইসলাম এই অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত; তবে ইসলাম এই অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে যোগ করেছে আরেকটি অন্ত র্দৃষ্টি। সে অন্তর্দৃষ্টি অনুসারে মানুষের অন্তরে বিকশিত এই নতুন জগতের আলোক বস্তুজগতের বিরোধী নয়, বরং বস্তুজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এর অনুপ্রবেশ।

তাই খৃস্টান ধর্ম যে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নয়নের জন্যে সন্ধান করে, সে উন্নয়ন বহির্জগতের শক্তি বর্জন করে সম্ভব হবার নয়। কারণ এই শক্তিসমূহই আধ্যাত্মিক প্রভাব দ্বারা আগেই প্রভাবিত হয়ে আছে; সে উন্নয়ন সাধন করতে হবে বাইরের এইসব শক্তির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের উপযুক্ত সমন্বয় সাধনের দ্বারা। আদর্শের রহস্যময় পরশই বাস্তবকে প্রাণ দান করে এবং শুধু এর মাধ্যমেই আমরা পারি আদর্শকে আবিষ্কার ও উপলব্ধি করতে।

ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শ এবং বাস্তব এমন দু'টি বিরোধী শক্তি নয় যে, তাদের মিলন অসম্ভব। আদর্শকে বেঁচে থাকতে হলে বাস্তবের সঙ্গে তার পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রয়োজন নেই। বাস্তবকে উপেক্ষা করতে গেলেই জীবনের সামগ্রিক রূপ হয় বিনষ্ট, জীবনের সামনে তখন দেখা দেয় নানাবিধ বেদনাময় বাধা-বিরোধ। পরিণামে বাস্তবকে নিজের রূপে রূপান্তরিত এবং তার গোটা সত্তাকে নিজের আলোকে রঞ্জিত করার উদ্দেশ্যে তাকে আয়ত্ত করার নিরন্তর প্রচেষ্টার মধ্যেই আদর্শের জীবন। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে অর্থাৎ নিরেট গাণিতিক বহির্জগৎ এবং স্বাধীন অন্তর্জগতের মধ্যে এই বিরোধই খৃস্টান ধর্মের কাছে বড় বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু ইসলাম এই বিরোধেরই মুকাবিলা করে তাকে জয় করার জন্যে। বর্তমান পরিবেশে মানুষের জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে এই দু'টি মহান ধর্মের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা নির্ণিত হয় উভয় ধর্মের মধ্যে একটা মৌলিক ব্যাপারে এই গভীর পার্থক্য দ্বারা। মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্তার প্রতিষ্ঠা উভয় ধর্মেরই কাম্য, তবে পার্থক্য শুধু এই যে, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সংযোগকে স্বীকার করে ইসলাম বস্তুজগতকে জানায় স্বাগত; আর বাস্তবসম্মত উপায়ে জীবন পরিচালনার একটি ভিত্তি সন্ধানের উদ্দেশ্যে দেয় বস্তুগতকে আয়ত্ত করার পথের নির্দেশ।

তা হলে যে বিশ্বে আমরা বাস করছি, কুরআনের মতে তার স্বরূপ কি? প্রথমত, এটা নিছক সৃজনলীলার ফল নয় তো?

> 'আমরা আকাশ ও পৃথিবীর এবং তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে, তা ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নি। আমরা তাদের সৃষ্টি করি নি একটা গভীর উদ্দেশ্য ছাড়া : কিন্তু তাদের (মানুষের) বৃহত্তর অংশ তা জানে না।' (৪৪ : ৩৮-৩৯)

বিশ্ব হচ্ছে একটা প্রত্যক্ষ বাস্তব এবং সে বাস্তবকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে :

> 'নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবীর সৃজনে এবং পর পর দিন-রাত্রির আগমনে সমঝদারদের জন্যে রয়েছে সংকেত; তারা (সমঝদারগণ) দণ্ডায়মান, উপবেশন ও হেলান অবস্থায় আল্লাহর্ কথা স্মরণ রাখে, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে এবং বলে : হে আমাদের প্রভু! তুমি এসব বৃথা সৃষ্টি কর নি।' (৩ : ১৯০-১৯১)

আবার বিশ্ব এমনভাবে গঠিত যে, তা সম্প্রসারণযোগ্য।

> 'তিনি (আল্লাহ) যা ইচ্ছা তা তাঁর সৃষ্টিতে সংযোজন করেন।' (৩৫ : ১)

এটা ছাদে কাঁটা নিরেট বিশ্ব নয়। চূড়ান্ত করে তৈরী করা অচল ও অপরিবর্তনীয় বস্তুও এটা নয়। হয় তো এর সত্তার গভীরে রয়েছে নবজীবনের স্বপ্ন :

> 'বল, পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব করেছেন : এরপর তিনি একে (সৃষ্টিকে) আর এক জন্ম দান করবেন।' (২৯ : ১৯)

বস্তুত, বিশ্বের এই রহস্যময় গতিস্পন্দন, কালের এই নিঃশব্দ সঞ্চরণ (যা আমাদের কাছে দিন-রাত্রির গতি বলে প্রতীয়মান) হচ্ছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনসমূহের অন্যতম :

'আল্লাহর হুকুমেই পালাক্রমে দিন-রাত্রি সংঘটিত হয়। বস্তুত, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের কাছে এটা একটা শিক্ষণীয় বিষয়।' (২৪ : ৪৪)

এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন : 'কালের নিন্দা কর না, কারণ কালই হচ্ছে আল্লাহ।' দেশ-কালের এই বিশালতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাদের উপর মানুষের পূর্ণ আধিপত্যের সম্ভাবনা। তাই মানুষের উচিত আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করা এবং এইভাবে তার প্রকৃতি বিজয়কে একটি বাস্তব সত্যে রূপায়িত করে তোলার উপায় আবিষ্কার করা।

'আল্লাহ কিভাবে আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন আর দৃশ্য ও অদৃশ্যের ব্যাপারে তাঁর অনুগ্রহরাশি তোমাদের উপর বর্ষণ করেছেন তা কি তোমরা দেখতে পাও না ? (৩১ : ১৯)

'এবং আল্লাহ রাত্রি ও দিনকে, সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। এবং তাঁর (আল্লাহর) নির্দেশে নক্ষত্রগুলোও তোমাদের অধীন; নিশ্চয়ই এতে সমঝদারদের জন্য নির্দেশ রয়েছে।' (১৬ : ২০)

এ-ই যদি হয় বিশ্বের প্রকৃতি ও প্রতিশ্রুতি, তা হলে যে মানুষকে সে চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছে, তার স্বরূপ কি ? অত্যন্ত উপযোগী এবং সুসামঞ্জস্য শক্তিসমূহের অধিকারী হয়েও মানুষ দেখতে পাচ্ছে যে, জীবমণ্ডলীর এক নিম্নস্তরে তার স্থান। আর তার চারদিকে ঘিরে আছে নানা বিরুদ্ধ শক্তি :

'আমরা মানুষকে উৎকৃষ্টতম উপাদানে সৃষ্টি করেছি, তারপর তাকে স্থাপন করেছি সকলের নীচে। (৯৫ : ৪-৫)

এই পরিবেশের মধ্যে মানুষকে আমরা কি অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি? মানুষকে আমরা দেখছি একটা সদাচঞ্চল জীব রূপে। সে তার আদর্শ নিয়ে গভীরভাবে মশ্‌গুল। এ আদর্শের জন্য সে আর সব কিছু ভুলে যেতে চলেছে। আত্মপ্রকাশের নব নব সুযোগ সন্ধানে সে নিরন্তর সচেষ্ট। আর এর জন্য কোন রকমের কষ্টকেই সে পরোয়া করে না। তার সকল ব্যর্থতা সত্ত্বেও সে প্রকৃতির চেয়ে বড়। কেননা মানুষ তার নিজের মধ্যে বহন করে চলেছে এক মহান আমানত, যে আমানত বহন করতে আকাশ-পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত সকলেই অস্বীকার করেছিল :

'নিশ্চয়ই আমরা আকাশের কাছে, পৃথিবীর কাছে এবং পর্বতসমূহের কাছে প্রস্তাব করেছিলাম (ব্যক্তিত্বের) আমানত গ্রহণ করার জন্যে, কিন্তু তারা সে ভার (গ্রহণের প্রস্তাব) প্রত্যাখ্যান করল এবং গ্রহণ করতে ভয় পেল। একমাত্র মানুষ সে ভার গ্রহণ করতে স্বীকৃত হল, কিন্তু পরে সে নিজেকে অন্যায়কারী, নির্বোধ বলে প্রমাণ করেছে।' (৩৩ : ৭২)

'মানুষের জীবনের একটা আরম্ভ অবশ্যই রয়েছে, তবে সৃষ্টির কাঠামোতে একটা স্থায়ী উপাদানে পরিণত হওয়াই সম্ভবত তার বিধিলিপি :

'মানুষ কি মনে করে যে, তাকে অকেজো জিনিস বলে ফেলে দেওয়া হবে? সে কি একটা ভ্রূণ মাত্র ছিল না? তারপর সে ঘন রক্তে পরিণত হল এবং আল্লাহ সেই রক্ত থেকে তার আকৃতি ও রূপ দান করলেন এবং তাকে সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রী-রূপে। তিনি কি মৃতকে সঞ্জীবিত করার মত যথেষ্ট শক্তিশালী নন?' (৭৫ : ৩৬-৪০)

চার পাশের শক্তি যখন মানুষকে আকর্ষণ করে তখন সেই শক্তিকেই নিজের ইচ্ছামত গঠিত ও পরিচালিত করার ক্ষমতা তার রয়েছে। আবার সেই শক্তি যখন মানুষের চলার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়, তখন নিজের সত্তার গভীরে বিশালতর জগত সৃষ্টি করার সামর্থ্যও সে রাখে। এই অন্তর্জগতে সে তখন আবিষ্কার করে অসীম আনন্দ ও প্রেরণার উৎস। কঠিন মানুষের ভাগ্য, আর গোলাব পাতার মত ভঙ্গুর তার জীবন। তবু বাস্তব জগতের কোন বস্তুই মানুষের শক্তির মত তেজস্কর, উদ্দীপক ও সুন্দর নয়। এভাবে কুরআনে বর্ণিত মানুষ তার অন্তরতম সত্তার এক দিক দিয়ে এক সৃজনশীল শক্তি। ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলাই তার ধর্ম। সত্তার অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় সে নিরন্তর উন্নীত হয়ে চলেছে :

'তোমরা যে নিশ্চিতই সামনের পথে অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে নীত হবে, তার জন্যে সূর্যাস্তের রক্তিমাভা, রাত্রি ও তার পরিমণ্ডল এবং পূর্ণচন্দ্রের নামে আমার শপথ করার প্রয়োজন করে না।' (৮৪ : ১৬-২০)

চতুষ্পার্শ্বে বিরাজিত এই বিশ্বের সুগভীর স্বপ্নসাধের শরীক হওয়া এবং কখনো বিশ্বের শক্তিনিচয়ের সঙ্গে নিজের সঙ্গতি রক্ষার দ্বারা, আবার কখনো নিজের শক্তি প্রয়োগ করে বিশ্বের শক্তিসমূহকে নিজের উদ্দেশ্য ও অভীষ্টের অনুকূলে রূপায়ণের দ্বারা নিজের এবং বিশ্বের ভাগ্য গড়ে তোলাই মানুষের ব্রত। এই প্রগতিমূলক পরিবর্তন সাধনে আল্লাহ হন মানুষের সহকর্মী, অবশ্য মানুষ যদি নিজেই হয় উদ্যোগী :

'এ কথা নিশ্চিত, যে পর্যন্ত না মানুষ তাদের নিজের মধ্যে যা রয়েছে তার পরিবর্তন করবে, সে পর্যন্ত আল্লাহ তাদের অবস্থার পরিবর্তন করবেন না।' (১৩ : ১১)

মানুষ যদি নিজে উদ্যোগী না হয়, সে যদি তার সত্তার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্যের বিকাশ সাধন না করে এবং সে যদি চলমান জীবনের নিগূঢ় আবেগ অনুভব করতে হয় অক্ষম, তা হলে তার ভিতরকার শক্তি হয় পাথরে পরিণত এবং সে নিজে হয় মৃত বস্তুর পর্যায়ে অবনমিত। কিন্তু মানুষ যে বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হয়, তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উপরই নির্ভর করে তার জীবন ও তার আত্মিক শক্তির অগ্রগতি। জ্ঞানের দ্বারাই এই সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বুদ্ধির দ্বারা পরিস্ফুট ইন্দ্রিয়ানুভূতিই হচ্ছে জ্ঞান :

'তোমার প্রভু যখন ফেরেশ্‌তাদের বললেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে আমার এক খলীফা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি; তখন তারা বলল, আমরা যখন আপনার গুণগান করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি তখন আপনি কি সেখানে এমন একজনকে

নিযুক্ত করবেন, যে সেখানে খারাপ কাজ করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? আল্লাহ বললেন, তোমরা যা জান না, নিশ্চয়ই তা আমি জানি। এবং তিনি আদমকে সকল জিনিসের নাম শিক্ষা দিলেন আর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থিত করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা বিজ্ঞ হও তা হলে তোমরা আমার কাছে এগুলোর নাম বল। তারা বলল, আপনার প্রশংসা করছি, আপনি আমাদের যা জানতে দিয়েছেন, তা ছাড়া আর কিছুর জ্ঞানই আমাদের নেই। আপনি সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানী। তিনি বললেন, হে আদম! তুমি নামগুলো তাদের জানিয়ে দাও। এবং সে (আদম) যখন তাদের নামগুলো বলে দিল, তখন আল্লাহ বললেন, আমি কি তোমাদের বলি নি যে, আকাশ ও পৃথিবীর গুপ্ত জিনিসগুলো আমি জানি এবং তোমরা যা প্রকাশ কর আর যা গোপন কর তা আমি জ্ঞাত আছি।' (২ : ৩০-৩৩)

উপরে উল্লিখিত আয়াত ক'টিতে এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিভিন্ন বস্তুর নামকরণের অর্থাৎ, তাদের সম্বন্ধে মনে ধারণা সৃষ্টির ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। আর বস্তুসমূহের ধারণা করার মানেই হচ্ছে সেগুলো অধিগত করা। মানুষের মনোগত ধারণার উপর নির্ভর করেই হয় তার জ্ঞানের সৃষ্টি এবং ধারণা-লব্ধ জ্ঞানের হাতিয়ার নিয়ে মানুষ অগ্রসর হয় সত্তার পর্যবেক্ষণ-উপযোগী রূপের দিকে। কুরআনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তাতে সত্যের পর্যবেক্ষণোপযোগী রূপের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এখানে আমি কয়েকটি আয়াতের উল্লেখ করছি :

'নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, পর্যায়ক্রমে দিনরাত্রির আগমনে, জাহাজে-যা মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে সাগরবক্ষে চলাচল করে, বৃষ্টিতে-যা আল্লাহ আকাশ থেকে প্রেরণ করে পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর আবার জীবন দান করেন এবং তার বুকে গো-মহিষাদির পাল ছড়িয়ে রাখেন, বাতাসের পরিবর্তনে, এবং মেঘে-যাকে আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝখানকার সেবাকার্যে নিয়োজিত করা হয়েছে-তাতে সমঝদারদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।' (২ : ১৬৪)

'এবং তিনি তোমাদের জন্যে এমন ব্যবস্থা করেছেন, যাতে তোমরা স্থল এবং সমুদ্রের অন্ধকারে চলতে পার। আমরা জ্ঞানবানদের জন্যে আমাদের ইশারাগুলোকে স্পষ্ট করে দিয়েছি। এবং তিনিই তোমাদের একটি নিঃশ্বাস দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের জন্যে (গর্ভাধানে) আবাস ও বিরাম-স্থানের ব্যবস্থা করেছেন। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষদের জন্যে আমরা আমাদের নিদর্শনকে উজ্জ্বল করেছি। এবং তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি প্রেরণ করেন আর এর দ্বারা আমরা সকল তরুলতায় মুকুলরাশির উদ্গম করি এবং তাদের মধ্য থেকে আমরা ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালা, থোকা থোকা খেজুরের কাঁদি-বিশিষ্ট খেজুর গাছ, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, জলপাই ও ডালিম-বীথি এবং অন্য ও অনুরূপ জিনিস সৃষ্টি করি। তাদের ফলগুলো যখন পাকে তখন সেগুলো তোমরা লক্ষ্য কর। সত্যিই এতে বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।' (৬ : ৯৭-৯৯)

'তোমাদের প্রভু কিভাবে ছায়াকে দীর্ঘায়িত করেন, তা কি তোমরা দেখ নি? তিনি ইচ্ছা করলে একে নিশ্চল করে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু আমরা সূর্যকে এর পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করেছি, তারপর একে আমরা সহজ আকর্ষণে নিজেদের ভেতর টেনে নিই।' (২৫ : ৪৭)

'কিভাবে উট সৃষ্টি করা হয়, কিভাবে আকাশকে উত্তোলিত করা হয়, কিভাবে পর্বতকে মূলবদ্ধ করা হয় এবং কিভাবে পৃথিবীকে বিস্তারিত করা হয়, তা কি তারা লক্ষ্য করে দেখতে পারে না ? (৮৮ : ১৭-২০)

এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও গাত্র-বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় এর মধ্যে সকল মানুষের জন্যে ইঙ্গিত রয়েছে। (৩০ : ২২)

সন্দেহ নেই, কুরআনের আশু উদ্দেশ্য হল প্রকৃতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ দ্বারা মানুষের মধ্যে সেই সচেতনতা জাগিয়ে দেওয়া, যাতে প্রকৃতি তার কাছে প্রতীক বলে প্রতীয়মান হয়। তবে প্রত্যক্ষবাদী মনোভাবই হচ্ছে কুরআনের প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। এই মনোভাবই কুরআন অনুসারীদের মনে বাস্তবের প্রতি করেছিল গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি। তার ফলেই পরিণামে তারা হয়েছিল আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। যে যুগে মানুষ আল্লাহর অনুসন্ধান করতে পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহকে মূল্যহীন মনে করে বর্জন করেছিল, সেই যুগে এই প্রত্যক্ষবাদের উন্মেষ সাধন প্রকৃতই এক মহান ব্যাপার ছিল। আমরা আগেই দেখেছি যে, কুরআনের মতে বিশ্বের রয়েছে একটা মহান উদ্দেশ্য। বিশ্বের পরিবর্তনশীল বাস্তবই আমাদের সত্তাকে নব নব রূপ পরিগ্রহ করতে বাধ্য করেছে। বিশ্ব আমাদের সামনে প্রতিনিয়ত যে সব বাধার সৃষ্টি করছে তা অতিক্রম করার মানসিক প্রচেষ্টাতেই আমাদের জীবন সমৃদ্ধ ও বিকশিত হচ্ছে, উপরন্তু আমাদের অন্তর্দৃষ্টিও হচ্ছে প্রখরতর। এইভাবেই আমরা মানবীয় অভিজ্ঞতার সূক্ষ্মতর দিকগুলো আরো গভীরভাবে আয়ত্ত করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠছি। পার্থিব জগতের পরিবর্তন প্রবাহের সঙ্গে মনের সংযোগই আমাদের অপার্থিবকে মানস-চোখে দেখতে শিখিয়ে তোলে; সত্তা তার নিজ অভিব্যক্তির মধ্যেই বিদ্যমান। মানুষকে জীবন ধারণ করতে হয় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে। কাজেই, দৃশ্যমান জগতকে উপেক্ষা করে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। পরিবর্তনের মত একটা বিরাট ব্যাপারের প্রতি কুরআন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই পরিবর্তন হৃদয়ঙ্গম ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই শুধু স্থায়ী সভ্যতা গড়ে তোলা সম্ভব। এশিয়া এবং বস্তুত গোটা প্রাচীন জগতের সংস্কৃতিসমূহ ব্যর্থ হয়েছিল এই কারণে যে, তারা সত্তাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিল ভেতর থেকে এবং ভেতর থেকে অগ্রসর হয়েছিল বাইরের দিকে। এই পদ্ধতিতে তারা শুধু অন্তঃসারশূন্য থিওরী বা মতবাদেরই সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু নিছক মতবাদের উপর ভিত্তি করে তো কোন স্থায়ী সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না।

ইতিহাসে দেখা যায়, দিব্যজ্ঞানের উৎস হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতারই ব্যবহার

করা হয়েছে, তবে সবার আগে ব্যবহার হয়েছে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার। প্রত্যক্ষবাদী মনোভাবকে কুরআন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের একটি অপরিহার্য স্তর হিসেবে স্বীকার করেছে এবং পরমসত্তা সম্পর্কীয় জ্ঞানের পথ হিসেবে মানুষের সব রকম অভিজ্ঞতাকেই গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ, পরম সত্তা কেবল ভেতরের প্রতীকে নয়, বাইরের প্রতীকেও আত্মপ্রকাশ করে থাকে। সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের একটি পরোক্ষ উপায় হচ্ছে, আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে তার যে সব প্রতীক স্বতঃপ্রকাশিত, তার মানস-পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ; আর একটি উপায় হচ্ছে সত্তার যে সব প্রতীক অন্তরে প্রতিভাত তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন। কুরআনের প্রকৃতিবাদের মানে হচ্ছে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এই যে সম্বন্ধ তাকে স্বীকার করা। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যেই প্রকৃতির শক্তিসমূহ আয়ত্ত করার উপায় নিহিত। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই সম্বন্ধের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে; তবে তা আধিপত্য বিস্তারের অন্যায় আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্যে নয়, বরং আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাধীন গতিকে উর্ধ্বতম স্তরে উন্নীত করার মহান উদ্দেশ্যে। সত্যের পূর্ণ ধারণা লাভের জন্যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে যোগ করতে হবে কুরআনের বর্ণিত কাল্‌ব বা হৃদয়ের অনুভূতি :

> 'আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা তিনি একান্ত উত্তম করেই বানিয়েছেন; তিনি মৃত্তিকার দ্বারা মানুষের সৃষ্টি শুরু করেছিলেন, তারপর জীবনের বীজ, অপবিত্র পানি থেকে তার সন্তান-সন্ততির বিধান করেছিলেন, এরপর তাকে রূপদান করেছেন ও প্রশ্বাসযোগে তার মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়েছেন আপন রূহ্ এবং তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় দান করেছেন। পরিবর্তে তোমরা কতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর?' (৩২ : ৭-৯)

'হৃদয়' হচ্ছে এক ধরনের অন্তর্নিহিত স্বজ্ঞা বা অন্তর্দৃষ্টি। রূমী সুন্দর বলেছেন, এই অন্ত র্দৃষ্টি সূর্যরশ্মি পান করে পুষ্টি লাভ করে এবং সত্তার যে সব বৈশিষ্ট্য আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে ধরা পড়ে না, সেই সব বৈশিষ্ট্যের সংস্পর্শে আমাদের নিয়ে আসে। কুরআনের মতে, এই কাল্‌ব হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা দেখতে পায় এবং সে দেখার যদি উপযুক্তরূপে ব্যাখ্যা করা যায় তা হলে তা কখনো ভুল বলে প্রতিপন্ন হয় না। তবে আমরা যেন এই হৃদয়কে কোন রহস্যময় বিশেষ বৃত্তি বলে মনে না করি; বরং এটা হচ্ছে সত্তাকে জানবার একটা পথ-বিশেষ, যাতে এ দেহের 'ইন্দ্রিয়ানুভূতি'র কিছু করার নেই। তবু এই প্রণালীতে যে অভিজ্ঞতার রাজ্য আমাদের সামনে উদঘাটিত হয়, তা অন্য যে কোন অভিজ্ঞতার মতই সত্য ও বাস্তব। আমরা যদি একে আত্মিক, মরমী বা অতীন্দ্রিয় বলে বর্ণনা করি তা হলেও অভিজ্ঞতা হিসেবে এর মূল্যহানি হয় না। আদিম যুগের মানুষের কাছে সকল অভিজ্ঞতাই ছিল অতিপ্রাকৃতিক। জীবনের আশু প্রয়োজনের তাগিদে তারা তাদের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করত। এই বিশ্লেষণের ফলেই ক্রমে আমরা যাকে প্রকৃতি বলি তার উদ্ভব হল। গোটা সত্তা আমাদের চেতনায় প্রবেশ করে এবং বিশ্লেষণের আর একটি প্রত্যক্ষ সত্যের মত প্রতীয়মান হয়। অন্যবিধ উপায়েও সত্তা আমাদের চেতনায় অধিরূঢ় হয়ে থাকে।

তখন তাকে বিশ্লেষণ করে দেখার অধিকতর সুযোগ উপস্থিত হয়। মানব জাতির ধর্মীয় ও মরমী সাহিত্যে প্রমাণের অভাব নেই যে, তার ইতিহাসে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এত বেশী স্থায়ী ও প্রবল হয়ে বিরাজ করছে যে, তাকে নিছক মায়া বলে উড়িয়ে দেয়া চলে না। মানব জাতির প্রত্যাদিষ্ট এবং মরমী সাহিত্য এর পর্যাপ্ত সাক্ষ্য বহন করছে। কাজেই মানবীয় অভিজ্ঞতার সাধারণ স্তরকে সত্য বলে গ্রহণ করা এবং তার অন্যান্য স্তরকে অতীন্দ্রিয় ও আবেগমূলক বলে বর্জন করার কোন হেতু আছে বলে মনে হয় না। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সত্যও মানুষের অন্যান্য অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত সত্যসমূহেরেই অন্তর্গত। বিশ্লেষণের সহায়তায় জ্ঞান দানের শক্তির দিক দিয়ে একটা সত্য অন্য যে কোন সত্যের মতই কার্যকরী। আর মানবীয় অভিজ্ঞতার এই দিক নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করার মধ্যে অশ্রদ্ধারও কিছু নেই।

ইসলামের নবী ছিলেন আত্মিক অবস্থার প্রথম সত্যসন্ধ পর্যবেক্ষক। রসূলুল্লাহ ইব্‌নে সাইয়াদ নামে একজন আত্মিকভাবাপন্ন ইহুদী যুবকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। বুখারী এবং অন্যান্য হাদীসবেত্তা এই ঘটনার একটি পূর্ণ বিবরণ আমাদের দান করেছেন। এই ইহুদী যুবকের ভাবাবিষ্ট অবস্থা রসূলে কারীমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় যুবকটিকে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ, পরীক্ষা ও যাচাই করে দেখেছিলেন। সমাধিস্থ অবস্থায় তার অনুচ্চ উক্তিগুলো শোনার জন্য রসূলুল্লাহ্ একটি বৃক্ষকাণ্ডের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন। বালকটির মাতা রসূলুল্লাহর আগমন সম্বন্ধে তাকে হুঁশিয়ার করে দেওয়ায় সে তৎক্ষণাৎ তার ভাবাবিষ্ট অবস্থা থেকে নিজকে মুক্ত করে ফেলে। এতে রসুলুল্লাহ বলেছিলেন : 'যদি সে (মহিলাটি) তাকে একা থাকতে দিত তা হলে ব্যাপারটি পরিস্ফুট হয়ে উঠত।' ইসলামের ইতিহাসে এটাই হচ্ছে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ। সে সময় রসূলুল্লাহর কয়েকজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সাহাবীগণ এবং এমনকি পরবর্তী মুহাদ্দিসগণও যত্নের সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তবে তাঁরা রসূলুল্লাহর মনোভাবের তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিলেন এবং নিজেদের স্বাভাবিক সারল্যের সঙ্গে এর বিশ্লেষণ করেছিলেন। অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ডও এই ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে মরমী ও প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিসুলভ চেতনার মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্যের কোন ধারণা তাঁর ছিল বলে মনে হয় না। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা সমিতির (সোসাইটি অব সাইকিক্যাল রিসার্চ) পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি এক পয়গাম্বরের অবস্থা সম্বন্ধে অন্য পয়গাম্বরের এই পর্যবেক্ষণের মধ্যে যথেষ্ট হাস্য-রসের খোরাক পেয়েছেন। অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ড যদি কুরআনের মর্ম ভালরূপে উপলব্ধি করতেন, তা হলে আত্মিক-ভাবাপন্ন ইহুদী যুবক সম্বন্ধে রসূলুল্লাহর পর্যবেক্ষণের মধ্যে নিশ্চয় তিনি খুব অর্থপূর্ণ কিছু দেখতে পেতেন। সুষ্ঠুরূপে কুরআনের মর্ম অনুধাবনের ফলে এমন একটা তামুদ্দুনিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল যার পরিণতি হচ্ছে আধুনিক প্রত্যক্ষবাদী মনোবৃত্তির উদ্ভব। এ সম্পর্কে আমি পরবর্তী এক বক্তৃতায় আলোচনা করব। মুসলমানদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ ও মূল্য উপলব্ধি করেছিলেন তিনি হচ্ছেন ইবনে খালদুন। সূক্ষ্মতর বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি মরমী চেতনার মর্মভেদ করতে চেয়েছিলেন এবং অবচেতন সত্তা সম্পর্কে আধুনিক মতবাদের কাছাকাছি গিয়ে পৌছেছিলেন। অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ড বলছেন,

ইবনে খালদুনের কতকগুলো অতিআকর্ষণীয় মনস্তাত্ত্বিক ধারণা ছিল এবং সম্ভবত মি. উইলিয়াম জেমসের 'ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য' (ভ্যারাইটিজ অব রিলিজিয়াস এক্সপিরিয়েন্স) এর সঙ্গে তাঁর নিবিড় মতৈক্য ছিল। আধুনিক মনোবিজ্ঞান মরমী চেতনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার গুরুত্ব সবেমাত্র উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। যুক্তিবহির্ভূত চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণের যথার্থ ও কার্যকরী কোন বৈজ্ঞানিক উপায় এখনো আমাদের আয়ত্তাধীন হয় নি। আমার হাতে যেটুকু সময় আছে তাতে সারবত্তা ও স্পষ্টতার দিক দিয়ে মরমী চেতনার ইতিহাস ও তার বিভিন্ন স্তরমাত্রা সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নয়। মরমীয় অভিজ্ঞতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সম্বন্ধেই শুধু সাধারণ কয়েকটি মন্তব্য আমি এখানে পেশ করব।

১. প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল এই অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতা। এদিক দিয়ে জ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে অন্যান্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে মরমীয় অভিজ্ঞতার কোন প্রার্থক্য নেই। বস্তুত সকল অভিজ্ঞতাই প্রত্যক্ষ। বহির্জগতের জ্ঞানের জন্যে যেমন আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাগুলো ইন্দ্রিয়-নির্ভর বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ, আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের জন্যেও তেমনি মরমীয় অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। মরমীয় অভিজ্ঞতার অব্যবহিত বা প্রত্যক্ষতার অর্থ হচ্ছে এই যে, আমরা অন্যান্য বস্তুকে যেমন জানি, আল্লাহকেও তেমনি জানি। আল্লাহ কোন গাণিতিক সত্তা বা পরস্পর সংযুক্ত কোন মৌলিক বস্তু কিংবা অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ ধারণা নয়।

২. দ্বিতীয় বিষয় হল মরমী অভিজ্ঞতার অবিভাজ্য সমগ্রতা। যখন আমি আমার সম্মুখস্থ টেবিলটার অভিজ্ঞতা লাভ করি, তখন টেবিল সম্পর্কে একই অভিজ্ঞতার অসংখ্য অভিজ্ঞতার সূত্র মিশে যায়। এই সূত্রগুলোর মধ্যে যেগুলো টেবিল সম্পর্কীয় দেশ ও কালের সঙ্গে খাপ খায় বা তৎসন্নিহিত হয়, শুধু সেইগুলোকে বাছাই করে নিই। ভাবাবিষ্ট অবস্থা যতই গভীর এবং সমৃদ্ধ হোক না কেন, চিন্তার স্থান সেখানে একান্ত ন্যূন। উপরোক্ত উপায়ে আর বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তবে সাধারণ বুদ্ধিসম্মত চেতনা থেকে ভাবাবিষ্ট অবস্থার পার্থক্যের অর্থ সাধারণ চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্স অবশ্য এই পার্থক্যকে বিচ্ছিন্ন বলে ভুল করেছেন।

যা হোক, মরমী চেতনা এবং বুদ্ধিসম্মত চেতনা উভয় ক্ষেত্রেই একই সত্তা আমাদের উপর ক্রিয়াশীল। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের বাস্তব প্রয়োজনে আমরা সত্তাকে খণ্ড খণ্ডভাবে দেখি, কারণ যে সব অভিজ্ঞতা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তা ক্রমে ক্রমে আমাদের গোচরে আসে। ভাবাবিষ্ট অবস্থা আমাদের সমগ্র সত্তার সংস্পর্শে নিয়ে আসে, যে সত্তার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কর্তা-কর্ম লীন হয়ে যায়। তখন অন্তর-বাহিরের পার্থক্যও বিলুপ্ত হয়।

৩. তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হল : মরমীর কাছে ভাবাবিষ্ট অবস্থা মুহূর্তের জন্যে ব্যক্তিগত সমস্ত অভিজ্ঞতার অতীত এক অতুলনীয় অন্য সত্তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গ লাভ ঘটে। এ

সময় মরমীর ব্যক্তিগত সমস্ত সত্তা অবলুপ্ত হয়ে যায়। ভাবাবিষ্ট অবস্থার বিষয়বস্তু বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, এটা নিতান্তই বস্তুমুখী, একে অবিমিশ্র মানসিক কুহেলিকায় মগ্ন অবস্থা বলে গণ্য করা যেতে পারে না। তবে আপনারা আমায় জিজ্ঞেস করবেন, স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হিসেবে আল্লাহ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কি করে সম্ভব? (মরমীয় দশা নিষ্ক্রিয়-শুধু এতেই অভিজ্ঞাত খুদী যে যথার্থ আলাদা তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় না)। এই প্রশ্ন যে আমাদের মনে উদিত হয়, তার কারণ আমরা বিনা বিচারে বা বিনা আলোচনায় ধরে নিই যে, ইন্দ্রিয়-অনুভূতি মারফত আমাদের বহির্জগত-সম্বন্ধীয় জ্ঞানই সকল জ্ঞানের আদর্শ। তা-ই যদি হতো, তা হলে আমরা কখনই আমাদের নিজস্ব খুদীর বাস্তবতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারতাম না।

যা হোক, এর জবাবে আমি আমাদের প্রাত্যহিক সামাজিক অভিজ্ঞতার উপমা দেব। সামাজিক মেলামেশার সময় আমরা অপর মনের পরিচয় পাই কি করে? আমরা নিজেদের খুদী ও প্রকৃতিকে যথাক্রমে অন্তর্চিন্তা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা জানি। অপর মনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমাদের কোন বোধ নেই। আমার সম্মুখস্থ কোন চেতনাশীল ব্যক্তি সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে এই যে, আমারই মত তারও দৈহিক চালচলন আছে। এই আঙ্গিক গতিবিধির সাদৃশ্য দেখেই আমি ধারণা করে নিই-ও-জীবটাও আমারই মত চেতনাসম্পন্ন অন্য এক ব্যক্তি। অথবা অধ্যাপক রয়েসের মত আমরা বলতে পারি : আমাদের সঙ্গী-সহচরদের আমরা বাস্তব বলে জানি এই কারণে যে, তারা আমাদের ইঙ্গিতে সাড়া দেয় আর এইভাবে তারা ক্রমাগত আমাদের নিজেদের খণ্ড খণ্ড ধারণাকে পরিপূরণ করে। এই সাড়া বা সংবেদনই যে সচেতন স্বরূপের উপস্থিতি প্রমাণিত করে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কুরআনেও অনুরূপ অভিমত রয়েছে :

> 'এবং তোমার প্রভু বললেন, আমাকে ডাক এবং আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেই'। (৪০ : ৬০)
>
> 'এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, তখন আমি তাদের নিকটবর্তী হই এবং আমার কাছে যে কাতরভাবে প্রার্থনা করে, তার প্রার্থনার জবাব আমি দান করি।' (২ : ১৮২)

এটা পরিষ্কার যে, আমরা দৃশ্য-অদৃশ্য যে মান দিয়েই যাচাই করি না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই অপরের মন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনুমানগত কিছুর মতই থেকে যায়। তবু আমরা অনুভব করি যে, অন্যান্য মন সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ। আর আমাদের সামাজিক অভিজ্ঞতার বাস্তবতা সম্বন্ধে কখনো কোন সন্দেহ আমরা পোষণ করি না। তবে আমাদের আলোচনার বর্তমান স্তরে অপর মন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের তাৎপর্যের উপর ভিত্তি করে একটা ব্যাপক খুদীর বাস্তবতার অনুকূলে কোন ভাববাদী যুক্তি দাঁড় করাতে চাই না। আমি শুধু এই কথাটাই উল্লেখ করতে চাই যে, ভাবাবিষ্ট অবস্থায় আমাদের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতা তুলনাহীন নয়। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে এর

কিছুটা সামঞ্জস্য রয়েছে এবং সম্ভবত এটা সাধারণ অভিজ্ঞতারই সমগোত্র।

৪. মরমীয় অভিজ্ঞতার স্বরূপ প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে হয় বলেই এটা অপরকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। মননের চেয়ে অনুভূতির সঙ্গেই ভাবাবিষ্ট অবস্থার মিল বেশী। মরমী বা পয়গাম্বর তাঁর ধর্মীয় চেতনার 'আধেয়' (বিষয়বস্তু) সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন, তা কতকগুলো প্রতিজ্ঞা বা প্রস্তাবনার আকারে অপরের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া চলে। কিন্তু ধর্মীয় চেতনার 'আধেয়'-কে তদ্রূপ বুঝিয়ে বলা চলে না। যেমন কুরআন শরীফের নিম্নলিখিত কয়েকটি আয়াতে অভিজ্ঞতার শুধু মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়েছে, অভিজ্ঞতার 'আধেয়' সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করা হয় নি :

> 'আল্লাহ মানুষের সঙ্গে কেবল স্বপ্নে অথবা পর্দার আড়াল থেকে কথা বলেন না : তিনি দূত প্রেরণ করেন, দূত আল্লাহর আদেশ মত তাঁর প্রত্যাদেশ প্রচার করবেন, কারণ তিনি মহান জ্ঞানী।' (৪২ : ৫১)

> 'নক্ষত্র যখন অস্তমিত হয় তখন তার শপথ, তোমাদের সহচর ভুল করেন না বা বিপথগামী হন না; অথবা নিছক ভাবাবেগ থেকে তিনি কথা বলেন না। তাঁর কাছে কুরআন আল্লাহর দেওয়া প্রত্যাদেশ ছাড়া অন্য কিছু নয়। শক্তিশালী একজন তাঁকে এটা শিক্ষা দিলেন এবং প্রজ্ঞা দান করলেন। দিগ্বলয়ের সর্বোচ্চ অংশে তিনি ভারসাম্য রক্ষা করে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি নিকটবর্তী হলেন আর এগিয়ে আসলেন এবং দুই ধনুক পরিমাণ দূরত্বের মধ্যে অথবা আরও কাছে রইলেন। তারপর আল্লাহর বান্দার কাছে সে প্রত্যাদেশ প্রকাশ করলেন; তিনি যা দেখলেন তা তাঁর অন্তর অবিশ্বাস করল না। তিনি যা দেখলেন তা নিয়ে কি তোমরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করবে? যে সিদরা বৃক্ষ সীমানা চিহ্নিত করছে, তার কাছে তিনি আরও একবার তাঁর দর্শন লাভ করেছিলেন। এই সীমানার কাছেই বিশ্রাম-উদ্যান অবস্থিত, এই সিদরা বৃক্ষ তার আবরণ দ্বারা আবৃত ছিল; তাঁর চোখ অন্যদিকে ফেরে নি বা বিভ্রান্তভাবে এদিক-ওদিক বিচরণ করেনি; কারণ তিনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলেন।' (৫৩ : ১-১৮)

মরমীয় অভিজ্ঞতা যে অপরের কাছে বর্ণনা করা চলে না, তার কারণ এটা মূলত এক অব্যক্ত অনুভূতির ব্যাপার। বুদ্ধিগত বিচারের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, অন্য সকল অনুভূতির মত মরমীয় অনুভূতিরও একটা জ্ঞানাত্মক উপাদান আছে। আর আমার বিশ্বাস, এই জ্ঞানাত্মক উপাদানের বলেই মরমীয় অভিজ্ঞতা আমাদের আইডিয়া গঠনে সাহায্য করে। বস্তুত চিন্তায় অভিব্যক্তি লাভ করাই অনুভূতির স্বভাব। অনুভূতি ও আইডিয়াকে একই নিগূঢ় অভিজ্ঞতার পার্থিব ও অপার্থিব দুটো দিক বলে মনে হবে। তবে এ বিষয়ে অধ্যাপক হকিং-এর উক্তি উদ্ধৃত করলেই আমার বক্তব্য স্পষ্টতর হবে। ধর্মীয় চেতনার মূলে যে বুদ্ধি আছে, এই মতবাদ প্রমাণের জন্যে তিনি অনুভূতি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করেছেন : অনুভূতি ছাড়া অন্য আর কোন

জিনিস আছে যাতে অনুভূতি সমাপ্তি লাভ করতে পারে? এর জবাবে আমি বলব : বস্তু সম্বন্ধে সচেতনতা। অনুভূতি হচ্ছে গোটা এক সচেতন খুদীর অস্থিরাবস্থা : আর এই খুদীকে যা স্থিরতা দান করবে তা এর গণ্ডির ভেতরে নেই, রয়েছে এর গণ্ডির বাইরে। অনুভূতির প্রকৃতি বাইরের দিকে যাওয়া, আর আইডিয়ার প্রকৃতি বাইরের কিছু জানিয়ে দেওয়া। নিজ উদ্দেশ্যের কোন ধারণাই থাকবে না, কোন অনুভূতিই এমন অন্ধ নয়। মনে যখন কোন একটা অনুভূতির সঞ্চার হয়, তখন সেই অনুভূতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই এমন একটা জিনিসের ধারণাও মনে উদিত হয়, যা অনুভূতিকে স্থিরতা দান করে। লক্ষ্য ছাড়া যেমন কোন কাজ হতে পারে না, তেমনি লক্ষ্য ছাড়া কোন অনুভূতিও সম্ভব নয়। আর লক্ষ্য থাকলে উদ্দেশ্য থাকবেই। আমাদের চেতনার এমন কতকগুলো অপরিস্ফুট অবস্থা আছে, যাতে আমাদের কোন লক্ষ্য নেই বলেই মনে হতে পারে। তবে এরূপ অবস্থায় লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে, আমাদের অনুভূতিও তখন অনুরূপভাবেই নিশ্চল থাকে। ধরুন, আমি কোন আকস্মিক আঘাতে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি তখন বুঝতেও পারব না আমার কি হল। আর কোন ব্যথাও তখন আমি অনুভব করতে পারব না। অথচ একটা কিছু যে ঘটেছে, সে সম্বন্ধে আমি পূর্ণ সচেতন। আইডিয়া দ্বারা স্পষ্ট এবং গতিপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তখন অভিজ্ঞতা ক্ষণিকের জন্যে আমাদের চেতনার দ্বার-দেশে অপেক্ষা করে-পরে আইডিয়া এসে প্রতিক্রিয়ার পথ দেখায়। আর সেই মুহূর্তেই অভিজ্ঞতাটা বেদনাদায়ক বলে অনুভূত হয়। আমাদের এ সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তবে বলব, আমাদের আইডিয়াতে যেমন উদ্দেশ্যমূলক চেতনা আছে, আমাদের অনুভূতিতেও তাই আছে- যা খুদীর অতীত কোন কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করে-যার মধ্যে অনুভূতি বিলীন হয়ে যাবে তার দিকেই খুদীকে চালিত করা ছাড়া যার অস্তিত্বের আর কোন কারণই নেই। আপনারা দেখতে পাবেন, অনুভূতির এই স্বভাবহেতু যদিও অনুভূতিতেই ধর্মের শুরু, তবু ইতিহাসের কোথাও এমন দেখা যায় না যে, অনুভূতিকেই ধর্ম যথাসর্বস্ব মনে করেছে বরং ধর্ম সর্বক্ষণ যুক্তির অনুসন্ধান করেছে। মরমীরা জ্ঞানের সোপান হিসেবে বুদ্ধির নিন্দা করলেও ধর্মের ইতিহাসে তার কোন সমর্থন নেই। এইমাত্র অধ্যাপক হকিং-এর উক্তি থেকে যে অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাতে ধর্মে আইডিয়া থাকার সমর্থন ছাড়াও আরো ব্যাপক ইঙ্গিত রয়েছে। বাচনিক প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে একটা ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক বহুকাল থেকেই বিদ্যমান। এক সময় এই বিতর্ক মুসলিম ধর্মীয় চিন্ত নায়কদের মধ্যেও খুব অশান্তির সৃষ্টি করেছিল, অনুভূতি ও আইডিয়ার মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ এ দ্বন্দ্বের উপর অনেকখানি আলোকপাত করে। অব্যক্ত অনুভূতি আইডিয়ায় পরিণত হতে সতত উদগ্রীব, আর আইডিয়া চায় তার নিজের মধ্য থেকেই একটা নিজস্ব দৃশ্যমান পোশাক গড়ে তুলতে। অনুভূতির অভ্যন্তর থেকেই এক সঙ্গে আইডিয়া ও কথার উদ্ভব হয়ে থাকে-এটা কোন আলঙ্কারিক কথা নয়। নৈয়ায়িক যুক্তি অবশ্য বলে যে, এরা পর পর আসে। এইভাবে আইডিয়া ও কথাকে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বলে ধরে নিয়ে নৈয়ায়িক বুদ্ধি নিজেরই অসুবিধা সৃষ্টি করে। এ-কথা সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে, 'কথা' আমাদের অনুভূতিতে স্বয়ং প্রতিভাসিত হয়ে থাকে।

৫. চিরন্তনের সঙ্গে মরমীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। তাই ক্রমিককাল তার কাছে মনে হয় অবাস্তব। কিন্তু চিরন্তনের সঙ্গে এই সংযোগের অর্থ ক্রমিককালের সঙ্গে পূর্ণ বিচ্ছেদ নয়। মরমীর দশাপ্রাপ্তির অবস্থা তার অনন্যতার দিক দিয়ে সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোন না কোনভাবে সম্পর্কযুক্তই থাকে। এটা বোঝা যায় এই সত্য থেকে যে, মরমীর দশা শীঘ্রই কেটে যায়, যদিও অবসানের পরেও তার প্রভাব প্রবলই থাকে। মরমী এবং পয়গাম্বর উভয়েই ফিরে আসেন সাধারণ অভিজ্ঞতার স্তরে। তবে পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে, পয়গাম্বরের প্রত্যাবর্তন মানব জাতির জন্যে অসীম অর্থময় হতে পারে। এ-সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করব।

জ্ঞানের দিক দিয়ে মরমীয় অভিজ্ঞতার এলাকা মানবিক অভিজ্ঞতার অন্যান্য এলাকার মতই সত্য। মরমীয় অভিজ্ঞতাকে ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর দাঁড় করান যায় না, শুধু এই কারণেই একে উপেক্ষা করা চলে না। যে জৈবিক অবস্থাকে মরমীয় দশার নিয়ামক বলে মনে হয়, তার বিশ্লেষণের দ্বারাও মরমীয় দশার মূল্যকে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। দেহ এবং মনের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধান্তকে যদি সত্য বলেও ধরে নেওয়া যায়, তা হলেও সত্যের প্রকাশ হিসেবে মরমীয় দশার মূল্য অবজ্ঞা করা অযৌক্তিক। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বলতে গেলে সকল অবস্থাই তা তাদের 'আধেয়' ধর্মীয় হোক বা অধর্মীয় হোক জৈবিকভাবেই নিরূপিত হয়ে থাকে। মনের ধর্মীয় রূপ জৈবিকভাবে যতটা নিরূপিত হয়, মনের বৈজ্ঞানিক রূপও ততটা জৈবিকভাবে নিরূপিত হয়। প্রতিভার জৈবিক অবস্থা সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিকরা যা বলবেন, তার দ্বারা প্রতিভার সৃষ্টি বিষয়ে আমাদের বিচার আদৌ নিরূপিত বা প্রভাবিত হয় না। বিশেষ রকমের গ্রহণ ক্ষমতার জন্যে বিশেষ রকমের মেজাজগত অবস্থার প্রয়োজন হতে পারে। যা গ্রহণ করা যায় তার স্বরূপের গোটা সত্য বলে পূর্ববর্তী কোন অবস্থাকে গণ্য করা চলে না। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যে মানের দ্বারা আমরা আমাদের বিভিন্ন মানসিক অবস্থাকে মূল্যের দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বলে বিচার করে থাকি, তার সঙ্গে তাদের জৈবিক কারণের কোন সম্পর্ক নেই। অধ্যাপক উঁইলিয়াম জেম্‌স বলেছেন, দিবা-স্বপ্ন এবং দৈববাণীর মধ্যে কতকগুলো স্পষ্টতঃই অর্থহীন। সম্মোহিত অবস্থা এবং আবেগমূলক অঙ্গ-বিক্ষোভের মধ্যেও কতকগুলো একান্ত নিরর্থক। এসবের দ্বারা স্বভাব এবং চরিত্র দৈবভাবাপন্ন বলে প্রমাণিত হওয়া দূরে থাক, নিছক গুরুত্বপূর্ণ বলেও গণ্য হয় না। খৃস্টান ধর্মের অনেক বাণী এবং অভিজ্ঞতার নিদর্শন রয়েছে যা প্রকৃতই দৈব ব্যাপার। আবার অনুরূপ এমন সব ব্যাপার আছে যা শয়তান তার বিদ্বেষবশত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের নরকের সন্তানে পরিণত করার জন্যে সংঘটন করেছিল। খৃস্টীয় মর্মবাদের ইতিহাসে, দৈব ব্যাপারকে শয়তান সৃষ্টি ব্যাপার থেকে পৃথক করার উপায় নিয়ে এক কঠিন সমস্যা দাঁড়িয়েছিল। এই সমস্যা সমাধানে শ্রেষ্ঠতম বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়েছে। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, তাঁদের ফলের দ্বারাই তোমরা তাঁদের চিনবে, তাঁদের মূল দ্বারা নয়। অধ্যাপক জেম্‌স খৃস্টীয় মর্মবাদের যে সমস্যার কথা উল্লেখ

করেছেন তা বস্তুত সকল মর্মবাদেরই সমস্যা। শয়তান তার বিদ্বেষবশত নকল অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। এই নকল অভিজ্ঞতাই মর্মীয় দশার পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে থাকে। কুরআনেও আমরা পড়ি :

'আমরা তোমাদের কাছে কোন রসূল বা পয়গাম্বরকে প্রেরণ করি নি যাদের বাসনায় শয়তান কোন ভ্রান্ত বাসনা প্রবিষ্ট না করেছে, কিন্তু এইভাবে আল্লাহ তাঁর প্রত্যাদেশসমূহ সত্যে প্রতিষ্ঠিত করবেন। কারণ আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানী।' (২২ : ৫২)

দিব্য ব্যাপারসমূহ থেকে শয়তানের কারসাজিগুলোকে অপসারিত করার দিক দিয়ে ফ্রয়েডের অনুসারিগণ ধর্মের প্রভূত মঙ্গল সাধন করেছেন। অবশ্য আমি এটা না বলে পারছি না যে, আমার কাছে এই সব মনোবিজ্ঞানের মূল নীতিটা পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে প্রতীয়মান হয় না। আমাদের ভবঘুরে উত্তেজনাসমূহ যদি আমাদের স্বপ্নের মধ্যে এসে হাজির হয়, কিংবা অন্য সময়ে আমরা সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ না থাকি, তবে তা থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, তারা আমাদের স্বাভাবিক খুদীর আড়ালে কোন পরিত্যক্ত প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আমাদের স্বাভাবিক খুদীর উপর সময় সময় এই সব অবদমিত উত্তেজনা এই যে হামলা করে, এতে বরং এই-ই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের মনের কোন অন্ধকোঠায় তাদের উপস্থিতির চেয়ে স্বাভাবিক সাড়া তারা সাময়িকভাবে ব্যাহত করে, তারা মনের কোন অন্ধ কোণে আবদ্ধ থাকে না। থিওরিটি এই : আমাদের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যখন আমরা নিজেদের খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করি, তখন আমরা নানা রকমের উত্তেজনার কবলে পড়ে থাকি। এই উত্তেজনায় আমরা যে সাড়া দিই, তা ক্রমে যেন একটা বিধিবদ্ধ নিয়মে পরিণত হয়। নব নব উত্তেজনা আসতেই থাকে। এ নিয়ম তার কতগুলোকে আত্মস্থ করে, আর যেগুলোর সাথে মিল না হয় সেগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে। যাকে মনের 'অবচেতন লোক' বলা হয়, তাতে এই পরিত্যাক্ত উত্তেজনাগুলো চলে যায়। এ কেন্দ্রীয় খুদীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্যে তারা সেখানে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এই অবদমিত আবেগ বা উত্তেজনাসমূহ আমাদের কার্য-পরিকল্পনায় গোলযোগ ঘটাতে, চিন্তাকে বিকৃত করতে, আমাদের নানারূপ অদ্ভুত স্বপ্ন সৃষ্টি করতে বা বিবর্তনের ধারায় আমরা যে সব আদিম আচার ব্যবহার পেছনে ফেলে এসেছি, তাতে আমাদের ফিরিয়ে নিতে পারে। বলা হয়েছে, ধর্ম মানুষের এইসব প্রত্যাখ্যাত আবেগের দ্বারা সৃষ্ট একটি নিছক কল্পবস্তু মাত্র, স্বাধীন ও অনাহত গতিবিধির জন্যে একপ্রকার 'পরীরাজ্যে'র প্রতিষ্ঠাই এর উদ্দেশ্য। এই মতবাদ অনুসারে ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাসগুলো প্রকৃতি সম্বন্ধে আদিম মতবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। এর মারফত মানব জাতি নিজ সত্তাকে তার আদিম কদর্যতা থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছে আর দেখাতে চেষ্টা করেছে যে, বাস্তব জীবনে এ সত্তাকে আমরা যেভাবে পাই আসলে তা তা'র চেয়ে মনোজ্ঞ ও কাম্য। জীবনের বাস্তব সত্য থেকে ভীরুর মতো পলায়নের সুযোগ দান করে এমন ধর্ম ও শিল্পধারা যে আছে তা আমি অস্বীকার করছি না। তবে আমার কথা হচ্ছে, এটা সব ধর্মের বেলায় সত্য নয়। নিশ্চয়ই ধর্মবিশ্বাস ও

ধর্মমতের একটা দর্শনশাস্ত্র সম্মত মানে আছে। তবে এটা স্পষ্ট যে, অভিজ্ঞতার যে সব মাল-মসলা প্রকৃতিবিজ্ঞানের আলাচনার বিষয়, ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাস সে সবের বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা নয়। ধর্ম কার্যকারণের তত্ত্ব দ্বারা প্রকৃতির তাৎপর্য উদঘাটন-প্রয়াসী পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়নশাস্ত্র নয়। ধর্মের লক্ষ্য হচ্ছে মানবীয় অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ এক ভিন্ন এলাকা অর্থাৎ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার উপাদানকে কোন বিজ্ঞানের আলোচ্য উপাদানে পরিণত করা যেতে পারে না। বস্তুত, ধর্ম সম্বন্ধে এটা ন্যায়তই বলতে হবে যে, বিজ্ঞানের বহু আগে এটা ধর্মীয় জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাস্তব অভিজ্ঞতার অনুসন্ধান করতে গিয়েই বিজ্ঞান ও ধর্ম ভিন্ন পথে চলেছে। এরা উভয়ে একই রকম অভিজ্ঞতার উপাদান ব্যাখ্যা করে, আমাদের এই ভুল বিশ্বাসের জন্যেই আমরা মনে করি যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর-বিরোধী। আমরা ভুলে যাই যে, এক বিশেষ রকমের মানবীয় অভিজ্ঞতার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধিই ধর্মের লক্ষ্য।

সমস্ত বিষয়টাই যৌন আবেগের কাণ্ডকারখানা, এই বলে, ধর্মীয় চেতনাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। যৌন চেতনা ও ধর্মীয় চেতনা এ দুটো পরস্পরের বিরোধী, অন্তত তাদের বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য এবং তাদের দ্বারা সঞ্জাত আচরণের দিক দিয়ে তারা পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আসল ব্যাপার হচ্ছে, আমরা ধর্মীয় আবেগের অবস্থায় আমাদের ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ আওতার বাইরে এক রকম বাস্তব সত্তার সন্ধান পাই। ধর্মীয় আবেগ আমাদের সত্তার গভীরে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে থাকে। এই কারণেই মনস্তাত্ত্বিকের কাছে ধর্মীয় আবেগ অবচেতন মনের কাজ বলে প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক জ্ঞানের ব্যাপারেই কিছু না কিছু আবেগ থাকবেই। এই আবেগের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বস্তুর বাস্ত বতাও কমবেশী হয়ে থাকে। যে জিনিসটা আমাদের ব্যক্তিত্বের গোটা কাঠামোকে আলোড়িত করে তোলে তা আমাদের কাছে খুবই বাস্তব। অধ্যাপক হকিং জোরের সঙ্গেই বলেছেন :

> 'যদি কখনোও কোন ব্যক্তির বা সাধু পুরুষের অর্থহীন দিনের মত দীর্ঘ সময়-পরিসরের মধ্যে কোন স্বপ্ন উদিত হয়ে তাঁর এবং আমাদের জীবনকে নতুন পথে পরিচালিত করে, তা হলে সেটা সম্ভব হতে পারে এই কারণে যে, সে স্বপ্ন সচেতন প্রস্তুতি এবং অবচেতন সংবেদন উভয়কেই স্বীকার করে। অবচেতন সংবেদনই আমাদের চিরন্তন ব্যক্তিত্বের সমগ্র কাঠামোকে আন্দোলিত করে। এইরূপ স্বপ্নের অর্থ যে অবচেতন প্রস্তুতি ও অবচেতন সংবেদন দুই-ই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে অব্যবহৃত বায়ু-প্রকোষ্ঠের সম্প্রসারণের দ্বারা এটা বোঝায় না যে, আমরা বাইরের বায়ু গ্রহণ থেকে বিরত হয়েছি; বরং ঠিক এর উল্টোটাই বোঝায়।'

কাজেই নিছক মনস্তাত্ত্বিক প্রণালীর দ্বারা ধর্মীয় আবেগকে একপ্রকার জ্ঞানরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। এটা লক এবং হিউমের বেলায় যেরূপ ব্যর্থ হয়েছে, আমাদের নতুন মনস্ত াত্ত্বিকদের বেলায়ও সেইরূপ ব্যর্থ হবেই।

উপরোক্ত আলোচনা থেকেই আপনাদের মনে নিশ্চয়ই এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জাগবে। আমি এই

কথাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি যে, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হচ্ছে মূলত একপ্রকার অনুভূতি। অভিমত হিসেবে ছাড়া অন্য কোন উপায়ে এর মর্মার্থ অপরকে বুঝিয়ে বলা যায় না। তবে মানবীয় অভিজ্ঞতার যে এলাকার দ্বার আমার কাছে রুদ্ধ, সেই ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা হিসাবে কোন রায় যদি আমার সম্মতির জন্যে আমার কাছে পেশ করা হয়, তা হলে নিশ্চয়ই আমি জিজ্ঞেস করতে পারি, এর সত্যতার নিশ্চয়তা কি? এমন কোন পরীক্ষা কি আমাদের জানা আছে, যার দ্বারা এর যথার্থতা নির্ণয় করা যেতে পারে? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যদি এইরূপ অভিমত বা রায় স্বীকার করে' নেবার একমাত্র ভিত্তি হ'ত তা হলে ধর্মটা শুধু জনকয়েক লোকেরই আয়ত্তের বিষয় হ'ত। সুখের বিষয়, এমন কতকগুলো পরীক্ষার উপায় আমরা পেয়েছি, যা অন্য রকমের জ্ঞানের বেলায় প্রযোজ্য পরীক্ষা-পদ্ধতির চেয়ে ভিন্ন নয়। এগুলোকে আমি বলি বুদ্ধিগত পরীক্ষা এবং গুণাত্মক পরীক্ষা। বিশেষরূপে বিশ্লেষণকে আমি বুদ্ধিগত পরীক্ষা বলতে চাই। এই পরীক্ষায় মানবীয় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কোন পূর্ব ধারণার সাহায্য নেওয়া হয় না। ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় যে-সত্তার রূপ প্রতিভাত হয়, বিশ্লেষণের দ্বারাও আমরা ঠিক সেইরূপ সত্তার নাগাল পাই কি-না তা দেখাই হচ্ছে বুদ্ধিগত পরীক্ষার উদ্দেশ্য। আর গুণাত্মক পরীক্ষায় ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বিচার করা হয় তার ফলের দ্বারা। দার্শনিকগণ বুদ্ধিগত পরীক্ষা প্রয়োগ করেন, আর পয়গাম্বররা প্রয়োগ করেন গুণাত্মক পরীক্ষা। পরবর্তী বক্তৃতায় আমি বুদ্ধিগত বিচারই প্রয়োগ করব।

দুই

দর্শনের চোখে প্রত্যাদেশমূলক ধর্মীয় অভিজ্ঞতা

স্কলাস্টিক বা পণ্ডিতী দর্শনে[১] আল্লাহর অস্তিত্বের সমর্থনে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে তিনটি। এই যুক্তি তিনটি বিশ্ববাদী যুক্তি, উদ্দেশ্যবাদী যুক্তি ও তত্ত্ববাদী যুক্তি নামে পরিচিত। এগুলো পরম সত্তার সন্ধানে চিন্তাশক্তির এক সত্যিকার অভিযানের ফল। তবে আমার আশঙ্কা-এসব যুক্তির বিরুদ্ধে গুরুতর রকমের সমালোচনা হতে পারে। এছাড়া এগুলো অভিজ্ঞতার এক অগভীর বিশ্লেষণের পরিচয় দেয়।

বিশ্ববাদী যুক্তি জগতকে দেখে একটা সসীম কার্যফলরূপে। কার্যকারণরূপে সম্পৃক্ত, পরস্পর-নির্ভরশীল ঘটনা-পরম্পরার ধারা অতিক্রমণের পর এই যুক্তির দৌড় গিয়ে থামে এক স্বয়ংসিদ্ধ আদি কারণে। এই আদি কারণের ওপারে আমাদের চিন্তা আর অগ্রসর হতে পারে না। তবে এটা স্বতঃই প্রতীয়মান যে, একটা সসীম কার্য থেকে শুধু একটা সসীম কারণ অথবা এইরূপ সসীম কারণেরই এক অসীম ধারার সন্ধান মিলতে পারে। কোন এক বিশেষ স্থানে এই কারণ-ধারা শেষ করা, আর এই কারণ-ধারার কোন এক কারণকে স্বয়ংসিদ্ধ এক আদি কারণের মর্যাদায় উন্নীত করার অর্থ হচ্ছে, যে কার্য-কারণের সম্বন্ধের নিয়মকে ভিত্তি করে এই যুক্তির অবতারণা, তাকেই উড়িয়ে দেওয়া। এছাড়া যুক্তিলব্ধ এই আদি কারণের সঙ্গে তার কার্যের কোন সম্বন্ধই থাকে না। এ কথার অর্থ হচ্ছে, কার্য তার নিজের কারণের সীমারূপে দাঁড়িয়ে সেই কারণকেই অবনমিত করে একটা সসীম কিছুতে। আবার যুক্তিলব্ধ এই কারণকে একটা অপরিহার্য সত্তা বলেও মনে করা চলে না। তার স্পষ্ট কারণ হচ্ছে, কার্য ও কারণের মধ্যে যে সম্পর্ক, তার ফলে এরা পরস্পর নির্ভরশীল, এদের কারো পরিপূর্ণ স্বাধীন সত্তা নেই। বিশ্ববাদী যুক্তির বিরুদ্ধে আরো বলা চলে যে, কারণের বাস্তব অস্তিত্বের প্রয়োজন আর তার যুক্তিকল্পিত প্রয়োজন এক নয়। আসলে এই যুক্তি শুধু সসীমকে অস্বীকার করে অসীমে পৌঁছুবার চেষ্টা করে। কিন্তু সসীমকে অস্বীকার করে পাওয়া যে অসীম, তা মিথ্যা অসীম। তেমন অসীম নিজকেও ব্যাখ্যা করে না, সসীমকেও না। বরং এতে সসীমকে দাঁড় করানো হয় অসীমের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। সত্যিকারের যে অসীম তা সসীমকে বর্জন করে না। সসীমের সসীমত্বের বিলোপ না ঘটিয়েই অসীম সসীমকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে। এইরূপে অসীম তার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় এবং কারণ দর্শায়। কাজেই যুক্তিশাস্ত্রের দিক দিয়ে বলতে গেলে বিশ্ববাদী যুক্তিতে সসীম থেকে অসীমে পৌঁছুবার যে পথ তা একান্তই অবৈধ এবং গোটা যুক্তিটাই অসার।

উদ্দেশ্যবাদী যুক্তিরও জোর এর চেয়ে বেশী নয়। উদ্দেশ্যবাদী যুক্তি কার্যের বিশ্লেষণের

দ্বারা তার কারণের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করে। প্রকৃতিতে দূরদৃষ্টি, উদ্দেশ্য ও অবস্থার সঙ্গে ব্যবস্থার যে নিদর্শন মিলে, তার থেকেই এই যুক্তিতে অনুমান করা হয় যে, অসীম বুদ্ধি ও ক্ষমতার অধিকারী এক আত্মসচেতন সত্তা আছে। এই যুক্তিতে বড় জোর পাওয়া যায় বাইরের এক নিপুণ ব্যবস্থাপকের সন্ধান; পূর্ব থেকেই বর্তমান রয়েছে এমন অচেতন ও অনমনীয় ব্যবস্থা নিয়ে তাঁর কারবার। এই পদার্থের উপাদানগুলো তাদের নিজস্ব প্রকৃতি বলে শৃঙ্খলামত সংগঠিত ও সংযোজিত হতে পারে না। এই যুক্তিতে আমরা কোন সৃষ্টিকর্তাকে পাইনে, পাই শুধু একজন ব্যবস্থাকুশলীকে। আর যদি আমরা এই ব্যবস্থাকুশলীকে তাঁর উপকরণের স্রষ্টা বলে মনে করি, তা হলে কথা দাঁড়ায় এই রকম : প্রথমে কৌশলী অনমনীয় উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, তারপর সেই অবাধ্য উপকরণকে বশে আনার জন্যে তিনি উক্ত উপকরণের স্বভাববিরোধী উপায় অবলম্বন করেছেন। এমন হলে তো আর বুদ্ধির তারিফ করা যায় না। এই ব্যবস্থাকুশলীকে যদি তাঁর উপকরণের বাইরে বলে মনে করি, তবে তাকে অবধারিত রকমে তাঁর নিজ উপকরণ দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এবং সসীমের সীমায় নেমে আসতে হবে। আসল কথা হচ্ছে, যে উপমার উপর ভিত্তি করে উদ্দেশ্যবাদী যুক্তি অগ্রসর, তা একান্তই অসার। মানব কারিগরের কাজ আর প্রকৃতির কাজের মধ্যে মূলত কোন সাদৃশ্য নেই। মানব-কারিগর প্রকৃতির বুক থেকে তার উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করে এবং সেগুলোকে ভেঙ্গে নতুন করে সাজিয়ে তার ইমারত তৈরী করে। প্রকৃতি তার উপাদানসমূহকে অখণ্ড রেখেই নিজ স্বভাব বলে তাদের বিবর্তন সাধন করে। স্থাপত্য-শিল্পীর কাজ নির্ভর করে তার উপকরণগুলোর ক্রমশ স্বতন্ত্রীকরণ ও সমন্বয় বিধানের উপর; প্রকৃতির অখণ্ড বস্তুনিচয়ের যে বিবর্তন, তার সঙ্গে কোন সাদৃশ্যই এর নেই।

বাকী রইল তত্ত্ববাদী যুক্তি। তত্ত্ববিলাসী মনের কাছে বরাবরই এই যুক্তির আবেদন সবচেয়ে বেশী। যুক্তিটা বিভিন্ন চিন্তানায়ক বিভিন্ন আকারে পরিবেশন করেছেন। ডেকার্টে এ যুক্তির যে রূপ দিয়েছেন তা হচ্ছে এই :

> একটি বস্তুর প্রকৃতিতে কিংবা তৎসম্বন্ধীয় ধারণায় একটি গুণ নিহিত আছে বলা আর সেই বস্তুর বেলায় সেই গুণ সত্য এবং তাতে সেই গুণ বিদ্যমান বলে স্বীকার করা একই কথা। কিন্তু অপরিহার্য অস্তিত্ব আল্লাহর সত্তায় বা আল্লাহর ধারণায় নিহিত আছে। কাজেই একথা সত্যই সমর্থন করা চলে যে, আল্লাহর বেলায় অস্তিত্ব অপরিহার্য অথবা আল্লাহ আছেন।

এরই পরিপূরক হিসেবে ডেকার্টে আরো একটি যুক্তি দিয়েছেন। আমাদের মনে এক পূর্ণ সত্তার ধারণা রয়েছে। এই ধারণার উৎস কি? প্রাকৃতিক জগত থেকে নিরঙ্কুশ সত্তার ধারণায় আসা যায় না। কেননা প্রাকৃতিক জগত সতত পরিবর্তনশীল। বস্তুত প্রাকৃতিক জগতের পক্ষে নিরঙ্কুশ সত্তার ধারণা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের মনোজগত ধারণার সঙ্গে মিলে এমন একটি বাস্তব প্রতিরূপ অবশ্যই আছে, তার থেকেই আমাদের মনে গড়ে উঠেছে এই পরম সত্তার ধারণা। এই যুক্তির স্বরূপ কতকটা সেই বিশ্ববাদী

যুক্তির মত, যার সমালোচনা আমি আগে করেছি। তত্ত্ববাদী যুক্তির রূপ যা-ই হোক না কেন, এটা স্পষ্ট যে, অস্তিত্বের ধারণা বাস্তব অস্তিত্বের প্রমাণ নয়। যেমন- কান্ট এই যুক্তির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, -আমার মনের তিনশ' ডলারের আইডিয়া বা ধারণা এ-কথা প্রমাণ করে না যে, আমার পকেটেও তিনশ' ডলার আছে। এই যুক্তি যেটুকু প্রমাণ করে তা হচ্ছে এই যে, নিরঙ্কুশ সত্তার ধারণায় তার অস্তিত্বের ধারণাও বিদ্যমান। কিন্তু আমার মনের নিরঙ্কুশ সত্তার ধারণা আর সেই সত্তার বাস্তব অস্তিত্বের মধ্যে রয়েছে একটা ব্যবধান; এই ব্যবধান চিন্তা ও যুক্তি মারফত অতিক্রম করা সম্ভব নয়। যেভাবে এই যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে, তাতে এটা একটা 'পিটিশিও প্রিন্সিপি' বা সাধ্যসম প্রতিজ্ঞামাত্র। কারণ যে বিষয়টি প্রমাণের লক্ষ্য, অর্থাৎ কল্পনা থেকে বাস্তবে আগমন, তাকেই এই যুক্তিতে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

আশা করি, আপনাদের কাছে এ-কথাটা পরিষ্কার করে তুলেছি যে, সাধারণত যেভাবে তত্ত্ববাদী ও উদ্দেশ্যবাদী যুক্তির অবতারণা করা হয়ে থাকে, তাতে এদের সাহায্যে আমরা কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারি নে। আর এই যুক্তি দুটোর ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে এরা চিন্তাকে দেখে এমন একটা কর্তারূপে যা বস্তুর উপর ক্রিয়া করে বাইরে থেকে। চিন্তার সম্বন্ধে এই যে ধারণা তাতে আমরা এক ক্ষেত্রে পাই এক নিছক যন্ত্রশিল্পীর সন্ধান, আর এক ক্ষেত্রে পাই কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে সৃষ্টি এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। তবে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, চিন্তা এমন কোন নীতি নয় যা বাইরে থেকে তার উপকরণের ব্যবস্থা ও ঐক্য বিধান করে, বরং চিন্তা এমন একটা শক্তি যা তার উপকরণকে সৃষ্টি করে নিতে পারে। চিন্তা ও ধারণাকে যখন এভাবে গ্রহণ করা হয়, তখন তা বাস্তবসমূহের মূল স্বভাবের বিরোধী নয়, বরং এটাই হচ্ছে যাবতীয় বস্তুর চরম ভিত্তি এবং তাদের সত্তার প্রাণবস্তু তাদের যাত্রার সূচনা থেকেই তাদের মধ্যে নিহিত থাকে এবং এক স্বতঃনির্ধারিত লক্ষ্যের পথে তাদের অগ্রগতিকে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা ও সত্তার দ্বৈতভাব অপরিহার্য। মানুষের জ্ঞানের প্রত্যেকটি কাজ সত্তাকে দুই অংশে ভাগ করে, তার এক অংশ হচ্ছে জ্ঞান আর তার অন্য বিরোধী অংশ হচ্ছে জ্ঞাত বস্তু। অথচ উপযুক্ত অনুসন্ধানে তাদের মধ্যে ঐক্যের সূত্র মিলে যায়। এই জন্যে আমরা ধরে নিতে বাধ্য হই যে, সত্তার মুকাবিলায় আমরা যে বস্তুকে দেখতে পাই সে বস্তুর অস্তিত্বের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অধিকার আছে, ব্যক্তিসত্তার উপর তা নির্ভরশীল নয়, আর ব্যক্তিসত্তা বস্তুকে জানলে বস্তুর কোন পরিবর্তন হয় না। আমরা যদি দেখতে পারি যে, বর্তমান মানবীয় পরিস্থিতি চূড়ান্ত নয় এবং চিন্ত া ও সত্তা পরিণামে একই, তবেই তত্ত্ববাদী ও উদ্দেশ্যবাদী যুক্তির সত্যিকার তাৎপর্য পরিস্ফুট হবে। শুধু যদি কুরআন প্রদত্ত সূত্র অনুসারে আমরা অভিজ্ঞতার পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করি তা হলেই এটা সম্ভব। কারণ কুরআন বাইরের ও ভেতরের অভিজ্ঞতাকে মনে করে একই সত্তার প্রতীকরূপে। এই সত্তাকে কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে আদি ও অন্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য বলে। বর্তমান বক্তৃতায় আমি কুরআনের উক্ত পন্থাই আলোচনা করব।

কালের মধ্যে ক্রমে অভিজ্ঞতা বিকাশ লাভ করছে। এই অভিজ্ঞতার এখন তিনটি প্রধান স্তর লক্ষিত হয়, বস্তুর স্তর, জীবনের স্তর ও আত্মচেতনার স্তর। এগুলো যথাক্রমে পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

প্রথমে বস্তু নিয়ে আলোচনা করা যাক। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারণ করতে হলে বস্তু বলতে আমরা কি বুঝি তা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। ফলিতবিজ্ঞান হিসেবে পদার্থবিজ্ঞানের কারবার হচ্ছে অভিজ্ঞতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার তথ্য নিয়ে। বস্তুত পদার্থবিজ্ঞানীর যে গবেষণা, তার আরম্ভ ও ইতি উভয় ইন্দ্রিয়গোচর প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলোকে ভিত্তি করে। এগুলোকে বাদ দিয়ে পদার্থবিজ্ঞানীর পক্ষে তাঁর মতবাদের যথার্থ নির্ণয় অসম্ভব। ইন্দ্রিয় অগোচর বা অনুভবের অতীত যে সব সত্তা, যেমন পরমাণুরাশি, পদার্থ বিজ্ঞানীরা তা বিনা প্রমাণে স্বীকার করে নিতে পারেন। তবে তাঁর পক্ষে এরূপ করার কারণ হচ্ছে, অন্য কোন উপায়ে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করতে অপারগ। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বস্তুজগত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়প্রকটিত জগতই হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানীর বিচার্য বিষয়। বস্তুজগতের বিচারে যে মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন তা পদার্থবিজ্ঞানের এলাকায় পড়ে না। অনুরূপভাবে ধর্ম ও সৌন্দর্যগত অভিজ্ঞতাও পদার্থবিজ্ঞানের এখতিয়ারে আসে না, যদিও তা গোটা অভিজ্ঞতারই অংশ। এর স্পষ্ট কারণ হচ্ছে, পদার্থবিজ্ঞানের অনুসন্ধান শুধু বস্তুজগতে সীমাবদ্ধ। এই বস্তুজগত বলতে আমরা সেই সব বস্তুর জগতকে বুঝি, যা আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করতে পারি। কিন্তু যদি আপনাদের জিজ্ঞেস করি যে, বস্তু জগতে আপনারা কি কি জিনিস অনুভব করেন, তা হলে আপনারা অবশ্য আপনাদের চারদিকের পরিচিত জিনিসগুলোর কথাই উল্লেখ করবেন, যথা-পৃথিবী, আকাশ, পাহাড়, পর্বত, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি। এর পর যদি আরও জিজ্ঞেস করি এসব জিনিসে আপনারা ঠিক কি অনুভব করেন? তার জবাবে আপনারা বলবেন যে, আপনারা এদের গুণাবলী অনুভব করেন। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এ জাতীয় প্রশ্নের জবাব হিসেবে আমরা প্রকৃতপক্ষে আমাদের ইন্দ্রিয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতারই বিশ্লেষণ করছি। আর এই বিশ্লেষণের লক্ষ্য হচ্ছে বস্তু ও তার গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ। প্রকৃত প্রস্তাবে এটাই হচ্ছে জড়বাদ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর প্রকৃতি, অনুভবকারী মনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এবং তাদের চরম কারণ সম্বন্ধীয় মতবাদ। এই মতবাদের সারাংশ হচ্ছে এই :

> ইন্দ্রিয়গাহ্য বিষয়সমূহ (যথা বর্ণ, শব্দ ইত্যাদি) মনেরই কতকগুলো অবস্থা। কাজেই বস্তুর আসল রূপ এসব নয়; এগুলো কেবল বাইরের জিনিস। এই জন্যে কোন সঙ্গত কারণেই ওগুলো প্রাকৃতিক বস্তুর গুণাবলী হতে পারে না। আমি যখন বলি, আকাশটা নীল; তখন তার অর্থ শুধু এই হতে পারে যে, আকাশটা আমার মনে নীল অনুভূতি সৃষ্টি করে; নীল বর্ণটা আকাশের নিজস্ব গুণ নয়। মানসিক অবস্থা হিসেবে এসব আমাদের মনের কতকগুলো ধারণা অর্থাৎ আমাদের মনের উপর বাইরের জগতের প্রতিক্রিয়ার ফল। বস্তুজগত আমাদের ইন্দ্রিয়, স্নায়ু ও মস্তি

ক্ষের মারফত কাজ করে মনের উপর এই ফল উৎপাদন করে। বস্তুজগতের এই ক্রিয়া সম্পাদিত হয় সংযোগ কিংবা সংঘর্ষের মাধমে। কাজেই আকৃতি, আকার, ঘনত্ব ও শক্তি এসব গুণ বস্তুর থাকতেই হবে।

'বস্তুই হচ্ছে আমাদের অনুভূতিসমূহের অজ্ঞাত কারণ'- এই মতবাদ খণ্ডন করতে যিনি প্রথম এগিয়ে এলেন, তিনি হচ্ছেন দার্শনিক বার্কলে। আমাদের কালের বিশিষ্ট গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক হোয়াইটহেড চূড়ান্তভাবেই দেখিয়েছেন যে, জড়বাদের যে প্রচলিত নীতি, তা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। এটা স্পষ্ট যে, এই নীতি অনুসারে বর্ণ, শব্দ ইত্যাদি মানসিক অবস্থারই নামান্তর, প্রকৃতির কোন অংশ তারা নয়। আমাদের চোখে-কানে যা প্রবেশ করে, তা বর্ণও নয়, শব্দও নয়, বরং তারা রাশি রাশি ইথারতরঙ্গ এবং শ্রুতির অগোচর বায়ুতরঙ্গ। প্রকৃতিকে আমরা যা জানি, ঠিক তা সে নয়। আমাদের অনুভূতিগুলো মায়া মাত্র, প্রকৃতির যথার্থ অভিব্যক্তি বলে এদের মনে করা চলে না। জড়বাদের নীতি অনুসারে প্রকৃতি দুই ভাগে বিভক্ত : এক ভাগে সব মানসিক ছাপ, আরেক ভাগে এইসব মানসিক ছাপের উৎপাদক এমন সব সত্তা যা প্রমাণ করা সম্ভব নয়, অনুভব করাও সম্ভব নয়। পদার্থবিজ্ঞান যদি প্রকৃতই প্রত্যভাবে পরিচিত বস্তুনিচয়ের সুসামঞ্জস্য ও যথার্থ জ্ঞান হয়, তা হলে বস্তুসম্বন্ধীয় প্রচলিত মতবাদকে বর্জন করতে হয়; কেননা, আমাদের ইন্দ্রিয়াদির যে সাক্ষ্যের উপর পদার্থবিজ্ঞানীরা একমাত্র নির্ভর, এ মতবাদ সেই সাক্ষ্যকেই মনে করে মনের কতকগুলো নিছক ছাপ বলে। বস্তুত এই মতবাদ প্রকৃতি ও প্রকৃতির পর্যবেক্ষকের মধ্যে এমন একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করে যা দূর করার জন্যে পদার্থবিজ্ঞানীকে বাধ্য হয়ে একটা অনিশ্চিত অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়। সে অনুমান হচ্ছে এই যে, একটা অননুভবনীয় কিছু অনন্ত দেশে ব্যাপ্ত হয়ে আছে এবং কোন পাত্রে অবস্থিত একটা বস্তুর মতই এই অননুভবনীয় একটা কিছু কোন উপায়ে সংঘর্ষ দ্বারা অনুভূতির সৃষ্টি করছে। অধ্যাপক হোয়াইটহেডের কথায় বলতে গেলে এই মতবাদ প্রকৃতির অর্ধেকটাকে করে স্বপ্নে পরিণত, বাকি অর্ধেকটাকে জল্পনায়। পদার্থবিজ্ঞান যখন দেখল তার ভিত্তিটারই সমালোচনা প্রয়োজন, তখন সে নিজের গড়া আদর্শটাকেই শেষ পর্যন্ত ভেঙে ফেলা সঙ্গত মনে করল। যে প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে মনে হয়েছিল বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের অবশ্যম্ভাবী উৎস, পরিণামে তাই দেখা দিল বস্তুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহরূপে। তা হলে বস্তু সূক্ষ্ম জড়ের দ্বারা কৃত কোন মানসিক অবস্থা নয়, তা যথার্থই প্রকৃতিতেই বিদ্যমান এবং তাই প্রকৃতির সারবস্তু। এই বস্তু প্রকৃতিতে যেমনটি রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবেই আমরা তার পরিচয় পেয়ে থাকি। কিন্তু বস্তুর ধারণা সবচেয়ে বড় মার খেয়েছে আরেকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর হাতে। তিনি হচ্ছেন আইনস্টাইন। মানুষের গোটা চিন্তা জগতে তার আবিষ্কারগুলো করেছে এক সুদূরপ্রসারী বিপ্লবের ভিত্তি রচনা। মিঃ রাসেল বলেন,

'আপেক্ষিকতাবাদ কালকে স্থান-কালের মধ্যে বিলীন করে বস্তু সত্তা সম্বন্ধীয় প্রচলিত ধারণার যতখানি ক্ষতি করেছে, দার্শনিকদের যাবতীয় যুক্তিতর্ক তা করতে

> পারে নি। সাধারণ ধারণায় পদার্থ এমন এক বস্তু যার অবস্থান কালের বুকে এবং চলাচল স্থানের মধ্যে। কিন্তু আধুনিক আপেক্ষিকতাবাদী পদার্থবিজ্ঞানের মতে এ ধারণাও আর সমর্থনীয় নয়। একখণ্ড বস্তু এখন আর পরিবর্তনশীল অবস্থাসম্পন্ন কোন স্থায়ী জিনিস বলে প্রতীয়মান না হয়ে পরস্পর সংশ্লিষ্ট ঘটনা বলে চিহ্নিত হয়। বস্তু নিরেট বলে এতকাল লোকের যে ধারণা ছিল, তা আর নেই। সেই সঙ্গে বস্তুর বিভিন্ন লক্ষণের ধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে। আগে জড়বাদীরা বস্তুর লক্ষণগুলো দেখেই মনে করতেন চলমান চিন্তার চেয়ে বস্তু বেশী বাস্তব।'

কাজেই দেখা যাচ্ছে, অধ্যাপক হোয়াইটহেডের মতে প্রকৃতি একটা 'শূন্যে' অবস্থিত নিশ্চল বস্তু নয়। প্রকৃতি হচ্ছে ঘটনাসমূহের এমন একটা বিন্যাস যাতে এক নিরবচ্ছিন্ন সৃজনীপ্রবাহের লণ বর্তমান মানুষের চিন্তা এই প্রবাহকে বিভক্ত করেছে পৃথক অনড় বস্তুরূপে। এই বস্তুনিচয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকেই স্থান ও কাল সম্বন্ধীয় ধারণার উৎপত্তি। ফলত আজ আমরা দেখছি কিভাবে আধুনিক বিজ্ঞান বার্কলের সমালোচনার সঙ্গে তার মতৈক্য ঘোষণা করছে। অথচ এক সময়ে আধুনিক বিজ্ঞান মনে করত বার্কলের সমালোচনা তার ভিত্তিমূলের উপরই একটা আক্রমণ। প্রকৃতিটা নিছক বস্তুসর্বস্ব, বিজ্ঞানের এই যে অভিমত, তা স্থান সম্পর্কে নিউটনীয় ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নিউটনের মতে স্থান হচ্ছে একটা নিরঙ্কুশ 'শূন্য', সকল বস্তু তারই ভেতর অবস্থিত। বিজ্ঞানের এই দৃষ্টিভঙ্গি তার উন্নতিকে ত্বরান্বিত করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু গোটা অভিজ্ঞতাকে মন ও বস্তু এই দু'টি বিপরীত এলাকায় বিভক্ত করার ফলে বিজ্ঞানের নিজের ঘরেই দেখা দিয়েছে অসুবিধা। তাই বিজ্ঞান এখন সে সব সমস্যা সম্বন্ধে বিবেচনা করতে বাধ্য হচ্ছে, যা সে তার যাত্রার শুরুতে করেছিল সম্পূর্ণ উপেক্ষা। গাণিতিক বিজ্ঞানের ভিত্তিগুলো নিয়ে যে সব আলোচনা হয়েছে তাতে পূর্ণরূপেই প্রকাশ পেয়েছে যে, নিছক জড়বাদ নিয়ে আর কারবার চলে না। স্থান কি তা হলে একটা নিরপেক্ষ 'শূন্য' থাকবে যাতে বস্তুনিচয় অবস্থিত? আর সব বস্তু সরিয়ে নিলেও কি সে 'শূন্য' থাকবে অবিকল? গ্রীক দার্শনিক জেনো স্থান সংক্রান্ত সমস্যাটির মুকাবিলা করেছেন স্থানভিত্তিক গতিসম্পর্কিত প্রশ্ন মারফৎ। গতির অবাস্তবতার পক্ষে তাঁর যে সব যুক্তি, তা দর্শনের ছাত্রদের কাছে সুপরিচিত। তাঁর সময় থেকেই চিন্তার ইতিহাসে এই সমস্যাটি বারবার চলে এসেছে এবং পরবর্তীকালে সব চিন্তানায়কেরই গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। জেনোর দু'টি যুক্তি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। স্থানকে তিনি অসংখ্য ভাগে বিভাজ্য মনে করতেন। তাঁর একটি যুক্তি হল যে, স্থানের মধ্যে গতি অসম্ভব। গন্তব্য বিন্দুতে পৌঁছুবার আগে চলমান বস্তুকে তার যাত্রা বিন্দু ও গন্তব্য বিন্দুর মধ্যবর্তী অর্ধস্থান অতিক্রম করতে হবে এবং সেই অর্ধস্থান অতিক্রম করার আগে সেই অর্ধের অর্ধেকের ভেতর দিয়ে যেতে হবে এবং এইভাবে তার যাত্রা হবে অসীম অন্যের দিকে। আমরা স্থানের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে যেতে পারি না, যতক্ষণ সেই বিন্দুর মধ্যবর্তী স্থানের অসংখ্য বিন্দু অতিক্রম না করি। কিন্তু সসীমকালে এই অনন্ত বিন্দুরাশি

অতিক্রম করা অসম্ভব। তিনি আরো বলেন যে, উড়ন্ত যে তীর তা চলে না, কারণ উড়াকালীন যে কোন সময় সেই তীর স্থানের কোন না কোন বিন্দুতে স্থির হয়ে থাকে। কাজেই জেনোর মতে, গতি একটা ভ্রান্ত শ্রুতি মাত্র; আর সত্তা অখণ্ড ও অপরিবর্তনীয়। গতির অবাস্তবতা দ্বারা এক অন্যনিরপেক্ষ স্থানের অবাস্তবতাই বোঝায়। আশারীয় মতবাদ অনুসারে মুসলিম চিন্তানায়কগণ স্থান ও কালের অন্তহীন বিভাজ্যতায় বিশ্বাস করেননি। তাদের মতে, বিন্দু ও মুহূর্ত দ্বারাই স্থান, কাল ও গতি গঠিত। এই বিন্দু ও মুহূর্তকে আর ভাগ করা চলে না। অতি সূক্ষ্মও অবিভাজ্য বিন্দু ও মুহূর্তের অস্তিত্ব রয়েছে, এই অনুমানের উপর ভিত্তি করেই তাঁরা গতির সম্ভাবনা প্রমাণ করেছেন। কারণ স্থান ও কালের বিভাজ্যতার যদি শেষ থাকে, তা হলে সসীমকালে স্থানের একবিন্দু পর্যন্ত চলাচল সম্ভব না হবে কেন? ইবনে হাজম কিন্তু আশারীয়দের অবিভাজ্য সূক্ষ্ম বিন্দু মুহূর্তের ধারণা নাকচ করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আধুনিক গাণিতিকগণও তাঁর মতবাদ সমর্থন করেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আশারীয়দের যুক্তিও জেনোর আপাত স্ববিরোধী যুক্তিকেই খণ্ডন করতে পারে নি। আধুনিক চিন্তানায়কদের মধ্যে ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ এবং বৃটিশ গাণিতিক ব্যার্ট্রান্ড রাসেল নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে জেনোর যুক্তি খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। বার্গসঁ'র মতে সত্যিকার পরিবর্তন হিসেবে গণিতই হচ্ছে মৌলিক সত্তা। স্থান ও কালের ভ্রান্ত ধারণা থেকেই জেনোর আপাতঃবিরোধী যুক্তির উৎপত্তি। বার্গসঁ মনে করেন, স্থান ও কাল গতির বুদ্ধিগত ধারণামাত্র। জীবনের এক দার্শনিক তত্ত্বের উপর বার্গসঁ তাঁর যুক্তিকেই দাঁড় করিয়েছেন। এই তত্ত্বের বিশদ আলোচনা ছাড়া আমাদের পক্ষে বার্গসঁ'র যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। বার্ট্রান্ড রাসেলের যুক্তি অগ্রসর হয়েছে ক্যালটরের গাণিতিক ধারাবাহিকতার মতবাদকে অবলম্বন করে। তাঁর মতে, গাণিতিক ধারাবাহিকতা আধুনিক গণিতশাস্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। স্থান ও কাল অনন্ত সংখ্যক বিন্দু ও মুহূত্তের সমষ্টি স্পষ্টত এই অনুমানের উপরই জেনোর যুক্তি প্রতিষ্ঠিত। এই অনুমান অনুসারে সহজেই তর্ক চলতে পারে যে, চলমান বস্তু যখন দুই বিন্দুর মধ্যে অবস্থানহীন হয়ে পড়ে, তখন তার গতি কি করে সম্ভব? কেননা দুই বিন্দুর মধ্যস্থলে এমন কোন স্থান নেই, যেখানে গতি সংগঠিত হতে পারে। ক্যান্টরের আবিষ্কার দেখিয়েছে যে, স্থান ও কাল বিরামহীন। স্থানের যে কোন দু'টি বিন্দুর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য বিন্দু; আর এই অনন্ত বিন্দু ধারার কোন দু'টি বিন্দুই পর পর অবস্থিত নয়। স্থান ও কালের অন্তহীন বিভাজ্যতার মানে হচ্ছে এই যে, শ্রেণী-বিন্দুগুলোর মধ্যে ঘনত্ব আছে। এর অর্থ হল তাদের প্রত্যেকের মধ্যে ফাঁক রাখার জন্যে বিন্দুগুলো পরস্পর পৃথকভাবে অবস্থান করছে। কাজেই রাসেল জেনো'র মতবাদের জবাব দিলেন এইভাবে :

> জেনো প্রশ্ন করেছেন, এক মুহূর্তে একস্থানে অন্যমুহূর্তে অন্যস্থানে যেতে চাইলে যাওয়ার পথে মাঝখানে কালহীন ও স্থানহীন কোথাও অবস্থান না করে কি করে আপনি যেতে পারেন? এর উত্তর হচ্ছে কোন স্থানেরই পরবর্তী স্থান নেই; কোন মুহূর্তেরই পরবর্তী মুহূর্ত নেই; কারণ যে কোন দু'টি স্থান ও মুহূর্তের মধ্যে সব সময়ই আর একটা স্থান বা মুহূর্ত রয়েছে। আর যদি অবিভাজ্য সূক্ষ্ম বিন্দু মুহূর্ত

থাকত, তা হলে গতি সম্ভব হ'ত না, কিন্তু অবিভাজ্য সূক্ষ্ম বিন্দু মুহূর্ত বলে কিছু নেই। কাজেই জেনো'র এ কথা ঠিক যে, তীর ছোটার সময়কে প্রত্যেক মুহূর্তেই স্থির হয়ে থাকে। কিন্তু সে কারণেই তীরের গতি নেই এ অনুমান তাঁর ভুল। কারণ যে কোন গতিতে স্থানের অসীম ধারা ও মুহূর্তের অসীম ধারার মধ্যে এক এক পর্যায়ে সাযুজ্য রয়েছে। কাজেই এ মতবাদ অনুসারে স্থান, কাল ও গতির বাস্তবতা স্বীকার করা এবং সেই সঙ্গে জেনোর যুক্তির স্ববিরোধিতা এড়ানো সম্ভব।

এইভাবে বার্ট্রান্ড রাসেল ক্যান্টরের ধারাবাহিকতার মতবাদকে ভিত্তি করে গতির বাস্তবতা প্রমাণ করেছেন। গতির বাস্তবতা বলতে বোঝায় যে, স্থানের স্বাধীন সত্তা আছে এবং প্রকৃতিও কেবল কল্পনামাত্র নয়, তারও একটা বাস্তব সত্তা আছে। কিন্তু স্থানের ধারাবাহিকতা ও তার অন্তহীন বিভাজ্যতা এই দুইকে অভেদ মনে করলেও সমস্যার সমাধান হয় না। এক সসীম 'শূন্য' অসীমসংখ্যক মুহূর্ত এবং স্থানের এক সসীম অংশ অসীমসংখ্যক বিন্দুর মধ্যে একাত্মক অনুরূপতা স্বীকার করে নিলেও বিভাজ্যতাজনিত অসুবিধাটা পূর্ববৎই থেকে যায়। অনন্তক্রম হিসেবে ধারাবাহিকতার যে গাণিতিক ধারণা, তার প্রয়োগ হয় বরং বাইরে থেকে, বিবেচিত গতির বেলায় হয় না, এ ধারণায় প্রয়োগ হয় বরং বাইরে থেকে দেখা গতির ছবি সম্বন্ধে। গতির যে বাস্তব ক্রিয়া, তাকে ভাগ করা চলে না। স্থানের ভিতর দিয়ে তীরের যে গতি আমরা দেখি, সে গতিকে ভাগ করা চলে কিন্তু তীরের গতিকে একটি ক্রিয়া বলে বিবেচনা করলে তা অখণ্ডরূপেই প্রতিভাত হয়। তখন এ গতিকে খণ্ড খণ্ড অংশে ভাগ করা যায় না। গতিকে ভাগ করলে তা আর গতি থাকে না।

আইনস্টাইনের মতে স্থান বাস্তব, কিন্তু পর্যবেক্ষকের বেলায় তা আপেক্ষিক। নিউটন বলেন যে, স্থান অন্য নিরপেক্ষ। আইনস্টাইন এ মত প্রত্যাখ্যান করেন। আমরা যে জিনিস দেখি তা পরিবর্তনশীল, দ্রষ্টার কাছে তা আপেক্ষিক। দ্রষ্টার গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্ট বস্তুর পরিমাণ ও আকারের পরিবর্তন ঘটে। গতি এবং স্থিতিও দ্রষ্টার সম্পর্কে আপেক্ষিক। কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন পদার্থবিজ্ঞান যাকে স্বয়ংজীবী বস্তু বলত, বাস্তবে তেমন কোন জিনিস নেই।

তবে এখানে একটি ভুল ধারণার সম্ভাবনা আছে, সে সম্পর্কে আমাদের পূর্বাহ্ণেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। 'দ্রষ্টা' শব্দের ব্যবহারই এই সম্ভাব্য ভুল ধারণার উৎস। উইলডন কার তো সত্যিই ভুল করেছিলেন। তাঁর ধারণায়, আপেক্ষিকতাবাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে নিরবয়বমূলক ভাববাদ। সত্য বটে, আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে দৃষ্টিগোচর প্রাকৃতিক বস্তুর আকৃতি, আকার ও অবস্থান অন্য নিরেপক্ষ নয়। কিন্তু অধ্যাপক নান দেখিয়েছেন যে, স্থান-কালের যে কাঠামো তা দ্রষ্টার মনের উপর নির্ভর করে না; বরং বস্তুজগতের যে বিন্দুটির সঙ্গে দ্রষ্টার দেহ সংশ্লিষ্ট, তারই উপর এই কাঠামোর নির্ভর। বস্তুত, দ্রষ্টার বদলে সহজেই একটা রেকর্ড যন্ত্র বসান যেতে পারে। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি তো মনে করি, সত্তার চরম স্বরূপ হচ্ছে আধ্যাত্মিক। কিন্তু একটা ভ্রান্ত ধারণা যাতে প্রসার লাভ

করতে না পারে তার জন্যে এখানে দেখিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসেবে আইনস্টাইনের যে মতবাদ তার কারবার হচ্ছে বস্তুনিচয়ের কেবলমাত্র গঠন নিয়ে। সুতরাং যেসব বস্তুর এই গঠন তাদের অন্তিম প্রকৃতির উপর এ মতবাদ কোন আলোকপাত করে না। এই মতবাদের দার্শনিক মূল্য দুই রকমের। প্রথমত, এই মতবাদ প্রকৃতির বস্তুত্বকে নষ্ট করে না, নষ্ট করে সেই মতবাদকে যে মতবাদ অনুসারে পদার্থ হচ্ছে স্থানের ভেতরে অবস্থিত মাত্র এবং যে মতবাদ থেকে প্রাচীন দর্শনবিজ্ঞানে হয়েছিল বস্তুবাদের উদ্ভব। আধুনিক আপেক্ষিকতাভিত্তিক পদার্থবিজ্ঞানের মতে, সার পদার্থ পরিবর্তনশীল, অবস্থাবিশিষ্ট কোন স্থায়ী জিনিস নয়; পদার্থটা হচ্ছে পরস্পর সম্পৃক্ত ঘটনাবলীর একটা বিন্যাস। হোয়াইটহেড যেভাবে এই মতবাদ পরিবেশন করেছেন তাতে পদার্থের ধারণা সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে, তার স্থলে দেখা দিয়েছে জৈবিক ধারণা। দ্বিতীয়ত, এই মতবাদে স্থান হয়ে পড়ে বস্তুর উপর নির্ভরশীল। আইনস্টাইনের মতে, পৃথিবী অনন্ত শূন্যে অবস্থিত একটা দ্বীপের মত নয়; পৃথিবীটা সসীম কিন্তু সীমাহীন-এর বাইরে কোন শূন্যস্থান নেই। পদার্থ না থাকলে বিশ্ব ছোট হয়ে একটা বিন্দুতে পরিণত হতো। যে দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে আমি বক্তৃতাগুলো করছি, সেদিক থেকে এই মতবাদের বিচার করলে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ আমাদের সামনে মস্ত একটা অসুবিধা অর্থাৎ কালের অসারত্ব বা অবাস্তবতা তুলে ধরে। যে মতবাদ কালকে স্থানের একটা চতুর্থ মাত্রা বলে মনে করে, মনে হয় তা অবশ্যই ভবিষ্যৎকেও মনে করে এমন একটা জিনিসরূপে, যা পূর্ব থেকেই অতীতের মতে নিঃসন্দেহ রকমে দেওয়া আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, এ মতবাদ অনুসারে অবাধ সৃজনশীল গতি হিসেবে কালের কোন অর্থ নেই। কাল এখানে অতিবাহিত হয় না; ঘটনাও সংঘটিত হয় না, আমরা তাদের সাক্ষাৎ পাইমাত্র। তবে এ কথা ভুললে চলবে না যে, আমরা উপলব্ধি করে থাকি কালের এমন কতকগুলো গুণকে এই মতবাদ উপেক্ষা করে। প্রকৃতির যেসব রূপ গাণিতিকভাবে বিচার করা চলে, শুধু সেসব রূপের ধারাবাহিক বিবরণ দানের জন্যে আপেক্ষিকতাবাদ কালের কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে বটে, কিন্তু তাতে এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, সেই সব বৈশিষ্ট্যের অতিরিক্ত আর কোন বৈশিষ্ট্য কালের নেই। তা ছাড়া, আইনস্টাইন বর্ণিত কালের প্রকৃত স্বরূপ যে কি, তা আমাদের মত অবিশেষজ্ঞের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, আইনস্টাইনের কাল বার্গসঁ'র নিছক অবস্থানের মেয়াদমাত্র নয়। আমরা এ কালকে ক্রমিক বা ধারাবাহিক সময় বলেও গণ্য করতে পারি না। কান্ট কার্যকারণ সম্বন্ধের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতে ক্রমিক-কালই হচ্ছে কার্যকারণ সম্বন্ধে মূল বস্তু। কারণ এবং কার্যের পারস্পরিক সম্পর্কটা এমন যে, কালানুসারে কারণটা তার কার্যের পূর্বে থাকবে এবং সেহেতু কারণ না থাকলে তার কার্যও সম্ভব হবে না। গাণিতিক কালকে যদি ধারাবাহিক সময় বলে ধরা হয়, তা হলে এই মতবাদের ভিত্তিতেই কার্যকে তার কারণের পূর্বগামী বলে প্রমাণ করা সম্ভব। এর জন্যে শুধু প্রয়োজন দ্রষ্টার গতিবেগ আর যে পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কতকগুলো ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে, তার বেগ এই দুই বেগের সতর্ক নির্বাচন। আমার মনে হয়, কালকে স্থানের চতুর্থ মাত্রা বলে গণ্য করলে তা সত্যই

আর কাল থাকে না। আধুনিক রুশ লেখক আউসপেনস্কী তাঁর 'টারশিয়াম অর্গানাস' নামক গ্রন্থে স্থানের চতুর্থ মাত্রা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, একটা ত্রিমাত্রিক চিত্রের যে দিকটা তার নিজের মধ্যে নেই, সেই দিকে তার যে গতি, সেটাই হচ্ছে চতুর্থ মাত্রা। বিন্দুরেখা এবং তলের যে দিকটা তাদের নিজেদের মধ্যে নেই, সেই দিকে তাদের গতির দ্বারা যেমন আমরা সাধারণ তিনটি মাত্রার ধারণা পেয়ে থাকি, ঠিক তেমনি ত্রিমাত্রিক চিত্রের যে দিকটা নিজের মধ্যে নিহিত নেই, সে দিকে তার চলাচল দেখে আমরা স্থানের চতুর্থ ধারণা অবশ্যই পাব। আর যেহেতু কালটা হচ্ছে সে দূরত্ব, যা ঘটনাসমূহকে পর্যায়ক্রমিকভাবে পৃথক করে এবং বিভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তারূপে তাদেরকে গেঁথে রাখছে, সেই হেতুই স্পষ্টত কাল এমন একটা দূরত্ব যা ত্রিমাত্রিক স্থানের মধ্যে নেই- এমন একটা দিকে অবস্থিত। নতুন মাত্রা হিসেবে, পর্যায়ক্রমিকভাবে ঘটনাসমূহকে পৃথককারী এই দূরত্ব ত্রিমাত্রিক স্থানের মাত্রাগুলোর সঙ্গে খাপ খায় না, যেমন একটি বছর খাপ খায় না সেন্টপিটার্সবার্গের সঙ্গে। ত্রিমাত্রিক স্থানের সব ক'টি দিকের বেলায়ই কাল লম্ব স্বরূপ; আর তাদের কোনটার সঙ্গেই কাল সমান্তরাল নয়। আউসপেন্স্কী এই একই গ্রন্থের অন্যত্র আমাদের কাল জ্ঞানকে বর্ণনা করেছেন একটা অস্পষ্ট স্থান-জ্ঞান বলে। আর আমাদের মানসিক গঠনের উপর ভিত্তি করে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এক, দুই বা তিন মাত্রাবিশিষ্ট সত্তাসমূহের কাছে উচ্চতর মাত্রাটা সব সময় কালভিত্তিক পর্যায় বলে প্রতিভাত হবেই। তা হলে স্পষ্টতই এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে ত্রিমাত্রিক জীব হিসেবে আমাদের কাছে যা কাল বলে প্রতিভাত হয়, আসলে তা অসম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ একটা স্থান ঘটিত মাত্রা মাত্র; নিজস্ব স্বভাবের দিক দিয়ে এই স্থান ঘটিত মাত্রা পূর্ণরূপে উপলব্ধ ইউক্লিডীয় স্থানের মাত্রাগুলো থেকে স্বতন্ত্র নয়। অন্য কথায়, কাল কোন সত্যিকারের সৃজনশীল গতি নয়; আর আমরা যেগুলোকে ভবিষ্যৎ ঘটনা বলি, তা নতুন সংঘটিত ব্যাপার নয়। এগুলো হচ্ছে এমন কতকগুলো জিনিস যা পূর্ব থেকেই প্রদত্ত এবং এক অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিত রয়েছে। অথচ ইউকিড আবিষ্কৃত তিনটি মাত্রার অতিরিক্ত আর একটি নতুন মাত্রার সন্ধানের জন্যে আউস্পেন্স্কীর প্রয়োজন একটা সত্যিকারের ক্রমিক সময়ের অর্থাৎ দূরত্বের, যা ঘটনাসমূহকে রাখছে পর্যায়ক্রমে পৃথক পৃথক করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আউস্পেন্স্কীর যুক্তির একটি স্ত রের উদ্দেশ্য অনুসারে যে কালকে প্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছিল এবং ফলত দেখা হয়েছিল একটা ক্রমিক ধারারূপে, যুক্তির পরবর্তী এক স্তরে সেই কালকেই তার ধারাবাহিকতার বৈশিষ্ট্য থেকে বিযুক্ত করা হয়েছে এবং তাকে পরিণত করা হয়েছে এমন একটা জিনিসে যা স্থানের অন্যান্য রেখা ও মাত্রা থেকে কোন বিষয়েই স্বতন্ত্র নয়। কালের ক্রমান্বিত স্বরূপের দরুনই আউস্পেন্স্কী কালকে স্থানে অবস্থিত একটি সত্যিকারের নতুন দিক বলে গণ্য করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য যদি বাস্ত বিকই একটি ভ্রান্তিমাত্র হয়, তা হলে এর দ্বারা কি করে আউস্পেন্স্কীর একটি মৌলিক মাত্রার প্রয়োজন মিটতে পারে?

এবার অভিজ্ঞতার অন্যান্য স্তর অর্থাৎ জীবন ও চেতনা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। চেতনাকে জীবনের একটি বিক্ষেপ হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে। জীবনের অগ্রগতির পথ আলোকিত করার জন্যে চেতনা একটি ভাস্বর বিন্দুরূপে কাজ করে থাকে। এটা একটি মানসিক বিক্ষেপের ব্যাপার, একটা আত্মসংহৃতির অবস্থা। এর দ্বারাই জীবন সেই সব স্মৃতি ও সংযোগের দ্বারা রুদ্ধ করে বসে, উপস্থিত কার্যের সঙ্গে যাদের কোন সম্বন্ধ নেই। চেতনার সুনির্দিষ্ট কোন সীমা নেই; সাময়িক প্রয়োজন অনুসারে চেতনা সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে থাকে। চেতনাকে পদার্থের ক্রিয়া-ক্রমের একটি গৌণ লক্ষণ বলে বর্ণনা করার অর্থ হচ্ছে একটা স্বাধীন ক্রিয়াশীলতা হিসেবে একে অস্বীকার করা। আর স্বাধীন ক্রিয়াশীলতা হিসেবে একে অস্বীকার করলে জ্ঞানের বৈধতাকেই করা হয় অস্বীকার। কারণ জ্ঞানমাত্রই চেতনার একটি সুসংবদ্ধ প্রকাশ মাত্র। আসলে জ্ঞান হচ্ছে জীবনের এক প্রকার নিছক আধ্যাত্মিক নীতি, এক সুনির্দিষ্ট জীবন পদ্ধতি। বাইরে থেকে পরিচালিত যন্ত্রের ক্রিয়া-পদ্ধতির সঙ্গে রয়েছে এর মৌলিক পার্থক্য। খাঁটি আধ্যাত্মিক শক্তি অভিব্যক্ত হয় বোধগম্য উপাদানসমূহের এক সুনির্দিষ্ট সমাহারের মাধ্যমে। কাজেই এর বোধগম্য উপাদানসমূহের একটা নিশ্চিত সংযোজনের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া আমরা খাঁটি আধ্যাত্মিক শক্তির ধারণা করতে পারি না। ফলে আমরা এই উপাদান সমাহারকেই আধ্যাত্মিক শক্তির চরম ভিত্তি বলে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। পদার্থের ক্ষেত্রে নিউটনের আবিষ্কার আর প্রাকৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে ডারউইনের আবিষ্কার উভয় আবিষ্কারে শুধু একটা যান্ত্রিকতার পরিচয় মিলে। একদিন সকল সমস্যাকেই পদার্থবিজ্ঞানের সমস্যা বলে বিশ্বাস করা হতো। বলা হতো, শক্তি এবং পরমাণুগুলোর আপনা আপনি বেঁচে থাকার গুণসমূহের সহায়তায় জীবন, চিন্তা, ইচ্ছা এবং অনুভূতিসহ সকল বস্তুর ব্যাখ্যা হতে পারে। যান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারণা হচ্ছে নিছক একটা বাহ্যপ্রকৃতির ধারণা। এই ধারণায় প্রকৃতির সর্বাঙ্গীন ব্যাখ্যা নিহিত আছে বলে দাবী করা হতো। জীববিজ্ঞানের রাজ্যে যান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে এবং বিপক্ষে একটা তুমূল লড়াই এখনও চলছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইন্দ্রিয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে আমরা চরম সত্তার যে ধারণায় উপনীত হই তা সত্তার চরম স্বরূপ সম্বন্ধে ধর্ম যে ধারণা পোষণ করে, তার কি বিপরীত? জড়বাদই কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শেষ পরিণতি? এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বিজ্ঞানের মতবাদসমূহ নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের উৎপাদক। কেননা, তারা প্রতিপাদিক এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর পূর্বাভাস ও নিয়ন্ত্রণদাত্রী। তবে আমাদের এ কথা ভুললে চলবে না যে, যাকে বিজ্ঞান বলা হয়, তা পরম সত্তার একমাত্র সুসংবদ্ধ অভিমত নয়। বিজ্ঞান হচ্ছে পরম সত্তার বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে খণ্ড খণ্ড অভিমতের সংগ্রহমাত্র; তারা সমগ্র অভিজ্ঞতার বিভিন্ন টুকরা, তাদের একত্র করলে পরস্পরের সাথে খাপ খায় বলে মনে হয় না। পদার্থকে নিয়ে, জীবনকে নিয়ে এবং মনকে নিয়ে প্রাকৃতিকবিজ্ঞানের কারবার। কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি প্রশ্ন তুলবেন জীবন ও মন পরস্পরের সঙ্গে কিভাবে সম্পৃক্ত? সেই মুহূর্তে আপনি দেখতে পাবেন যে, বিভিন্ন রকমের যেসব বিজ্ঞান এই বিষয়গুলোর আলোচনা করে, তাদের স্বরূপ একান্তই বিভাগীয় এবং তারা এককভাবে আপনার প্রশ্নের একটা

পূর্ণ জবাব দিতে অক্ষম। বস্তুত, নানা ধরনের প্রকৃতিবিজ্ঞান শকুনের মতো প্রকৃতির মৃত দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে এবং এর এক টুকরা মাংস নিয়ে এক একজন দূরে উড়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবে প্রকৃতি নিতান্তই একটা কৃত্রিম ব্যাপার। সঠিকতার খাতিরে বিজ্ঞানকে যে নির্বাচন পদ্ধতির সাহায্যে প্রকৃতির বিচার করতে হয়, তার ফলেই এই কৃত্রিমতার সৃষ্টি। যে মুহূর্তে আপনি বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে গোটা মানবীয় অভিজ্ঞতার আওতায় ফেলবেন, সে মুহূর্তেই এর একটা ভিন্ন স্বরূপ প্রকাশ পেতে শুরু করবে। ধর্ম চায় সত্তার সমগ্রতা উপলব্ধি করতে এবং সে কারণে মানবীয় অভিজ্ঞতার যাবতীয় উপাত্তের (ড্যাটা-র) যে কোন রকমের সমন্বয়ে ধর্ম একটা কেন্দ্রগত স্থান অধিকার করবেই। কাজেই ধর্মের পক্ষে সত্তার কোন বিভাগীয় সন্দর্শনকেই ভয় করার কারণ নেই। প্রকৃতিবিজ্ঞান স্বভাবতই বিভাগীয়। এই প্রকৃতিবিজ্ঞান যদি তার নিজ প্রকৃতি ও কাজের সীমা মেনে চলে, তা হলে পরম সত্তার কোন পূর্ণ ধারণা সম্বন্ধে সে বিজ্ঞান কোন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। কাজেই জ্ঞান গঠনে আমরা যেসব ধারণার সাহায্য নিয়ে থাকি তা স্বরূপের দিক দিয়ে বিভাগীয় এবং অভিজ্ঞতার যে স্তরে তাদের প্রয়োগ করা হয়, সেই স্তরের সঙ্গে তাদের প্রয়োগটা আপেক্ষিক। যেমন- 'কারণ' সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তার একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, কারণ কাজের আগে ঘটবে। কারণ সম্বন্ধীয় এই ধারণাটা প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আপেক্ষিক। কারণ, অপরাপর বিজ্ঞান যে সব ক্রিয়াকলাপের বিচার করে থাকে, সেসবের বাইরে কোন এক বিশেষ রকমের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানের গবেষণা। আমরা যখন জীবন এবং মনের স্তরে উঠে আসি তখন কারণের ধারণা দিয়ে আমাদের আর কাজ চলে না। আমাদের তখন প্রয়োজন একটা ভিন্ন জাতীয় চিন্তার ধারণা। একটা উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে প্রাণবান জীবসমূহ কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তার পরিকল্পনা করে। এই প্রাণবান জীবমূহের কার্যকারণগত কার্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কাজেই আমাদের অনুসন্ধান করেই এমন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ধারণা বের করা দরকার, যা ভেতর থেকে ক্রিয়াশীল। 'কারণ' এর সে ধারণার মতো নয়, যে ধারণার মতে কারণ কাজের বাইরের জিনিস এবং বাইরে থেকে ক্রিয়াশীল। এ বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহ নেই যে, একটা প্রাণবান জীবের ক্রিয়াকলাপের এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রকৃতির অন্যান্য বস্তুর মধ্যেও দৃষ্ট হয়। এই সব বৈশিষ্ট্যের পর্যবেক্ষণে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের ধারণাসমূহের দরকার পড়বে। তবে জীবের যে ক্রিয়াকলাপ, তা মূলত একটা উত্তরাধিকারের ব্যাপার; আণবিক পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষায় সেসবের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। যা হোক, যান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারণা জীবনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে; কিন্তু কতদূর সে প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে তা আমাদের দেখতে হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি নিজে জীববিজ্ঞানী নই; আলোচনার সুবিধার জন্যে আমাকে স্বয়ং জীববিজ্ঞানীদেরই সাহায্য নিতে হবে। জে-এস-হ্যালডেন আমাদের বলেছেন, একটি প্রাণধারী জীব আর একটা যন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে, প্রাণধারী জীব আত্মপোষণ ও আত্মপ্রজননশীল, কিন্তু যন্ত্র সেরূপ নয়। এরপর তাঁর যে বক্তব্য তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

অতএব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, যদিও আমরা জীবদেহের ভেতর এমন বহু লক্ষণ দেখতে পাই, যাদের সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ না করা পর্যন্ত প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক কলাকৌশল বলে সন্তোষজনকভাবেই ব্যাখ্যা করা চলে, কিন্তু এদেরই পাশাপাশি আর যেসব লক্ষণ (যথা- আত্মপোষণ ও প্রজনন) রয়েছে, তাদের বেলায় এরূপ ব্যাখ্যা সম্ভব বলে মনে হয় না। জড়বাদীর ধারণা, দেহ যন্ত্রগুলো এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের পোষণ, সংস্কার ও প্রজনন নিজেরাই করতে পারে। জড়বাদীরা বলতে চান যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের সুদীর্ঘ ধারায়ই এ ধরনের যন্ত্রগুলোর ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এই হাইপথেসিস বা প্রকল্পটি পরীক্ষা করে দেখা যাক। আমরা যখন কোন একটা ঘটনা জড়বাদীর ভাষায় বর্ণনা করি, তখন তা আমরা সেই ঘটনা সৃষ্টির সহায়ক পৃথক পৃথক কল-কজার কতকগুলো সহজ গুণের ফল হিসেবেই করি। এই ঘটনার ব্যাখ্যা বা বর্ণনা বলতে এই বোঝায় যে, উপযুক্ত সন্ধানের পর আমরা এই অনুমানে পৌঁছেছি যে, ঘটনার উৎপাদনে পরস্পর ক্রিয়াশীল স্বতন্ত্র যন্ত্রপাতিগুলোর এমন কতকগুলো সহজ ও নির্দিষ্ট গুণ আছে, যা সব সময়ই একই রূপ অবস্থায় একইভাবে কাজ করে। যান্ত্রিক ব্যাখ্যার জন্যে প্রথমে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন অংশের অবতারণা করতে হবে। নির্দিষ্ট গুণাবলীসম্পন্ন বিভিন্ন অংশের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ না করলে যান্ত্রিক ব্যাখ্যার কোন অর্থ হয় না। আবার আত্মপ্রজনন ও আত্মপোষণশীল একটা যন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করার মানে হচ্ছে এমন একটা জিনিসকে স্বীকার করা, যাকে কোন রকমেই ব্যাখ্যা করা চলে না। শরীর বিজ্ঞানীরা কোন কোন সময় অর্থহীন পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন, কিন্তু সে পরিভাষায় 'প্রজননযন্ত্র' এই কথাটির মত একান্ত অর্থহীন কথার আর একটিও নেই। প্রজননকারী মূল জীবের মধ্যে একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থা যদি থাকেও, তবু প্রজননক্রিয়ার মূলে তার কোন সাক্ষাৎ আমরা পাই নি। প্রতিটি নতুন জীবনেই সে যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে উঠতে হয়, কেননা মূল জীবটি তার সন্তানের মধ্যে পুনর্জীবন লাভ করে তার দেহেরই এক একান্ত সূক্ষ্ম বিন্দু থেকে। বস্তুত প্রজননের কোন যন্ত্র বা যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকতে পারে না। নিয়ত নিজের দেহ সংরক্ষণ ও পুনর্গঠন করছে, এমন যন্ত্রের ধারণা স্ববিরোধী। যে যন্ত্রের বাচ্ছা-কাচ্ছা হয়, সে যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ থাকতে পারে না। আবার এমন অংশ না থাকলে তা আর যন্ত্র থাকে না।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, জীবন একটা অনুপম ব্যাপার; জীবনের বিশ্লেষণের জন্যে যন্ত্রের ধারণা যথেষ্ট নয়। ড্রিয়েস নামে অন্য একজন জীববিজ্ঞানী 'বাস্তব সমগ্রতা' বলে যাকে অভিহিত করেছেন, তা হচ্ছে এক রকমের ঐক্য। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই ঐক্যই আবার প্রতিভাত হয় বহুত্বের আকারে। নতুন অভ্যাস সংস্কার গঠন করে হোক কিংবা পুরাতন অভ্যাস সংস্কারে রদ-বদল করে হোক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেড়ে উঠার সকল উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টাতেই জীবনের একটা কর্মধারা রয়েছে; কিন্তু

যন্ত্রের বেলায় এই কর্মধারার কথা চিন্তাই করা যায় না। আর কর্মধারা থাকার অর্থ হচ্ছে এই যে, এক দূর-অতীতের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া জীবনের ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এই দূর-অতীতের মূল খুঁজতে হবে একটা আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে। যে কোন স্থানিক অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে এই আধ্যাত্মিক সত্তা প্রকাশিত হতে পারে, অবশ্য সে বিশ্লেষণ দ্বারা তার উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। কাজেই মনে হবে, জীবনটা ভিত্তিমূলক এবং সে ভিত্তি প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক কার্যক্রমের আগে অবস্থিত। কারণ এই প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক কার্যক্রমের যে নির্দিষ্ট স্বভাব আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার বিকাশ লাভ ঘটছে দীর্ঘকালব্যাপী বিবর্তনের ফলে। জীবন সম্বন্ধে যদি যন্ত্রশিল্পীর ধারণাগুলো প্রয়োগ করা হয়, তা হলে এ ধারণাও অপরিহার্য হয়ে ওঠে যে, বুদ্ধিবৃত্তিটাও বিবর্তনের সৃষ্টি। কিন্তু এর দ্বারা বিজ্ঞান এবং তার বাস্তবমুখী অনুসন্ধান নীতির মধ্যেই বিরোধ বাধিয়ে তোলা হয়: এ বিষয়ে আমি উইলডনের কাছ থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করব। তিনি এই বিরোধের কথা খুব জোরালো ভাষায় বর্ণনা করেছেন :

> বুদ্ধিবৃত্তির উদ্ভব যদি বিবর্তনের ফলেই হয়ে থাকে, তা হলে জীবনের প্রকৃতি ও মূল ভিত্তি সম্পর্কে গোটা যান্ত্রিক ধারণাই যৌক্তিক হয়ে পড়ে এবং বিজ্ঞানের অনুসৃত নীতিও তখন স্পষ্টতই পাল্টিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা কথাটা খোলাসা বর্ণনা করলেই তার মধ্যে তার স্ববিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বুদ্ধিবৃত্তিটা যদি জীবনেরই ক্রমবিবর্তনের ফলে উদ্ভূত কোন বস্তু হয়, তার সে বুদ্ধিবৃত্তি নিরঙ্কুশ নয়, বরং যে বস্তু একে ক্রমবিকশিত করেছে, এ তারই কাজের উপর নির্ভরশীল। অবস্থাটা যখন এই, তখন এরূপ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কি করে জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে কেবল জ্ঞাতকে নিরঙ্কুশ মনে করতে এবং তার উপর মতবাদ গড়ে তুলতে পারে ?

এবার আমি আর এক পথে জীবন ও চিন্তার আদি মূলে পৌঁছুবার চেষ্টা করব এবং আমাদের অভিজ্ঞতা বিচারের ধারায় আপনাদের আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাব; এর দ্বারা জীবনের মৌলিক অবস্থার উপর আরো খানিক আলোকপাত হবে এবং একটা আত্মিক ক্রিয়াশীলতা হিসেবে জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের একটা উপলব্ধি হবে। আমরা এর আগেই দেখেছি, অধ্যাপক হোয়াইটহেড এ বিশ্ব চরাচরকে বর্ণনা করেছেন স্থিতিশীল কোন কিছু রূপে নয়, বরং নিরবচ্ছিন্ন সৃজনপ্রবাহের লক্ষণবিশিষ্ট ঘটনাবলীর একটা বিন্যাসরূপে। কালের বুকে প্রকৃতির এই যে নিরন্তর অগ্রগমন- সম্ভবত এই গুণটিই হচ্ছে অভিজ্ঞতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। কুরআনও এই দিকটির উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছে। আশা করি, আমার আলোচনার শেষভাগে আমি এটা দেখাতে পারব যে, এই বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সত্তার চরম স্বরূপ বুঝবার উৎকৃষ্ট উপায়। এ সম্পর্কে কুরআনের যেসব আয়াত রয়েছে, তার কয়েকটির (৩ : ১৯০, ২ : ১৬৪, ২৪ : ৪৪) প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আমি এর আগেই আকর্ষণ করেছি। বিষয়টির অত্যধিক গুরুত্ব বিবেচনায় আমি এখানে আরো কয়েকটি আয়াত সংযোজন করব :

'নিশ্চয়ই, আল্লাহকে যাঁরা ভয় করেন তাঁদের জন্যে পরপর দিন-রাত্রির আগমনে এবং আকাশে ও পৃথিবীতে আল্লাহ্ যত কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে।' (১০ : ৬)

'আল্লাহ সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তা করার বা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছা করেন তাঁদের জন্যে তিনিই রাত্রি ও দিনকে পরস্পরের অনুসরণ করার বিধান দিয়েছেন।' (২৫৫ : ৬৩)

'তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ দিনের উপর রাত্রির আগমন এবং রাত্রির উপর দিনের আগমন ঘটান; এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে আইনের অধীন করেছেন; যে আইন অনুসারে তারা একটা নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলে?' (৩১ : ২৯)

'এটা তাঁরই (কাজ) যে, রাত্রি দিনের উপর ফিরে আসে এবং দিন রাত্রির উপর ফিরে আসে।' (৩৯ : ৫)

'এবং তাঁরই (কাজ) রাত্রির ও দিনের পরিবর্তন।' (২৩ : ৮০)

আরও কতকগুলো আয়াত আছে, যেগুলো সময় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের আপেক্ষিকতা নির্দেশ করে চেতনার অজ্ঞাত স্তরসমূহের সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করে। তবে আমি এখানে উল্লিখিত আয়াত কয়টিতে অভিজ্ঞতার যে দিকটার আভাস দেওয়া হয়েছে, শুধু সেই পরিচিত অথচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিকটার আলোচনা করেই সন্তুষ্ট থাকব। আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁদের মধ্যে বার্গসঁ হচ্ছেন একমাত্র চিন্তানায়ক, যিনি সময়ের পক্ষে অবস্থিতির লক্ষণটি নিয়ে সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করেছেন। প্রথমে আমি আপনাদের কাছে তাঁর অবস্থিতি সম্পর্কীয় ধারণা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করব। তারপর অস্তিত্বের (Existence-এর) সাময়িক রূপের একটা পূর্ণতর ধারণার যেসব তাৎপর্য, তা পূর্ণরূপে তুলে ধরার জন্যে দেখাব যে, তাঁর বিশ্লেষণ পর্যাপ্ত নয়। অস্তিত্বের চরম স্বরূপ সম্বন্ধে কি সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে, এটাই হচ্ছে আমাদের সামনে তত্ত্ববাদী সমস্যা। বিশ্ব চরাচর যে কালকে আশ্রয় করে অবস্থিত আছে, তাতে সন্দেহের অবকাশই নেই। তবু, বিশ্বটা যখন আমাদের বাইরে অবস্থিত, তখন এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার সম্ভাবনা আছে বৈ কি। কতকগুলো বিশেষ রকমের অস্তিত্ব আছে যাদের সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠে না। তাদের থেকে এ-ও আশ্বাস পাওয়া যায় যে, অবস্থিতিকালের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ আমরা পেতে পারি। সময়ের বুকে অবস্থিতির মানে ভাল করে বুঝতে হলে আমাদেরকে ঐ বিশেষ অস্তিত্বগুলোর পর্যালোচনা করতে হবে। যেসব বস্তু আমি সামনে দেখতে পাই, তাদের সম্বন্ধে আমার যে ধারণা তা অগভীর ও বাহ্যিক; কিন্তু আমার নিজের সম্বন্ধে আমার ধারণাটি আভ্যন্তরীণ, ঘনিষ্ঠ ও সুগভীর। তা হলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, সচেতন অভিজ্ঞতাটা সেই বিশেষ অস্তিত্ব যেখানে সত্তার (reality) সঙ্গে হয় আমাদের নিরঙ্কুশ যোগাযোগ। এই বিশেষ অস্তিত্বটির বিশ্লেষণ করলেই অস্তিত্বের চরম অর্থ অনেকটা বিশদ হয়ে উঠতে পারে। আমার অজ্ঞান অভিজ্ঞতার উপর যখন আমি আমার দৃষ্টিনিবদ্ধ করি তখন আমি কি দেখতে পাই? বার্গসঁ'র ভাষায় 'তখন আমি অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে চলি। আমি হয় গরম, না হয় ঠাণ্ডা বোধ করি। হয় আমি আনন্দিত, না হয় দুঃখিত হই।' আমি কাজ করি কিংবা কিছুই করি না। আমার চারদিকে যা আছে

তা তাকিয়ে দেখি অথবা আমি অন্য কিছু চিন্তা করি। অনুভূতি, আবেগ, ইচ্ছা, ভাব এই যেসব পরিবর্তন, এর মধ্যেই আমার অস্তিত্বটা বিভক্ত। পর্যায়ক্রমে এগুলোই আমার অস্তিত্বকে করে নানা রঙে রঞ্জিত। তা হলে দেখা যাচ্ছে, আমার অস্তিত্ব বিলোপ না করেই আমি পরিবর্তিত হচ্ছি। আমার অন্তর জীবনে স্থিতিশীল কিছু নেই। সব মিলে একটা নিরন্তর গতি, একটা নিরবচ্ছিন্ন অবস্থা প্রবাহ, একটা চিরন্তন ধারা। এর কোন বিরাম নেই; বিশ্রামের ব্যবস্থা নেই। এই যে নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন, কালের সাহায্য ছাড়া তা অচিন্তনীয়। আমাদের ভেতরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাদৃশ্য স্থাপন করে আমরা বলি যে, আমাদের সজ্ঞান অভিজ্ঞতার মানে হচ্ছে কাল আশ্রিত জীবন। আরও সূক্ষ্মভাবে সজ্ঞান অভিজ্ঞতার স্বরূপ অবলোকন করলে এটাই প্রতিভাত হয় যে, খুদী তার অন্তর জীবনে চলেছে কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে। বলতে গেলে, খুদীর রয়েছে দুটো দিক। এই দিক দুটোকে অনুভাবক দিক ও দক্ষাদিক বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। আমরা যাকে বলি স্থানিক জগৎ, দক্ষ দিক দিয়ে খুদী তারই সঙ্গে গড়ে তোলে নিজের সম্পর্ক। দক্ষ খুদীই সম্বন্ধীবাদী মনস্তত্ত্বের বিষয়বস্তু। দৈনন্দিন জীবনের কার্যকরী খুদী বাইরের বস্তুবিধানের সঙ্গে কারবার করে। এই বাইরের বস্তুই আবার স্বল্পস্থায়ী চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের উপরে স্থানগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ মেরে দেয়। খুদী যেন এখানে তার নিজের বাইরে বাস করে এবং একটা সমগ্রতা রূপে নিজের ঐক্য বজায় রেখেই নিজেকে প্রকাশ করে এমন রূপে, যাকে কতকগুলো অবস্থার একটা ধারা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। কাজেই যে কালে দক্ষ খুদীর বাস, তা হচ্ছে সেই কাল যাকে আমরা দীর্ঘ ও স্বল্প বলে নির্ধারণ করে থাকি। স্থান থেকে এর পার্থক্য নির্ণয় সহজ নয়। একটা পথের বিভিন্ন মঞ্জিলের মতো বিভিন্ন স্থানিক বিন্দু দিয়ে তৈরী একটা সরলরেখা রূপে আমরা এর কল্পনা করতে পারি। কিন্তু যে কালকে এই রূপে গণ্য করা হয়, বার্গসঁ'র মতে তা সত্যিকারের সময় নয়। স্থানগত কালে যে অস্তি ত্ব, তা ভুয়ো অস্তিত্ব। গভীরভাবে সজ্ঞান অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করলে খুদীর সেই দিকটা প্রতিভাত হয়, যাকে আমি বলেছি অনুভাবক দিক। আমাদের বর্তমান অবস্থার প্রয়োজনে আমরা বাহ্যিক বস্তুনিচয়ের মধ্যে এমনভাবে ডুবে আছি যে, এই অনুভাবক খুদীর রূপ দেখতে পাওয়া আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন। আমরা বাহ্যিক বস্তুর পিছনে নিরবচ্ছিন্নভাবে ছুটে চলেছি। তাতে আমাদের অনুভাবক খুদীকে ঘিরে এমন পর্দার সৃষ্টি হয়েছে যাতে অনুভাবক খুদীকে মনে হয় আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমরা যখন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হই, তখন আমাদের দক্ষ খুদীর কাজ বন্ধ থাকে; শুধু সেই সময় আমরা আমাদের সত্তার গভীরে প্রবেশ করে অভিজ্ঞতার গহন কেন্দ্রে পৌছুতে পারি। এই গভীরতর খুদীর জীবন ধারায় চেতনার বিভিন্ন অবস্থা পরস্পরের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। অনুভাবক খুদীর ঐক্য সেই জীবাণুর মতো, যে জীবাণুর মধ্যে তার পূর্বপুরুষদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্তমান থাকে বহুত্বের আকারে নয় বরং একটা ঐক্য রূপে। এই ঐক্যের মধ্যেই প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা সমগ্রকে পরিব্যাপ্ত করে থাকে। খুদীর সমগ্রতায় বিভিন্ন অবস্থার কোন সংখ্যাগত স্বাতন্ত্র্য নেই। খুদীর উপাদানগুলোর বহুত্ব দক্ষ সত্তার উপাদানগুলোর মতো নয়। খুদীর উপাদানগুলোর বহুত্ব সম্পূর্ণ গুণাত্মক। অনুভাবক খুদীর মধ্যে পরিবর্তন আছে, গতি আছে; কিন্তু পরিবর্তন ও গতি অবিভাজ্য।

তাদের উপাদানগুলো পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট এবং তাদের স্বভাবে পরপর ক্রমের কোন গুণ নেই। এতে প্রতীয়মান হয় যে, অনুভাবক খুদীর কালটা এক অখণ্ড 'এখন'। কিন্তু দক্ষ খুদী স্থানভূত জগতের সঙ্গে কারবার করতে গিয়ে একটা 'এখন'-কেই টুকরো টুকরো করে বহু 'এখন'-এর একটি ক্রমধারায় পরিণত করে। সুতোয় যেমন মুক্তোর মালাগুলো পরপর গাঁথা থাকে, এ-ও ঠিক তেমনি। অনুভাবক খুদীর যে কাল, সে কালই হচ্ছে খাঁটি কাল, স্থানের সংস্পর্শে তা বিকৃত নয়। কুরআন তার স্বাভাবিক প্রাঞ্জল ভাষায় কালের এই ক্রমিক ও অ-ক্রমিক রূপের প্রতি ইঙ্গিত করেছে :

> 'এবং তাঁরই উপর বিশ্বাস রাখ যিনি জীবিত থাকেন এবং মরেন না;....এবং তাঁরই মহিমা কীর্তন কর যিনি ছয় দিনে আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং তাদের মাঝখানে যা আছে তা সৃষ্টি করলেন, তারপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন; (তিনি) করুণাময় আল্লাহ্।' (২৫ : ৫৮-৫৯)
>
> 'সকল জিনিসই আমরা সৃষ্টি করেছি একটা নির্ধারিত লক্ষ্য দিয়ে; আমাদের হুকুম মাত্র একটাই ছিল, চোখের পলকের মতো দ্রুত।' (৫৪ : ৪৯-৫০)

আমরা যদি সৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত গতিটা বাইরে থেকে দেখি, অর্থাৎ আমরা যদি বুদ্ধিগতভাবে এই গতি উপলব্ধি করি, তা হলে এটাকে হাজার হাজার বছরব্যাপী বর্তমান একটা ধারা রূপে মনে হবে। ওল্ড টেস্টামেন্টের মতো কুরআনের পরিভাষায়ও একটা ঐশী দিবস হাজার বছরের সমান। অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে হাজার হাজার বর্ষব্যাপী এই সৃষ্টিধারা প্রতিভাত হবে একটা একক, অবিভাজ্য কার্যরূপে, 'চোখের পলকের মতো দ্রুত'। খাঁটি কালের যে ভেতরের অভিজ্ঞতা তা কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কেননা, আমাদের ভাষার যে রূপ তা গড়ে উঠেছে আমাদের প্রাত্যহিক দক্ষ খুদীর ক্রমিক কালের উপর ভিত্তি করে। সম্ভবত একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

প্রকৃতিবিজ্ঞানের মতে, আমাদের লাল রঙের যে অনুভূতি, তরঙ্গ বেগের গতিই তার কারণ। তরঙ্গ বেগের স্পন্দন হয় প্রতি সেকেন্ডে ৪০ লক্ষ কোটিবার। সেকেন্ডকে মনে করা হয় আলোর প্রত্যক্ষ গোচরতার সীমা বলে। এখন বাইরের থেকে যদি আপনি এই বিপুল স্পন্দন-সংখ্যা লক্ষ্য করতে এবং প্রতি সেকেন্ডে দু'হাজার স্পন্দন গণনা করতে পারেন, তা হলে এই গণনা শেষ করতে আপনার ৬০০০ বছরেরও বেশী সময় লাগবে। বস্তুত তরঙ্গ বেগের স্পন্দন সংখ্যা অগণনীয়। অথচ একটা ক্ষণিক মানসিক অনুভূতি ক্রিয়ার সাহায্যে তরঙ্গ বেগের একটা স্পন্দন সংখ্যা আপনি অনুধাবন করতে পারেন। এভাবেই আমাদের মানসিক ক্রিয়া তরঙ্গ বেগের স্পন্দন পর্যায়কে কালের মেয়াদে রূপায়িত করে। তা হলে অনুধাবক খুদী কমবেশী দক্ষ খুদীরই সংশোধক। কেননা, এখানটা-সেখানটা, এখন-তখন, স্থান-কালের এসব ছোট ছোট বৈচিত্র্য দক্ষ খুদীর পক্ষে অপরিহার্য। অনুভাবক খুদী এসবের সমন্বয় বিধান করে ব্যক্তিত্বের একটা সুসংবদ্ধ সমগ্রতা গড়ে তোলে। আমাদের সজ্ঞান অভিজ্ঞতার গভীরতর বিশ্লেষণে উদ্ঘাটিত এই

অবিকৃত খাঁটি কাল তা হলে পৃথক পৃথক মুহূর্তের ধারা নয়। এদের আগ-পর ক্রমও পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এ এমন একটা জৈবিক সমগ্র, যেখানে অতীত পিছনে পড়ে থাকে না, বরং বর্তমানের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে এবং বর্তমানের মধ্যে বসে কাজ করে। আর ভবিষ্যৎটাও এতে এমনভাবে দেওয়া নেই যে, তা অতিক্রমের প্রতীক্ষায় সম্মুখে পড়ে রয়েছে। কালের মধ্যে যে ভবিষ্যৎ আছে, তার মানে এই যে, কালের প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত সম্ভাবনারূপে ভবিষ্যৎ নিহিত আছে। কালকে জৈবিক সমগ্র হিসেবে ধরে নিলে যা দাঁড়ায়, কুরআন তাকেই বর্ণনা করেছে 'তকদীর' বা ভাগ্য বলে। ইসলামী দুনিয়ার ভেতরে এবং বাইরে এই 'তকদীর' বা ভাগ্য শব্দের বহু ভুল অর্থ করা হয়েছে। 'তকদীর' হচ্ছে সে কাল যার সম্ভাবনাসমূহ এখনো প্রকাশিত হয়নি। এ কালকে কার্যকারণের ফলাফল থেকে মুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। এক কথায়, এটা সত্তারূপী কাল-ভাবনা-চিন্তা করে পাওয়া কাল নয়। আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন, সম্রাট হুমায়ুন এবং পারস্যের শাহ্ আহ্মাস্প সমসাময়িক ছিলেন কেন, তা হলে আমি তার কার্যকারণগত কোন ব্যাখ্যা দিতে পারব না। সম্ভবত এর একটি মাত্র উত্তর এই দেওয়া যেতে পারে যে, সত্তার প্রকৃতি অনুসারে তাঁর 'হওয়ার' অনন্ত সম্ভাবনার মধ্যেই ব্যবস্থা ছিল যে, হুমায়ুনের জীবন ও শাহ্ আহমাস্পের জীবন নামে পরিচিত দু'টি সম্ভাবনার একই রূপায়ণ ও উপলব্ধি ঘটবে। ভাগ্যরূপে বিবেচিত কালই হচ্ছে বস্তুসমূহের প্রাণবস্তু। কুরআন বলে : 'আল্লাহ্ সকল বস্তু সৃষ্টি করলেন এবং প্রত্যেকের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিলেন।' কাজেই একটি বস্তু ভাগ্য আদেশকারী মনিবের মতো বাইরে থেকে কার্যকরী কোন অনমনীয় নিয়তি নয়। এটা বস্তুর ভেতরকার প্রসারণের সীমা, তার রূপায়ণযোগ্য বিচিত্র সম্ভাবনা; এই সম্ভাবনাগুলো তার স্বভাবের গভীরেই নিহিত থাকে। বাইরের কোন জবরদস্তির অনুভূতি ছাড়াই এগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হয়ে উঠে। কালের জৈবিক সমগ্রতার অর্থ তা হলে এই নয় যে, পূর্ণাঙ্গ ঘটনাগুলো সত্তার অভ্যন্তরে সজ্জিত রয়েছে এবং সময়ের পাত্র থেকে বালুকণার মতো একটি একটি করে ঝরে পড়ছে। কালকে যদি আমরা পরস্পর সদৃশ কতকগুলো মুহূর্তের নিছক পুনরাবৃত্তি মনে করি, তবে আমাদের সজ্ঞান অভিজ্ঞতার বাস্তব কোন দাম থাকে না; তা হয়ে পড়ে একটি বিভ্রান্তি। কিন্তু কাল যদি এই একই রূপ মুহূর্তরাশির কেবল পুনরাবৃত্তি না হয়ে সত্যিকার হয়, তা হলে পরম সত্তার জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত মৌলিক। এই মুহূর্ত থেকে সম্পূর্ণ অভিনব ও অদৃষ্টপূর্ব জিনিস পয়দা হয়। কুরআন বলে : 'প্রত্যেক দিন কোন না কোন নতুন কাজ তাঁকে (আল্লাহকে) ব্যাপৃত রাখে।' প্রকৃত কালে অবস্থিত থাকার অর্থ ক্রমিক কালের নিগড়ে আবদ্ধ হওয়া নয়। প্রকৃত কালে অধিষ্ঠানের মানে মুহূর্তে মুহূর্তে একে সৃষ্টি করা এবং সৃষ্টির দিক দিয়ে একান্তরূপে স্বাধীন ও মৌলিক হওয়া। বস্তুত সকল সৃজনশীল কাজই বন্ধনহীন কাজ। যেটা সৃষ্টি তা পুনরাবৃত্তির বিরোধী; পুনরাবৃত্তিটা যান্ত্রিক কাজের বৈশিষ্ট্য। এই জন্যই যান্ত্রিকতাবাদের পরিভাষায় জীবনের সৃজনমূলক কাজের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান চায় অভিজ্ঞতার সমরূপতা অর্থাৎ যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির নিয়ম দাঁড় করাতে। জীবন তার আপনা-আপনি ফুটে ওঠার সুতীব্র অনুভূতির ফলে একটা অনিবার্যতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এই রূপে 'হতে

হবে' এমন প্রয়োজনের সীমার বাইরে জীবন পড়ে যায়। কাজেই বিজ্ঞান জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে অপারগ। জীববিজ্ঞানী যে জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিতে যায়, তার কারণ এই যে, যেসব জীবনের চাল-চরিতে যান্ত্রিক কাজের সাদৃশ্য প্রকাশ পায়, শুধু সেই সব নিম্নস্তরের জীবনে তাঁর পর্যবেক্ষণ সীমাবদ্ধ। জীববিজ্ঞানী যদি তাঁর নিজের মধ্যে বিকশিত জীবনের রূপ প্রত্যক্ষ করেন অর্থাৎ তার নিজের মন- যে মন নিরন্তর মুক্তভাবে বাছাই করছে, চিন্তা করছে, অতীত ও বর্তমান প্রদক্ষিণ করছে এবং এত শক্তির সঙ্গে ভবিষ্যতের কল্পনা করছে, সেই মনের মধ্যে পরিস্ফুট জীবনের হদিস যদি তিনি অন্বেষণ করেন, তা হলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর যান্ত্রিক ধারণাগুলোর অপর্যাপ্ততা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারবেন।

আমাদের সজ্ঞান অভিজ্ঞতার যুক্তিগত বিশ্লেষণ থেকে তা হলে প্রতিভাত হচ্ছে যে, এই বিশ্ব চরাচর একটা স্বাধীন সৃজনশীল গতি। কিন্তু যা চলছে এমন একটা বাস্তব বস্তুর নির্ভর ছাড়া গতির ধারণা আমরা কি করে করতে পারি ? এর জবাব হচ্ছে, বস্তুর যে ধারণা, তার ব্যুৎপত্তিমূলক গতি থেকে আমরা বস্তু পেতে পারি, কিন্তু অনড় বস্তু থেকে গতি লাভ করতে পারি না। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা যদি ডিমোক্রিটাসের পরমাণুর মতো পদার্থগত পরমাণুসমূহকে মূল সত্তা বলে ধরে নিই, তা হলে তাদের মধ্যে বাইরে থেকে গতির আমদানী করতে হবে; ধরে নিতে হবে, এ গতি পরমাণুসমূহের ভিতরের জিনিস নয়, তার স্বভাবের বাইরের জিনিস। আর যদি আমরা গতিকে মৌলিক বলে গ্রহণ করি, তা হলে এর থেকে স্থিতিশীল বস্তু পাওয়া যেতে পারে। বস্তুত, প্রকৃতিবিজ্ঞান সকল বস্তুকেই গতিতে পর্যবসিত করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, পরমাণুর মূল প্রকৃতি হচ্ছে বিদ্যুৎ-বিদ্যুতায়িত কোন কিছু নয়। এছাড়া, আমাদের প্রত্য অভিজ্ঞতায় যে বস্তুকে পাই, তা এমন কোন বস্তু নয়, আগে থেকে যার নির্দিষ্ট বাহ্যিক রূপ কাঠামো রয়েছে। কারণ আশু অভিজ্ঞতা হচ্ছে একটা ধারাবাহিক অবস্থা, তাতে কোন চিহ্নভেদ নেই। আমরা যাকে বস্তু বলি, প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন ধারায় তা হচ্ছে এক একটি ঘটনা। ঘটনাগুলোকেই আমাদের চিন্তা স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে এবং ব্যবহারিক কাজের সুবিধার জন্যে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করে। যে বিশ্ব চরাচরকে আমাদের কাছে মনে হয় বস্তুরাশির সমাহার বলে, তা শূন্যে অবস্থিত একটা নিরেট পদার্থ নয়। এটা কোন বস্তু' নয়; বরং একটি ক্রিয়া। বার্গসঁ'র মতে, চিন্তার প্রকৃতি হচ্ছে ক্রমিক; স্থিতিশীল বিন্দুরাশির একটা ধারারূপে দেখা ছাড়া আর কোনভাবে গতি নিয়ে কারবার করতে চিন্তা অপারগ। বস্তুত স্থিতিশীল বস্তুর ধারণাকে সম্বল করেই চিন্তার অগ্রগতি। ফলে স্বভাবের দিক দিয়ে যা মূলত গতিবান, তাকে অনড় বস্তু ধারার রূপ দেওয়া এই চিন্তারই কাজ। আমরা যাকে স্থান এবং কাল বলি, এই অনড় বস্তুনিচয়ের সহ-অবস্থিতি এবং ক্রমানুবর্তিতাই তার উৎস।

তা হলে বার্গসঁ'র মতে, সত্তা হচ্ছে ইচ্ছার মতো একটি স্বাধীন, অপূর্ব বর্ণনীয়, সৃজনশীল, সজীব বেগ; একেই আমাদের চিন্তা স্থানভূত করে বস্তুর বহুত্বের আকারে দেখে। এখানে এই মতবাদের পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা প্রবেশ করা যাবে না। তবে এটুকু বললেই যথেষ্ট হয়

যে, বার্গসঁ'র সজীবতা পরিশেষে ইচ্ছা ও চিন্তার এক অনতিক্রমণীয় দ্বৈতবাদেই পর্যবসিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে তাঁর আংশিক ধারণারই ফল। তাঁর মতে, বুদ্ধিবৃত্তি হচ্ছে স্থানভূত করার একটি ক্রিয়া; কেবলমাত্র পদার্থকে ভিত্তি করে এর গঠন। আর এ আয়ত্তে রয়েছে শুধু কতকগুলো যান্ত্রিক বিভাগ। কিন্তু আমার প্রথম বক্তৃতায় আমি দেখিয়েছি, চিন্তার একটা গভীরতর গতিও রয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তি সত্তাকে খণ্ড-খণ্ড নিশ্চল বস্তুতে বিভক্ত করছে বলে মনে হলেও এর আসল কাজ হচ্ছে অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তরে উপযোগী শ্রেণীবিভাগের প্রয়োগ করে অভিজ্ঞতার উপাদানগুলোর সমন্বয় বিধান করা। বুদ্ধিবৃত্তি জীবনের মতোই জৈবিক। জৈবিক পরিবৃদ্ধি হিসেবে জীবনের গতির জন্য তার বিভিন্ন পর্যায়ের ক্রমাগত সমন্বয়ের প্রয়োজন। এই সমন্বয়কে বাদ দিলে এটাকে আর জৈবিক বুদ্ধি বলা চলে না। এই সমন্বয় নির্ধারিত হয় উদ্দেশ্যের দ্বারা; আর উদ্দেশ্য থাকার অর্থই হচ্ছে এই যে, তা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট। আবার উদ্দেশ্য না থাকলে বুদ্ধির ক্রিয়াও সম্ভব নয়। সজ্ঞান অভিজ্ঞতায় জীবন এবং চিন্তা পরস্পরের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। জীবন ও চিন্তা একত্রে একটি ঐক্যের সৃষ্টি করে। কাজেই সত্যিকার প্রকৃতির দিক দিয়ে চিন্তা ও জীবনের মধ্যে তফাৎ নেই। আবার বার্গসঁ'র মতে, সৃজনশীল স্বাধীনতার দিক দিয়ে সজীব আবেগের অগ্রগতি আশু বা সুদূর উদ্দেশ্যের আলোক-ছটায় আলোকিত নয়। কোন পরিণতির দিকে এর লক্ষ্য নেই; চলাচলে এটা সম্পূর্ণ যথেচ্ছাচারী, অপরিচালিত, উচ্ছৃঙ্খল এবং অ-পূর্বদর্শনীয়। আমাদের সজ্ঞান অভিজ্ঞতার যে বিশ্লেষণ বার্গসঁ দিয়েছেন, তার অপর্যাপ্তির আত্মপ্রকাশ প্রধানত এখানেই। সজ্ঞান অভিজ্ঞতাকে তিনি বর্তমানের সঙ্গে অগ্রসর এবং বর্তমানের মধ্যে ক্রিয়াশীল অতীত বলে মনে করেন। চেতনার ঐক্যে যে একটি অগ্রগতির রূপ রয়েছে, বার্গসঁ তা ভুলে যান। জীবনটা হচ্ছে প্রণিধানযোগ্য কার্যাবলীর একটা ধারা মাত্র। সজ্ঞান হোক, অজ্ঞান হোক, একটা উদ্দেশ্যের পটভূমি ছাড়া প্রণিধানযোগ্য কোন কাজের ব্যাখ্যা চলে না। এমনকি আমাদের অনুভূতির কাজগুলোও আমাদের আশু স্বার্থ এবং উদ্দেশ্য দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। মানবীয় অভিজ্ঞতার এই রূপটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন পারস্যের কবি উরফী; তিনি বলেছেন :

'তোমার অন্তর যদি মরীচিকা দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়,
তার জন্যে তুমি তোমার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার গর্ব করো না
কারণ, দৃষ্টির বিভ্রম থেকে তোমার এই যে মুক্তি
সে তোমার অপূর্ণ তৃষ্ণারই ফল।'

কবি এখানে বলতে চাচ্ছেন যে, পানের তীব্র ইচ্ছা যদি তোমার থাকত তা হলে মরুভূমির বালুকারাশি তোমার মনে একটা হ্রদের ধারণাই সৃষ্টি করত। পানি পানের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষার অভাব ছিল বলেই এই মরীচিকা থেকে তার অব্যাহতি। জিনিসটা যা আছে, ঠিক সেই আকারে যে তুমি অনুভব করতে পেরেছ তার কারণ, এটা যা নয় সেইরূপে অনুভব করার আগ্রহ তোমার ছিল না। সচেতন প্রবৃত্তি-রূপে থাকুক বা অচেতন

প্রবৃত্তিরূপেই থাকুক, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যই আমাদের সজ্ঞান অভিজ্ঞতার টানাপড়েন। একমাত্র ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন ব্যতীত উদ্দেশ্যের ধারণা বোধগম্য হতে পারে না। অতীতটা নিঃসন্দেহে বর্তমানের মধ্যে অবস্থিত এবং ক্রিয়াশীল, কিন্তু বর্তমানের মধ্যে অতীতের এই ক্রিয়াই চেতনার সবটুকু নয়। উদ্দেশ্যের উপাদান আমাদের চেতনায় একটা সম্মুখ-দৃষ্টিরূপেই প্রকাশ পায়। উদ্দেশ্য শুধু আমাদের চেতনার উপস্থিত অবস্থাগুলোর উপরই রং ফলায় না, আমাদের চেতনার ভবিষ্যৎ গতিপথগুলোও উদ্ঘাটন করে। বস্তুত উদ্দেশ্যগুলোই আমাদের জীবনের অগ্রগতি প্রবর্তন করে। কাজেই আমাদের জীবনের যেসব অবস্থার সম্ভাবনা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, একদিক দিয়ে এই উদ্দেশ্যগুলোই তাদের পূর্বাভাস দান করে এবং তাদের রূপায়ণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। উদ্দেশ্য দ্বারা নিরূপিত হওয়ার অর্থ, যা হওয়া উচিত, তার দ্বারা নিরূপিত হওয়া। অতএব দেখা যাচ্ছে, অতীত এবং ভবিষ্যৎ এ দুটোই আমাদের চেতনার বর্তমান অবস্থার মধ্যে ক্রিয়াশীল। আর বার্গসঁ'র এ মত গ্রহণীয় নয় যে, ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনির্ধারিত। সজাগ চেতনার অবস্থা গড়ে তুলতে সক্রিয় উপাদান হিসেবে স্মৃতি ও কল্পনা- উভয়েরই প্রয়োজন। কাজেই আমাদের সজ্ঞান অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে সিদ্ধান্তটা এই দাঁড়ায় যে, সত্তা আইডিয়া বা ভাবের দ্বারা সম্পূর্ণ অনালোকিত কোন অন্ধ সজীব আবেগ নয়। সত্তার প্রকৃতি সম্পূর্ণই উদ্দেশ্যবাদী। তবে বার্গসঁ সত্তার উদ্দেশ্যবাদী রূপ অস্বীকার করেছেন; কারণ, তাঁর যুক্তি অনুসারে উদ্দেশ্যবাদের দ্বারা কাল অসত্য হয়ে পড়ে। তাঁর মতে, 'সত্তার সম্মুখে ভবিষ্যতের দ্বার নিরন্তর অবারিত থাকতেই হবে। অন্যথায়, সত্তা স্বাধীন ও সৃজনশীল হবে না।' এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই যে, উদ্দেশ্যবাদের দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অনুযায়ী কোন পরিকল্পনার রূপায়ণ বোঝালে, তাতে কাল অসত্য বলেই প্রতিভাত হবে। উদ্দেশ্যবাদ বিশ্ব চরাচরকে পর্যবসিত করে একটা পূর্বস্থায়ী শাশ্বত পরিকল্পনা বা কাঠামোর সাময়িক রূপায়ণে-যে পরিকল্পনা বা কাঠামোতে একেকটি ঘটনা পূর্বে থেকে অবস্থিত রয়েছে এবং পালাক্রমে ইতিহাসের কালগত প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে। সব কিছুই অনন্তের মাঝে কোথাও পূর্ব থেকে দেওয়া আছে। ঘটনাসমূহের পার্থিব ধারা সেই শাশ্বত কাঠামোর নিছক অনুকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। যান্ত্রিকতাবাদের সঙ্গে এ ধারণার আদৌ কোন পার্থক্য নেই। আর বিশ্ব চরাচরের বেলায় যান্ত্রিকতাবাদের প্রয়োগ যে অসার্থক, সে তো আমরা আগেই প্রমাণ করেছি। বস্তুত এ মতবাদ হচ্ছে এক প্রকার প্রচ্ছন্ন জড়বাদ; এতে ভাগ্য বা নিয়তি নিরেট নিরূপণবাদের স্থান গ্রহণ করে; ফলে মানবীয়, এমনকি ঐশী স্বাধীনতারও কোন অবকাশই আর থাকে না। একটা পূর্ব-নির্ধারিত উদ্দেশ্য রূপায়ণের ধারা রূপে গণ্য যে জগৎ, তা স্বাধীন, দায়িত্বশীল নৈতিক কর্মকর্তাদের জগৎ নয়; এটা একটা মঞ্চ মাত্র, অন্ত রালবর্তী কোন আকর্ষণে পুত্তলিকাগুলো সচল হয়ে উঠছে। তবে উদ্দেশ্যবাদের আরও একটি অর্থ আছে। আমাদের সজ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি, বেঁচে থাকার অর্থ হচ্ছে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যসমূহ গঠন ও পরিবর্তন করা এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। যে অর্থে মানসিক জীবন উদ্দেশ্যবাদী তা হচ্ছে এই যে, এমন কোন দূরবর্তী লক্ষ্য

নেই বটে যার দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি; কিন্তু জীবনের ধারা বিকশিত ও প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং আদর্শ মূল্যমান ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠছে। আমরা যা আছি, তার বিলোপ সাধন করেই আমরা হই। কবরের ভেতর দিয়েই জীবনের পথ : একের পর এক অনেকগুলো মৃত্যু অতিক্রম করেই জীবন এগিয়ে যায়। জীবনের বিভিন্ন স্তরে আমরা বস্তুর মূল্য নির্ধারণে আকাশ-পাতাল তফাৎ করতে পারি, তবু সেসব স্তর এক অবিচ্ছিন্ন জৈবিক সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ। মোটের উপর ব্যক্তির জীবনেতিহাস একটা ঐক্য-পরস্পর খাপছাড়া ঘটনাসমূহের নিছক একটা সমাবেশ নয়। উদ্দেশ্য দ্বারা যদি আমরা বুঝি এমন একটা লক্ষ্য বা সুদূরবর্তী নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল যার দিকে গোটা সৃষ্টি এগিয়ে চলেছে, তা হলে নিশ্চয়ই জগৎ-প্রক্রিয়ায় অথবা কালের বুকে বিশ্ব চরাচরের গতির মধ্যে উদ্দেশ্য নেই। কেননা, জগৎ-প্রক্রিয়ায় এরূপ অর্থে উদ্দেশ্যের আরোপ করলে তার মৌলিকত্ব, তার সৃজনশীল চরিত্র হরণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি কর্মধারার পরিসীমা; এ লক্ষ্য অনাগত লক্ষ্য, তবে তাদের যে আগে থেকেই রাখা হয়েছে, এমন মনে করার কারণ নেই। আগে থেকে আঁকা রয়েছে এমন কোন রেখারূপে কালের ধারাকে ধারণ করা চলে না। এটা এমন একটা রেখা, যা আঁকা হয়ে চলছে : এ যেন অবারিত সম্ভাবনার বাস্তবায়ন। শুধু এই অর্থে কাল উদ্দেশ্যমূলক যে, স্বরূপের দিক দিয়ে এটা নির্বাচনধর্মী : এবং অতীতকে সক্রিয়ভাবে রক্ষা ও পরিপূরণ করে কাল এক রকম উপস্থিত উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে। এ বিশ্ব চরাচর একটা পূর্ব-কল্পিত ব্যবস্থার পার্থিব রূপায়ণ- এ ধারণার চেয়ে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গির অধিক বিরোধী আর কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। আমি পূর্বেই দেখিয়েছি যে, কুরআনের মতে এ বিশ্ব জগতের সম্প্রসারণ হতে পারে। এটা একটা ক্রমবর্ধনশীল জগৎ। পূর্ব থেকে পূর্ণরূপে তৈরী করা এমন কোন বস্তু এটা নয় যা বহু যুগ পূর্বে নির্মাতার হাত থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং এখন স্থানভূত ব্যাপ্তিতে বিস্তারিত হয়ে আছে একটা মৃত জড়পিণ্ডের মতো, যে জড়পিণ্ডের উপর সময়ের কোন কাজ নেই এবং সে কারণে তা মূল্যহীন।

আশা করি আমরা এখন 'এবং যারা আল্লাহ সম্বন্ধে চিন্তা করতে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে ইচ্ছুক তাদের জন্য তিনিই রাত্রি ও দিনকে পরস্পরের অনুসরণ করার বিধান দিয়েছেন'- এই আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের অন্তরে প্রতিভাত কালানুক্রমে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফলে পরম সত্তা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হয়েছিল এমন একটা খাঁটি কালরূপে, যে কালে চিন্তা, জীবন এবং উদ্দেশ্য পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় একটা জৈবিক ঐক্য গঠনের জন্যে। একটা সত্তা, সবকিছুকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে আছে এমন একটা বাস্তব সত্তা, সকল স্বতন্ত্র জীবন ও চিন্তার উৎসরূপী সত্তা হিসেবে ছাড়া আমরা এ ঐক্যের ধারণা করতে পারি না। আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, খাঁটি কালকে সত্তার পূর্ববর্তী বলে ধারণা করাই বার্গসঁ'র ভুল। কারণ খাঁটি কাল একমাত্র সত্তা সম্পর্কেই বিধেয়। খাঁটি দেশ এবং খাঁটি কাল কোনটাই বস্তু এবং ঘটনার বহুত্ব একত্রে ধারণ করতে পারে না। একমাত্র অস্থায়ী খুদীর অনুভবাত্মক ক্রিয়াই অসংখ্য মুহূর্তে বিভক্ত কালের বহুত্বকে ধারণ করে তাকে একটা সমন্বয়ের সুসংবদ্ধ সমগ্রতায়

রূপান্তরিত করতে পারে। খাঁটি কালে বর্তমান থাকাই খুদী বা 'অহম' হওয়া এবং অহম হওয়ার অর্থ হচ্ছে 'আমি আছি' বলতে সমর্থ হওয়া। কেবল সেই সত্যি বেঁচে থাকে, যে বলতে পারে- 'আমি আছি'। আমি আছি- এ কথা যে যত জোরে বলতে পারে সে অনুসারে সৃষ্টির মাপকাঠিতে তার স্থান নির্ধারিত হয়। আমরাও বলি 'আমি আছি'; কিন্তু আমাদের 'আমিত্ব' নির্ভরাত্মক; সত্তা ও অ-সত্তা এই দুয়ের পার্থক্য থেকে এর উদ্ভব। কুরআনের ভাষায় 'চরম সত্তা একটা বিশ্ব চরাচরকে বাদ দিয়েও চলতে পারে। তার কাছে অ-সত্তা একটা বিরোধী অপর সত্তা রূপে প্রতিভাত হয় না। আমরা যাকে প্রকৃতি বা অ-সত্তা বলি, তা আল্লাহ্‌র জীবনে একটা অস্থায়ী মুহূর্ত মাত্র। আল্লাহ্‌র 'আমিত্ব' অন্য-নিরপেক্ষ, মৌলিক এবং নিরঙ্কুশ। এরূপ একটা সত্তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কুরআন বলে, 'কিছুই' তাঁর মতো নয়; তবু 'তিনি শুনেন এবং দেখেন।' এখন কথা হচ্ছে একটা চারিত্র্য অর্থাৎ চাল-চলনের একটা নির্দিষ্ট ধরন ছাড়া একটা সত্তার কথা আমরা ভাবতে পারি না। আমরা দেখেছি যে, প্রকৃতি শূন্যে অবস্থিত এক তাল নিছক জড়পদার্থ নয়। প্রকৃতি ঘটনাপুঞ্জের একটা কাঠামো, গতি-বিধির একটা সুসংবদ্ধ পদ্ধতি এবং সে কারণে পরম সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-স্বরূপ। মানবীয় সত্তার সঙ্গে চরিত্রের যে সম্বন্ধ, ঐশী সত্তার সঙ্গে প্রকৃতির সেই সম্বন্ধ। কুরআনের ভাষায় এটা আল্লাহ্‌র অভ্যাস বা রীতি। মানুষের ভাষায় একটা পরম খুদীর সৃজনশীল কাজের অন্যতম পরিচয়। এর অগ্রগতির এক বিশেষ মুহূর্তে এটা সসীম; কিন্তু যে সত্তার সঙ্গে এটা অবিচ্ছেদ্য রূপে সম্পৃক্ত, তা যখন সৃজনশীল, তখন এটাও সম্প্রসারণ সাপেক্ষ। ফলত প্রকৃতি সীমাহীন এবং তা এই অর্থে যে, এর সম্প্রসারণের কোন সীমাই চূড়ান্ত নয়। এর সীমাহীনতা অন্তর্নিহিত, বাস্তব নয়। তা হলে প্রকৃতিকে বুঝতে হবে একটি জীবন্ত ক্রমবর্ধনশীল জীব রূপে- যার বৃদ্ধির কোন চূড়ান্ত বাহ্যিক সীমা নেই। এর একমাত্র সীমা হচ্ছে আভ্যন্তরিক অর্থাৎ অন্তর্নিহিত সত্তা, যা সমগ্রের উজ্জীবন ও সংরক্ষণ করে । কুরআন বলে : 'এবং নিশ্চয়ই সীমাটা তোমার প্রভুর দিকে।' কাজেই আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি এখানে গ্রহণ করেছি, তাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটা নতুন আধ্যাত্মিক অর্থ পাওয়া যাচ্ছে। প্রকৃতির জ্ঞান আল্লাহ্‌র কার্যেরই জ্ঞান। প্রকৃতির পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আমরা পরম অহমের সঙ্গে একপ্রকার ঘনিষ্ঠতা স্থাপনেরই চেষ্টা করছি। এটা উপাসনারই আরেকটা রূপ মাত্র।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে কালকে পাওয়া যাচ্ছে পরম সত্তার মাঝে একটা মৌলিক উপাদান রূপে। অতএব আমাদের সামনে এখন আলোচনা করার রয়েছে কালের অবাস্তবতা সম্পর্কে পরলোকগত ডক্টর ম্যাকটাগার্টের যুক্তিটি। ডক্টর ম্যাকটাগার্টের মতে কাল অবাস্তব; কেননা, প্রত্যেকটি ঘটনাই অতীতের, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের। উদাহরণস্বরূপ রাণী অ্যানের মৃত্যুর ঘটনা আমাদের কাছে অতীতের, এটা তাঁর সমসাময়িকদের কাছে ছিল বর্তমানের এবং তৃতীয় উইলিয়ামের কাছে ভবিষ্যতের। অতএব দেখা যাচ্ছে, রাণী অ্যানের মৃত্যুর ঘটনায় এমন সব বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ হয়েছে, যা পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। স্পষ্টতই, তাঁর যুক্তি এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে

অগ্রসর হয়েছে যে, কালের ক্রমিক প্রকৃতি চূড়ান্ত। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে কালের পক্ষে অপরিহার্য মনে করলে কালকে চিত্রিত করা হয় একটা সরল রেখারূপে, যার একাংশ আমরা অতিক্রম করে পেছনে ফেলে এসেছি; আরেক অংশ এখনও আমাদের সামনে অতিক্রম করার রয়েছে। এতে কালকে গ্রহণ করা হয় একটা জীবন্ত সৃজনশীল সময় হিসেবে নয়, বরং একটা স্থিতিশীল নিরঙ্কুশ সময় রূপে- যা বাইরের পর্যবেক্ষকের কাছে একটা ছায়াচিত্রের ছবিগুলোর মতো পর্যায়ক্রমে প্রতিভাত পূর্ণাঙ্গ জাগতিক ঘটনাবলীর সুবিন্যস্ত বহুত্বকে ধারণ করে আছে। আমরা যদি রাণী অ্যানের মৃত্যুর ঘটনাকে পূর্ব থেকে পূর্ণরূপে গঠিত এবং সংঘটিত হওয়ার অপেক্ষায় ভবিষ্যতের বুকে অবস্থিত রয়েছে বলে মনে করি, তা হলে অবশ্যই বলতে পারি যে, এ ঘটনা তৃতীয় উইলিয়ামের কাছে ছিল ভবিষ্যতের । কিন্তু ব্রড ঠিকই বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতের ঘটনাকে ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা চলে না। কেননা, অ্যানের মৃত্যুর পূর্বে এ ঘটনার আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না। স্বয়ং অ্যানের জীবনকালেও, তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটির অস্তিত্ব ছিল সত্তার প্রকৃতির মধ্যে শুধু একটা অরূপায়িত সম্ভাবনা রূপে। সত্তা এটাকে একটা ঘটনারূপে গ্রহণ করেছিল শুধু তখনই, যখন এই সম্ভাবনা বিকশিত হয়ে হয়ে সেই ঘটনার প্রকৃত সংঘটনের পর্যায়ে এসে পৌছুলো। তা হলে ডক্টর ম্যাকটাগার্টের যুক্তির প্রতি আমাদের জবাবটি দাঁড়াচ্ছে এই যে, ভবিষ্যৎ অবস্থান করছে শুধু একটা মুক্ত সম্ভাবনারূপে, একটা বাস্তব সত্তা রূপে নয়। আর, একটা ঘটনাকে অতীতের এবং ভবিষ্যতের বলে বর্ণনা করলেই যে তাতে অসামঞ্জস্য বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ হবে, তাও বলা চলে না। যখন 'ক' নামক একটি ঘটনা ঘটে, তখন তার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে এমন সকল ঘটনার সঙ্গে তা একটা অপরিবর্তনীয় সম্পর্কে সম্পৃক্ত হয়। সত্তার আরো বিকাশের ফলে 'ক'-এর পরে সংঘটিত হয়েছে এমন অন্য ঘটনাবলীর সঙ্গে 'ক'-এর সম্পর্কের দ্বারা এ সম্পর্কের রদবদল হয় না। এসব সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন সত্য বা মিথ্যা প্রতিজ্ঞাই কখনও মিথ্যা বা সত্য হবে না। কাজেই একটি ঘটনাকে একই সঙ্গে অতীতের এবং বর্তমানের বলে গণ্য করার মধ্যে যুক্তিগত কোন অসুবিধা নেই। তবে কাল বিষয়টি যে জটিলতামুক্ত নয় এবং এ সম্পর্কে আরও অনেক চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন, তা স্বীকার করতেই হবে। সময়ের রহস্য উদ্ঘাটন করা মোটেই সহজ নয়। অগাস্টিন বলেছিলেন, 'কেউ যদি আমায় কাল সম্বন্ধে প্রশ্ন না করেন, তা হলে কাল যে কি তা আমি জানি; আর কোন প্রশ্নকারকের কাছে কালের ব্যাখ্যা যদি আমায় করতে হয়, তা হলে কাল সম্বন্ধে আমি জানি না।' এই গূঢ় কথাগুলো যখন উচ্চারিত হয়েছিল, তখন এগুলো যেমন সত্য ছিল, আজও তা তেমনি সত্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করতে চাই যে, কালটা সত্তার মাঝে একটি অপরিহার্য উপাদান রূপে বিরাজ করছে। কিন্তু প্রকৃত কাল ক্রমিক কাল নয়- যাতে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের পার্থক্য অপরিহার্য। প্রকৃত কাল হচ্ছে খাঁটি কাল অর্থাৎ পর্যায় বা অনুবৃত্তিহীন পরিবর্তন। ম্যাকটাগার্ট তাঁর যুক্তিতে এ ব্যাপারটির উল্লেখ করেন নি। ক্রমিক কাল হচ্ছে চিন্তার দ্বারা খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত প্রকৃত কাল, ক্রমিক কালকে এক রকমের কৌশল (device) বলা যেতে পারে; এর দ্বারাই সত্তার বিরামহীন সৃজনশীল ক্রিয়া সাংখ্যিক পরিমাপে ধরা পড়ে। এই অর্থেই কুরআন বলেছে

: 'এবং রাত্রির এবং দিনের পরিবর্তন তাঁরই।'

কিন্তু আপনারা হয় তো জিজ্ঞেস করবেন- পরিবর্তন কি পরম খুদী সম্বন্ধে বিধেয় হতে পারে? মানবীয় জীব হিসেবে আমরা কাজ-কর্মের দিক দিয়ে একটা স্বাধীন বিশ্ব প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমাদের জীবনের অবস্থাগুলো

আমাদের কাছে প্রধানত, বাহ্যিক। একমাত্র যে জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, তা হচ্ছে বাসনা, প্রচেষ্টা, ব্যর্থতা বা সাফল্য- অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে একটা ধারাবাহিক পরিবর্তন। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, জীবন হচ্ছে পরিবর্তন এবং পরিবর্তন মূলত অসম্পূর্ণতা। সেই সঙ্গে আবার আমাদের সজ্ঞান অভিজ্ঞতাই হচ্ছে সকল জ্ঞানের ভিত্তি। কাজেই আমাদের আন্তর-অভিজ্ঞতার আলোক ছাড়া আর কোন উপায়ে আমরা সত্যসমূহের বিশ্লেষণ করতে পারি না। বিশেষত জীবনের উপলব্ধিতে ঈশ-চিন্তায় মানবমুখিতা অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে স্রষ্টার একটি সাদৃশ্য আছে- এ ধারণা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কেননা, একমাত্র অন্তর থেকেই জীবনের উপলব্ধি করা যেতে পারে। সরহিন্দের কবি নাসির আলী মূর্তির মুখ দিয়ে ব্রাহ্মণকে যথার্থই বলেছেন :

তোমার নিজের আকৃতির অনুরূপ করে তুমি আমাকে গড়েছ।
তা হলে তোমার নিজের বাইরে আর কি-ই বা তুমি দেখেছ?

ঐশী জীবনের কল্পনায় পাছে মানবজীবনের রূপ এসে পড়ে, এই ভয়ে স্পেনের মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক ইব্‌নে হাজম আল্লাহ্ সম্বন্ধে জীবনের উল্লেখ করতে দ্বিধা করেছিলেন। তাই তিনি চতুরতার সঙ্গে নির্দেশ করেছিলেন যে, আল্লাহকে জীবন্ত বলে বর্ণনা করতে হবে এই কারণে নয় যে, জীবন সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা বা ধারণার অর্থে তিনি জীবন্ত; আল্লাহ্‌কে জীবন্ত বলতে হবে শুধু এই কারণে যে, কুরআনে এভাবেই তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে। ইব্‌নে হাজম আমাদের সজ্ঞান অভিজ্ঞতার শুধু ওপর-স্তরে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলেন, অভিজ্ঞতার গভীরতর স্তরের দিকে তিনি দৃষ্টি দেন নি। অতএব, অপরিহার্য রূপেই তিনি জীবনকে গ্রহণ করেছিলেন একটা ক্রমিক পরিবর্তন অর্থাৎ একটা প্রতিকূল পরিবেশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরম্পরা রূপে। ক্রমিক পরিবর্তন স্পষ্টতঃই অসম্পূর্ণতার একটা চিহ্ন। কাজেই আমরা যদি পরিবর্তনের এই ধারণা নিয়ে বসে থাকি, তা হলে ঐশী জীবনের সঙ্গে ঐশী সম্পূর্ণতার সঙ্গতি বিধানের অসুবিধা দুস্তর হয়ে ওঠে। ইব্‌নে হাজম নিশ্চয়ই মনে করেছিলেন যে, আল্লাহ্‌র সম্পূর্ণতা রাখা যেতে পারে একমাত্র তাঁর জীবনের মূল্যে।

যা হোক, এ অসুবিধা থেকে উদ্ধারের একটি পথ আছে। আমরা দেখেছি, পরম অহমই হচ্ছে সমগ্র সত্তা। ফলত, তাঁর জীবনের বিভিন্ন অবস্থা সম্পূর্ণ নিরূপিত হয় ভেতরের দিক থেকে। কাজেই অসম্পূর্ণ অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ অবস্থায় এবং সম্পূর্ণ অবস্থা থেকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় গতিবিধির অর্থে যে পরিবর্তন, তা স্পষ্টতই তাঁর জীবনের বেলায় প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এ অর্থে যে পরিবর্তন, তা-ই জীবনের একমাত্র সম্ভাব্য রূপ নয়।

আমাদের সজ্ঞান অভিজ্ঞতার সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্রমিক কালের বাহ্যরূপের অন্তরালে রয়েছে সত্যিকার কাল। পরম অহমের অবস্থান খাঁটি কালে যেখানে পরিবর্তন বিচিত্র মানসিক অবস্থার পর্যায়ক্রম রূপে আর থাকে না। তখন এর সত্যিকার রূপ প্রতিভাত হয় ধারাবাহিক সৃষ্টি রূপে, সে সৃষ্টিকে ক্লান্তি স্পর্শ করে না এবং তন্দ্রা অভিভূত করে না, পরম অহমকে পরিবর্তনের এই অর্থে পরিবর্তনহীন বললে তাঁকে চরম নিষ্ক্রিয়তা- একটা উদ্দেশ্যহীন বদ্ধ নিরপেক্ষতা, একটা একান্ত অর্থহীনতা রূপে ধারণা করা হয়। সৃজনশীল সত্তার কাছে পরিবর্তনের অর্থ অসম্পূর্ণতা হতে পারে না। অ্যারিস্টটলই হয় তো ইব্‌নে হাজমের মনে বিশ্বাস জন্মিয়েছিলেন যে, সৃজনশীল সত্তার পূর্ণতা হচ্ছে যান্ত্রিক উপায়ে উপলব্ধ অচলতার মধ্যে। এ মত ভুল। সত্তার সম্পূর্ণতা হচ্ছে তার সৃজনশীল কার্যের বিশালতর ভিত্তিতে, তার সৃজনশীল স্বপ্নের অনন্ত অবকাশের মধ্যে। আল্লাহ্‌র জীবনটা হচ্ছে আত্মপ্রকাশ, কোন আদর্শ বা লক্ষ্যে পৌঁছুবার প্রচেষ্টা নয়। মানুষের বেলায় 'যা এখনো হয়নি' বললে প্রচেষ্টা বোঝায়, আবার ব্যর্থতাও বোঝাতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ সম্পর্কে 'যা এখনো- হয়নি'র অর্থ তাঁর সত্তার অনন্ত সৃজনশীল সম্ভাবনাসমূহের অব্যর্থ রূপায়ণ। গোটা সৃজন প্রক্রিয়ার মধ্যেও সে সত্তা তার সমগ্রতা বরাবর বজায় রাখে।

অন্তহীন আত্ম-পুনরাবর্তনে সেই এক-ই বয়ে চলেছে চিরকাল।
অসংখ্য খিলান উত্থিত হয়ে, মিলিত হয়ে
বিশাল কাঠামোটি ধরে রাখছে স্থিরভাবে।
সুন্দরতম তারকা, নিকৃষ্টতম মৃত্তিকা-তাল-সকল বস্তু থেকেই
প্রবাহিত হচ্ছে বেঁচে থাকার স্পৃহা।
সকল প্রয়াস সকল প্রচেষ্টা আল্লাহ্‌র মাঝে রয়েছে চিরন্তন শান্তি রূপে। -গ্যেটে

তা হলে দেখা যাচ্ছে, দক্ষতার দিক দিয়েই হোক আর অনুভাবক দিক দিয়েই হোক, অভিজ্ঞতার সকল তথ্যের একটা ব্যাপক দার্শনিক সমালোচনা আমাদের এই সিদ্ধান্তে এনে পৌঁছায় যে, পরম সত্তা হচ্ছে বুদ্ধিগতভাবে পরিচালিত একটি সৃজনশীল জীবন। একটা খুদী রূপে এই জীবনের ব্যাখ্যা করলে তাতে আল্লাহ্‌কে মানুষের আকৃতির অনুরূপ করে গড়ে তোলা হয় না। এর দ্বারা শুধু অভিজ্ঞতার এই সহজ তথ্যকে স্বীকার করা হয় যে, জীবন একটা আকারহীন তরল পদার্থ নয়। এটা একটা সংগঠনকারী ঐক্য-নীতি, একটা সংযোজনশীল ক্রিয়া। এটাই প্রাণবান জীবের যাবতীয় বিক্ষিপ্ত প্রবণতাকে একত্রে ধারণ করে এবং একটা গঠনমূলক উদ্দেশ্যের জন্যে তাদের একমুখী করে তোলে। স্বভাবের দিক দিয়ে চিন্তা মূলত প্রতীকস্বরূপ। চিন্তার ক্রিয়ায় জীবনের সত্যিকার প্রকৃতি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এর দ্বারা জীবনকে শুধু সকল বস্তুর মধ্যে একপ্রকার বিশ্বজনীন ধারা

রূপে চিত্রিত করা চলে। কাজেই জীবন সম্বন্ধে বুদ্ধিগত ধারণার ফল প্রয়োজনীয়তই অদ্বৈতবাদমূলক হয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা জীবনের অনুভাবক দিকের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করি ভেতর থেকে। সহজাত জ্ঞানে জীবন প্রতিভাত হয় একটা ঐক্যবিধায়ক খুদীরূপে। এ জ্ঞানকে যত অসম্পূর্ণই বলা হোক না কেন, এটাই সত্তার পরম স্বরূপের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি। তা হলে অভিজ্ঞতার তথ্যগুলো থেকে সঙ্গতভাবেই অনুমান করা চলে যে, সত্তার চরম স্বরূপটা আধ্যাত্মিক এবং একে ধারণা করতে হবে একটা খুদীরূপে। কিন্তু দর্শনের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে ধর্মের আকাঙ্ক্ষা আরও উর্ধ্বে চলে যায়। দর্শনটা হচ্ছে বস্তুসমূহ সম্পর্কে একটা বুদ্ধিগত অভিমত। কাজেই যে ধারণা বহুবিধ অভিজ্ঞতাকে একটা নিয়মের অধীনে আনতে পারে, সে ধারণার গণ্ডি পার হয়ে যেতে দর্শন অনিচ্ছুক। দর্শন সত্তাকে দেখে যেন দূর থেকে। কিন্তু ধর্ম চায় সত্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ। দর্শন একটা মতবাদ, কিন্তু ধর্ম হচ্ছে জীবন্ত অভিজ্ঞতা, সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠতা। এই ঘনিষ্ঠতা লাভ করতে হলে চিন্তাকে তার নিজের নাগাল পেরিয়ে আরও উর্ধ্বে উঠতে হবে এবং তার সার্থকতা খুঁজতে হবে একটা মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে, যে দৃষ্টিভঙ্গিকেই ধর্ম বর্ণনা করে প্রার্থনা বলে। এই প্রার্থনাই ইসলামের নবীর মুখে শেষ কথাগুলোর অন্যতম।

১. স্কলাস্টিকা ফিলোজফী-মধ্যযুগীয় দর্শনশাস্ত্র, যাতে চুলচেরা সূক্ষ্ম যুক্তির ছিল অতি প্রাধান্য।

তিন

আল্লাহ সম্বন্ধে ধারণা ও ইবাদতের মর্ম

আমরা দেখেছি ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে মানুষের যে বিচার-বিবেচনা, বুদ্ধির নিরিখেও তা টিকে থাকে। অভিজ্ঞতার আরও গুরুত্বপূর্ণ যেসব এলাকা রয়েছে, সমন্বয়ের দৃষ্টিতে সেসবেরও বিচার করলে দেখা যায়- অভিজ্ঞতা মাত্রেরই চরম ভিত্তি হচ্ছে বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত এক সৃজন-স্পৃহা। এই সৃজন-স্পৃহাকে খুদী বলে অভিহিত করার হেতুও আমরা পেয়ে গেছি এর আগেই। পরম খুদীকে বড় করে ধরার জন্যে কুরআন তাকে আল্লাহ্ এই নাম দিয়ে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছে নিম্নরূপে :

'বল আল্লাহ্ এক;

সব জিনিসই নির্ভর করে তাঁর ওপর;

কারও তিনি জনক নন।

এবং তিনি জাতও নন।

এবং কেউই তাঁর মত নয়।'

তবে ব্যক্তি জিনিসটা যে ঠিক কি, তা বোঝা কঠিন। বার্গসঁ তাঁর 'ক্রিয়েটিভ ইভোলিউশন' (সৃজনশীল বিবর্তন) গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হচ্ছে একটা স্তরবিভেদের ব্যাপার। মানুষের মধ্যে ঐক্যের মধ্যেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পূর্ণরূপে রূপায়িত হয় না। তিনি বলেছেন, বিশেষ করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে এ কথা বলা চলে যে, এই সুবিন্যস্ত জগতের সর্বত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লাভের প্রবণতা বিদ্যমান বটে, তবে তা নিয়তই প্রজনন-স্পৃহার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যাতে পূর্ণতা লাভ করতে পারে তার জন্যে জীবসত্তার কোন বিছিন্ন অংশের পৃথক অস্তিত্ব না থাকাই প্রয়োজন। কিন্তু তাতে প্রজনন-ক্রিয়াই যে পড়বে অসম্ভব হয়ে। কারণ পুরোনোর বিচ্ছিন্ন অংশ নিয়ে নতুন জীব গঠন ছাড়া প্রজনন তো আর কিছুই নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তার নিজ গৃহেই নিজের শত্রু পোষণ করছে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, তুলনাহীন ও একক খুদীরূপে সমাহিত পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে নিজ গৃহে নিজের দুশমন লালনকারী বলে ধারণা করা চলে না। প্রজনন-অভিলাষের মতো শত্রুর চেয়ে খুদীকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে হবে। কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণায় পূর্ণ খুদীর এই বৈশিষ্ট্য এক অপরিহার্য উপাদান।

বস্তুত, কুরআনে বারবার এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য প্রচলিত খৃস্টীয় মতবাদকে আক্রমণ করার চাইতে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি সম্বন্ধে স্বীয় ধারণাকে জোরদার বা প্রকট করে তোলাই হচ্ছে কুরআনের উদ্দেশ্য। তবে ধর্মীয় চিন্তার ইতিহাসে দেখা

যায় যে, পরম সত্তার এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক ধারণাকে এড়িয়ে চলার বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবনের প্রচেষ্টাই বরাবর চলে আসছে। আর এই পরম সত্তাকে ধারণা করা হয়েছে আলোর মতো একটা স্পষ্ট, বিশাল ও সর্বব্যাপী বিশ্ব-উপাদান রূপে। ফার্নেলও তাঁর গিফোর্ড বক্তৃতায় এ রূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ধর্মের ইতিহাসে অদ্বৈতবাদের দিকেই যে বিভিন্ন চিন্তার প্রবণতা বেশী প্রকট, সে কথা আমিও স্বীকার করি। তবে আমি নিঃশঙ্কভাবে বলতে পারি যে, কুরআন-বর্ণিত আলোর সঙ্গে আল্লাহ্‌র অভিন্নতা সম্বন্ধে ফার্নেলের যে অভিমত, তা ভুল। যে আয়াতের মাত্র একাংশ তিনি উদ্ধৃত করেছেন, সে আয়াতটি পুরোপুরি নিম্নরূপ :

'আল্লাহ আসমান ও জমিনের আলো। তাঁর আলো একটা কুলঙ্গীর
মতো, যাতে রয়েছে একটা প্রদীপ, যে প্রদীপ কাচে ঘেরা;
আর কাচের আবরণটি উজ্জ্বল তারকা-সদৃশ।' (২৪ : ৩৫)

এই আয়াতের প্রথম বাক্যটি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে ব্যক্তিত্ববাদী মতবাদ পরিহারের ধারণাই সৃষ্টি করে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আয়াতটির বাকী অংশে বিবৃত আলোর উপমাটি যদি আমরা অনুধাবন করি, তাহলে ঠিক তার বিপরীত ধারণাই জন্মে। উপমাটিতে প্রথমে আলোকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে একটি শিখায়, তারপর সেই শিখাকে স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট এক তারকা-সদৃশ স্ফটিকে আবদ্ধ করে। আল্লাহ্ ঐ বিশ্বের এক আকারহীন উপাদান- এই ধারণা স্খলনের জন্যে যেন উপমাটিকে এইভাবে প্রসারিত করা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনি করি যে, ইহুদী, খৃস্টান ও ইসলাম ধর্মের প্রত্যাদিষ্ট কিতাবসমূহে আলো রূপে আল্লাহ্‌র যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার এখন ভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষা হচ্ছে, আলোর গতির ওপর আর গতি নেই। কাজেই এই পরিবর্তনশীল জগতে আলোই হচ্ছে পরম সত্তার নিকটতম উপমা । অতএব আল্লাহ্ সম্বন্ধে যখন আলোর উপমা প্রয়োগ করা হয়, তখন আধুনিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তার দ্বারা আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশতাকেই বুঝতে হবে- আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপিত্ব নয়। কারণ আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপিত্বের একটা অদ্বৈতবাদমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ।

তবে এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন না উঠে পারে না। প্রশ্নটি হচ্ছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলতে কি সসমীতা বুঝায় না? আল্লাহ্ যদি হন খুদী এবং সেই হিসেবে ব্যক্তিও, তা হলে আল্লাহ্‌কে আমরা অসীম বলে ধারণা করতে পারি কি করে? এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে স্থানগত অসীমতার অর্থে আল্লাহকে অসীম মনে করা চলে না। আধ্যাত্মিক মূল্য নিরূপণের বেলায় শুধু বিশালত্বের কোন মূল্য নেই। তা ছাড়া এর আগেও আমরা দেখেছি, কাল ও স্থানগত অসীমতা কখনই চরম নয়। আধুনিক বিজ্ঞান প্রকৃতিকে অসীম শূন্যে অবস্থিত নিশ্চল কিছু বলে মনে করে না, বরং পরস্পর সম্পৃক্ত ঘটনাবলীর বিন্যাস বলেই মনে করে। আর এই ঘটনাপুঞ্জের পারস্পরিক সম্বন্ধ থেকেই গড়ে ওঠে স্থান ও কালের ধারণা । অন্য কথায়, পরম খুদীর সৃজনক্রিয়ার যে ব্যাখ্যা মানুষের চিন্তায় ধরা পড়ে তা-ই হচ্ছে

স্থান ও কাল। স্থান ও কাল খুদীরই দুটি সম্ভাবনা এবং তা আমাদের গণিত-নির্ণীত স্থান ও কালের ধারণায় মাত্র আংশিকভাবে রূপায়িত হয়। আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃজনক্রিয়ার উর্ধ্বে এমন কোন স্থান ও কাল নেই, যার দ্বারা তাঁকে অন্য খুদী থেকে স্বতন্ত্র করে দেখান চলে। কাজেই পরম খুদী স্থানগত অসীমতার অর্থে অসীম নয়; আবার যে অর্থে স্থানবদ্ধ খুদী অন্য খুদী থেকে স্বতন্ত্র, সে অর্থে সসীমও নয়। পরম খুদীর অসীমতা তারই সৃজনক্রিয়ার অন্তর্নিহিত অফুরন্ত সম্ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের জ্ঞানগোচর এই বিশ্বটা সেই সৃজন-লীলারই আংশিক বিকাশ মাত্র। এক কথায়, আল্লাহ্র অসীমতা হচ্ছে (সংহরণীয়, প্রসারণীয় নয়) অন্তরমুখী, প্রসারমুখী নয়। অসীমতা বলতে একটা অশেষ ধারা-পর্যায়কে বোঝায় বটে, কিন্তু সেই ধারা-পর্যায় অসীমতা নয়।

নিছক বুদ্ধিগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে আল্লাহ্র সম্বন্ধে কুরআন প্রদত্ত ধারণার অন্যান্য প্রধান প্রধান উপাদান হচ্ছে সৃজনশীলতা, জ্ঞান, সর্বশক্তিমানতা ও চিরন্তনতা। আমি এগুলো সম্বন্ধে পর পর আলোচনা করব।

সসীম মন প্রকৃতিকে একটি প্রতিবন্ধক স্বরূপ স্বতন্ত্র সত্তা বলে মনে করে; এই সত্তার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সে জানতে পারে বটে, কিন্তু তাকে গড়তে পারে না। সে কারণে আমরা সৃজনক্রিয়াকে অতীতের একটি বিশেষ ঘটনা বলেই মনে করতে অভ্যস্ত। আর সেই বিশ্বজগৎ আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় এমন একটি তৈরী জিনিস বলে, নির্মাতার জীবনের সঙ্গে যার কোন জৈবিক সম্পর্ক নেই এবং নির্মাতাও যার নিছক দর্শক ছাড়া আর কিছু নয়। সসীম মনের এই সংকীর্ণ দৃষ্টি থেকেই সৃষ্টির ধারণা নিয়ে এতসব অর্থহীন ধর্মীয় বাক-বিতণ্ডার উৎপত্তি। এ রূপ ধারণায় বিশ্বজগৎ আল্লাহ্র জীবনের একটি আকস্মিক ব্যাপার মাত্র এবং এটা সৃষ্ট না-ও হতে পারত। আসল যে প্রশ্নটির সমাধান আমাদের করতে হবে, তা হচ্ছে এই : এ বিশ্ব কি আল্লাহরই অপর একটা সত্তারূপে তাঁকে প্রতিরোধ করে রয়েছে? আর আল্লাহ্ ও তাঁর এই অপর সত্তার মাঝখানে কি স্থানগত কোন ব্যবধান আছে? এর জবাব হচ্ছে- আল্লাহ্র দিক থেকে দেখলে পূর্বাপর পর্যায়-সমন্বিত ঘটনা-বিশেষের অর্থে কোন সৃষ্টিই নেই। আল্লাহকে প্রতিরোধ করে আছে এমন কোন স্বাধীন সত্তা হিসেবে এ বিশ্বজগৎকে গণ্য করা চলে না, কারণ এ ব্যাপারটি এরূপ দৃষ্টিতে দেখলে আল্লাহ্ ও জগৎ অসীম অবকাশের শূন্য আঁধারে অবস্থিত দুটি স্বতন্ত্র সত্তারূপে পরিণত হয়। আমরা আগেই দেখেছি স্থান, কাল ও বস্তু এই সব ভাষায় আমাদের চিন্তা আল্লাহ্র স্বাধীন সৃজনশক্তির ব্যাখ্যা করেছে মাত্র। এগুলো কোন স্বাধীন, স্থায়ী ও চিরন্তন সত্তা নয়, বরং এগুলো আল্লাহ্র স্বরূপ উপলব্ধি করার কতকগুলো বুদ্ধিগত পথ মাত্র। বিখ্যাত দরবেশ বাইয়াজিদ বুস্তামীর শাগরিদদের মধ্যে সৃষ্টি-বিষয়ক প্রশ্নটি উঠেছিল। প্রচলিত সাধারণ ধারণার ওপর খুব জোর দিয়ে তাঁর একজন শাগরিদ বললেন : এমন একটা সময় ছিল যখন শুধু আল্লাহ্রই অস্তিত্ব ছিল; অন্য আর কিছুর উদ্ভব তখন হয় নি। 'বাইয়াজিদ বললেন : অবস্থা তখন যেরূপ ছিল, এখনও ঠিক সেরূপই আছে'। কাজেই এই বস্তুজগৎ আল্লাহ্র মতই চিরন্তন ও দূর থেকে আল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত কোন উপাদান নয়। এ বস্তুজগতের প্রকৃত স্বরূপ যদি আমরা বিচার

করি তা হলে আমরা দেখব- এ হচ্ছে একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াকেই মানুষের চিন্তা খণ্ডিত করে দেখেছে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বহু বস্তুরূপে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ওপর অধ্যাপক এডিংটন আরও আলোকপাত করেছেন। তাঁর 'স্পেস, টাইম এ্যান্ড গ্রাভিটেশন' (স্থান, কাল ও মাধ্যাকর্ষণ) গ্রন্থ থেকে আমি সংশ্লিষ্ট অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করছি :

আমাদের এ জগৎ ঘটনার সমাবেশ। ঘটনাগুলো আলাদা আলাদা হলেও তাদের মধ্যে এই আলাদা থাকার কতকগুলো মূল সম্বন্ধ আছে। এদের ভেতর থেকে গণিতের সাহায্যে অনেক জটিলতার সম্বন্ধ ও গুণ বের করা যেতে পারে এবং তার সাহায্যে জগতের অবস্থার বৈচিত্র্য বর্ণনা করা সম্ভব। বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে যেমন বহু পথ থাকে, প্রকৃতির মধ্যে এ গুণগুলো তেমনিভাবে বিদ্যমান। জলাভূমির পথগুলো যেন লুকিয়ে থাকে; কেউ তার ওপর হেঁটে চললে তবে পথ হিসেবে তার দাম হয়। এমনিভাবে জগতের বিভিন্ন গুণের যে কোন একটির অস্তিত্ব তখনই মাত্র অপরগুলোর তুলনায় অধিকতর তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে, যখন কোন মন তাকে জানবার জন্যে বেছে নেয়। তেশিরা কাচ যেমন রঙধনুর বিভিন্ন রংকে সাদা আলোর এলোমেলো চাকচিক্য হতে আলাদা করে, ঠিক তেমনই মন ও পদার্থকে তার গুণের অর্থহীন স্তূপ হতে ছেঁকে নেয়। এদের মধ্যে যেসব গুণ অনিত্য, মন তাদের ছেড়ে দেয়, যেগুলো নিত্য তাদের কদরদানী করে। গণিতের সাহায্যে এই সব সম্বন্ধের বিচার করলে দেখা যায় যে, মন একটি মাত্র পথে তার অভীষ্ট সাধন করতে পারে : সে হচ্ছে এ দৃশ্যগোচর জগতের নিত্য পদার্থ হিসেবে কোন একটি গুণক বেছে নেওয়া এবং কাল ও স্থানের বিশেষ কোন অংশে সে গুণকে টিকে থাকার জন্যে বসিয়ে দেওয়া । আর এ জন্যেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও জ্যামিতির নিয়ম পালন করে চলতে হয়। তা হলে এ কি বলা চলে না যে, নিত্যকে জানবার মানসিক প্রচেষ্টাই পদার্থবিজ্ঞানের জগতকে সৃষ্টি করেছে ?

এই অধ্যায়ের শেষ কথাটিই অধ্যাপক এডিংটনের গ্রন্থের নিতান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়গুলোর অন্যতম। নিত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে মন এই যে পদার্থবিজ্ঞানের জগৎ সৃষ্টি করেছে, যা দৃশ্যত স্থায়ী, কিন্তু মূলত পরিবর্তনশীল, তা অধিকতর স্থায়ী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। খুদী ছাড়া এ ভিত্তিকে আর কিছু বলে মনে হয় না। কারণ এ খুদীর মধ্যে নিত্য-অনিত্য উভয় গুণ বর্তমান; সুতরাং একে নিত্যও বলা চলে, অনিত্যও বলা চলে। পদার্থবিদের পক্ষে তার নিজস্ব অনুসন্ধান পথে উপরোক্ত সত্য আবিষ্কার করার আজো বাকী আছে।

কিন্তু আর বেশীদূর অগ্রসর হওয়ার আগে আমাদের আর একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, সে হচ্ছে আল্লাহ্ তাঁর সৃজনী শক্তি দিয়ে কিভাবে সৃষ্টি করেন? আশারীয়রাই হচ্ছে নিতান্ত গোঁড়া অথচ জনপ্রিয় মুসলিম ধর্মবিজ্ঞানী সম্প্রদায়। তাঁরা মনে করেন যে, পারমার্থিক শক্তির সৃজনী পদ্ধতি হচ্ছে আণবিক এবং তাঁরা তাঁদের মতবাদকে নিচে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতের দ্বারা সমর্থন করতে চেয়েছেন বলে মনে হয় :

> 'এখানে (পৃথিবীতে) এমন কোন জিনিসই নেই, যার ভাণ্ডার আমাদের কাছে নয় এবং আমরা সেগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণেই অবতীর্ণ করে থাকি।' (১৫ : ২১)

ইসলামের ইতিহাসে পরমাণুবাদের উত্থান ও তার প্রসার হচ্ছে অ্যারিস্টটলকল্পিত 'অনড় জগত' মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিগত বিপ্লবের প্রথম পূর্বাভাস। এটি মুসলিম চিন্তাধারার ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট তথ্যমূলক অধ্যায়ের অন্যতম। বস্‌রা সম্প্রদায়ের মতবাদগুলোর প্রথম রূপদান করেন আবু হাশিম (৯৩৩ খৃঃ) এবং বাগদাদ সম্প্রদায়ের মতবাদগুলোর যথার্থ ও বলিষ্ঠ রূপ দিয়েছেন ধর্মীয় চিন্তাবিদ আবু বকর বাকিলানী (১০১২ খৃঃ)। পরবর্তীকালে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্পেনের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইহুদী ধর্ম-বিজ্ঞানী মোজেস মামুনিদিস প্রণীত 'Guide of the Perplexed' নামক গ্রন্থে আমরা এর বিশেষ ধারাবাহিক সুবিন্যস্ত বর্ণনা পাচ্ছি। মাংক্ ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে এই গ্রন্থটির ফরাসী অনুবাদ করেন এবং সম্প্রতি আমেরিকার অধ্যাপক ম্যাকডোনা 'Isis' নামক গ্রন্থে এর বিষয়বস্তুর এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন এবং তা থেকে ডক্টর জোমার (Dr. Zwemer) ১৯১৮ সনের জানুয়ারীতে 'মুসলিম জগত' শীর্ষক গ্রন্থে তা পুনর্মুদ্রিত করেছেন।

যা হোক, যেসব চিন্তা-পরম্পরার দরুন পরমাণুবাদ সম্বন্ধীয় মতবাদ ইসলামে সূচিত হয়েছে, অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ড তার কোন কারণ আবিষ্কার করতে প্রয়াস পান নি। তিনি স্বীকার করেছেন যে, ইসলামে উদ্ধৃত পরমাণুবাদের মতো কোন কিছু গ্রীক দর্শনে নেই। কিন্তু যেহেতু তিনি মুসলিম চিন্তানায়কদেরকে কোন মৌলিক চিন্তার কৃতিত্ব দিতে নারাজ, ঠিক সে জন্যেই ইসলামী মতবাদ ও বিশেষ কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতবাদের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ায় তিনি এই সিদ্ধান্তই করে বসেন যে, বৌদ্ধ মতবাদের প্রভাবেই পরমাণুবাদ ইসলামী চিন্তাধারায় সূচিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত এই প্রসঙ্গে এহেন নিছক ভিত্তিহীন কল্পিত মতবাদের উৎসের বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমি শুধু এর অধিকতর বিশিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যগুলোর বর্ণনা করব এবং তার মাধ্যমে আমার বিবেচনায় আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের আলোতে একে কিভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে তা বোঝাবার প্রয়াস পাব।

আশারীয় সম্প্রদায়ের চিন্তানায়কদের মতে এই জগত অনেক মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণ, ওগুলোকে তাঁরা 'জাওয়াহির' নামে অভিহিত করেছেন। এই জাওয়াহিরগুলো অত্যন্ত ক্ষুদ্র অণু অথবা পরমাণু, যাকে আর বিভক্ত করা যায় না। যেহেতু আল্লাহ্‌র সৃজনক্রিয়া অবিরাম চলছে, সে জন্যে এই পরমাণুগুলো সংখ্যায় সীমাবদ্ধ হতে পারে না। প্রতি মুহূর্তেই অভিনব পরমাণুর সৃষ্টি হচ্ছে এবং সে জন্যেই বিশ্ব জগত প্রতিনিয়ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই কুরআনে বলা হয়েছে- 'আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা করেন তা-ই যোগ করেন। পরমাণুর সারাংশ বা প্রকৃত সত্তা তার অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়, তা পমাণুর সারাংশ বা প্রকৃতসত্তা তার অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নয়, তা স্বতন্ত্র, স্বাধীন। এর অর্থ হচ্ছে যে, অস্তিত্ব একটি গুণ, যা আল্লাহ্ পরমাণুর ওপর আরোপ করেন। এই গুণে ভূষিত হওয়ার পূর্বে পরমাণুগুলো যেন আল্লাহ্‌র সৃজনীশক্তির মধ্যে সুপ্ত থাকে এবং তাদের অস্তিত্ব বলতে আল্লাহ্‌র শক্তির বিকাশ ছাড়া আর বেশি কিছু বোঝায় না। কাজেই

পরমাণুর সারাংশের কোন আয়তন নেই; এর অবস্থিতি আছে কিন্তু তার জন্যে স্থানের দরকার নেই। পরমাণুগুলো যখন সমষ্টিবদ্ধ হয় তখনই তারা প্রসারিত হয় আর এ থেকেই স্থানের উৎপত্তি। পরমাণুবাদের সমালোচক ইবনে হাজম মন্তব্য করেছেন যে, কুরআনের ভাষায় সৃষ্টিক্রিয়া ও সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তা হলে আমরা যাকে বস্তু বলি, তার আসল প্রকৃতি হচ্ছে কতকগুলো পরমাণু ক্রিয়ার সমষ্টি।

যা হোক, পরমাণু ক্রিয়ার কোন বুদ্ধিগত ধারণা করা সুকঠিন ব্যাপার। আধুনিক পদার্থ বিদ্যাও কতকগুলো বাস্তব পরমাণুকে ক্রিয়া বলে ধারণা করে। কিন্তু অধ্যাপক এডিংটন দেখিয়েছেন যে, এ মতবাদের সঠিক ফরমূলা (আর্যা) এ যাবত বের করা সম্ভব হয়নি, যদিও অস্পষ্টভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, ক্রিয়ার পরমাণুত্বই (Atomicity) হচ্ছে সাধারণ নিয়ম এবং ইলেকট্রনের আবির্ভাব এর ওপরই কোন প্রকারে নির্ভরশীল।

আমরা আরো দেখেছি যে, প্রত্যেকটি পরমাণুর একটি অবস্থান আছে, যার কোন প্রসারতা নেই। তা-ই যদি সত্য হয়, তবে গতির প্রকৃতি কি? আমরা গতিকে পরমাণুর এক স্থান হতে অন্য স্থানে অতিক্রম করার কাজ ব্যতীত অন্য কিছু বলে তো মনে করতে পারি না। যেহেতু আশারীয়রা মনে করতেন যে, পরমাণুর সমবায়ে স্থানের উৎপত্তি হয়, সে জন্যেই তারা গতিকে কোন বস্তুর যাত্রা-বিন্দু থেকে গন্তব্যসীমার মধ্যবর্তী স্থানের যাবতীয় বিন্দুর ভেতর দিয়ে অতিক্রম বলে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। এমন ব্যাখ্যায় শূন্যের অস্তিত্বকে একটি স্বাধীন সত্তা রূপে স্বীকার করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কাজেই 'শূন্য স্থানের' সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে নাজ্জাম 'তাফরা' বা 'লম্ফবাদ' মতের আশ্রয় নিলেন । তিনি কল্পনা করলেন যে, চলন্ত বস্তু স্থানের যাবতীয় বিন্দুর ভেতর দিয়ে অতিক্রম করে না, উপরন্তু তা স্থানের মধ্যে এক অবস্থান হতে অন্য অবস্থানে লাফ দিয়ে অতিক্রম করে। কাজেই তাঁর মতে দ্রুত ও মন্দ গতির বেগ আসলে সমান। তবে পরবর্তীটির মধ্যে অধিক সংখ্যক বিরাম-বিন্দু বিদ্যমান। আমি স্বীকার করি যে, সমস্যার এই সমাধান আমি স্বয়ং সম্যক অনুধাবন করতে পারি নি। তবে এ বলা যেতে পারে যে, আধুনিক পরমাণুবাদও এ জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং ঈদৃশ সমাধানই প্রস্তাব করেছে। প্ল্যাঙ্কের 'কোয়ানটা' মতবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করতে পারি না যে, একটি চলন্ত পরমাণু স্থানের মধ্যে অব্যাহতগতিতে পরিক্রমণ করে। অধ্যাপক হোয়াইটহেড তাঁর সাইন্স এন্ড দি মডার্ন ওয়ার্ল্ড নামক গ্রন্থে' বলেন, একটি নিতান্ত আশাপ্রদ ব্যাখ্যা হচ্ছে এই শিকারোক্তি যে, ইলেকট্রন অবিরাম গতিতে স্থানের ভেতর দিয়ে চলে না। গতির অস্তিত্বের ধারা সম্বন্ধে বিকল্প ধারণা হচ্ছে এই যে, স্থানের মধ্যে বিভিন্ন অংশে গতি আত্মপ্রকাশ করে ও সেই অংশে কিছুক্ষণ অবস্থান করে। এ যেন একটি মোটর একটি রাস্তায় ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে ধাবমান; সে রাস্তা মোটর অব্যাহতভাবে অতিক্রম করে না, উপরন্তু পরপর সাজানো মাইল নির্দেশকের প্রত্যেকটিতে দু' মিনিটকাল অবস্থান করে।

সৃষ্টি সম্বন্ধীয় এই মতবাদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আকস্মিকতাবাদ (Doctrine of accident) আকস্মিক গুণের ক্রমাগত সৃষ্টির ওপর পরামাণুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল। যদি আল্লাহ্

আকস্মিক গুণ সৃষ্টি করায় বিরত হন, তাহলে পরমাণু আর পরমাণু রূপে অবস্থান করতে পারে না। পরমাণুর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন পজিটিভ ও নিগেটিভ (Positive and Negative)গুণাবলী আছে 'এগুলো জোড়ায় জোড়ায় বিদ্যমান যথা, জীবন ও মৃত্যু, গতি ও বিরাম' এদের কার্যত কোন স্থিতিকাল নেই। এ হতে দু'টি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। (১) প্রথমত, কোন কিছুরই স্থায়ী প্রকৃতি নেই। (২) দ্বিতীয়ত, পরমাণুগুলো সকলেই এক পর্যায়ের অর্থাৎ যাকে আমরা আত্মা বলি তাও কেবলমাত্র এক প্রকারের সূক্ষ্ম বস্তু অথবা শুধু একটি আকস্মিক গুণ (accident)। আশারীয়রা এমন ধারণা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে, সৃষ্টিক্রিয়া অব্যাহতগতিতে চলছে। তাদের এই প্রথম সিদ্ধান্তটি খানিকটা সত্য বলে আমার মনে হয়। আমি পূর্বেই বলেছি, আমার মতে কুরআনের ভাবধারা মোটের উপর গ্রীক ও ল্যাটিন সংস্কারের বিরোধী। একটি চরম স্পৃহা বা শক্তির ওপর বিশ্বসৃষ্টি নির্ভরশীল, এই মতবাদ প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে আশারীয়দের প্রচেষ্টাকে একটি অকৃত্রিম সাধনা বলে আমি মনে করি। এর যাবতীয় ত্রুট-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এটি অ্যারিস্টটল-কল্পিত বদ্ধজগতের ধারণার চেয়ে কুরআনের ভাবধা-রার সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই নিছক কল্পনাগত মতবাদের পুনর্গঠন এবং একে আরো বেশি করে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত করাই হবে ইসলামের ভবিষ্যৎ ধর্ম-বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব। আধুনিক বিজ্ঞানও এই একই পথের পথিক বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি নিছক জড়বাদ বলে প্রতীয়মান হয়। 'নফস' একটি আকস্মিক গুণ (accident)। আশারীয়দের এই ধারণা তাদের স্বীয় মতবাদের আসল তাৎপর্যের পরিপন্থী বলে আমার বিশ্বাস; এই মতবাদ পরমাণুর অব্যাহত অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য পরমাণুর মধ্যে accident-এর অবিরাম সৃষ্টির ওপর একে নির্ভরশীল করেছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, কাল ভিন্ন গতি ধারণার অতীত। এবং যেহেতু মনোজীবন হতেই কালের উৎপত্তি হয় সে জন্যেই কাল গতির চেয়ে সমধিক মৌলিক। যেখানে মনোজীবন নেই সেখানে কালও নেই, আবার কাল না থাকলে গতিও থাকে না। অতএব আশারীয়রা যাকে accident বলেছেন সেই accident পরমাণুর অব্যাহত অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে দায়ী। পরমাণু যখন অস্তিত্ব গুণ লাভ করে তখন তা স্থানের মধ্যে বিস্তৃত হয়। পরমাণুকে খোদায়ী শক্তির অভিব্যক্তি রূপে বিবেচনা করলে তা নিতান্তই আধ্যাত্মিক বলতে হয়। নফ্স একটি অকৃত্রিম ক্রিয়া। দেহ হচ্ছে কেবলমাত্র সে ক্রিয়ারই দৃশ্যমান রূপ এবং সে জন্যেই তাকে পরিমাপ করা চলে। বস্তুত আশারীয়রা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের বিন্দু-মুহূর্তের তত্ত্ব পূর্বেই অস্পষ্টভাবে ধারণা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা বিন্দুর সঙ্গে মুহূর্তের পারস্পরিক স্বরূপ সঠিক উপলব্ধি করতে সমর্থ হন নি। এ দুয়ের মধ্যে মুহূর্তই সমধিক মৌলিক; কিন্তু বিন্দুকে মুহূর্ত হতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, যেহেতু বিন্দু হচ্ছে মুহূর্তের অভিব্যক্তির অপরিহার্য উপায়। বিন্দু কোন বস্তু নয়; এ শুধু মুহূর্তের প্রতি তাকানোর একটি ভঙ্গি। মনে হয় গাযালীর চেয়ে রুমীই ইসলামের মর্ম সমধিক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বলেন :

'আমার দেহ আমা হতেই অস্তিত্ব লাভ করেছে,
এ নয় যে আমি দেহ হতে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়েছি।
মদ আমা হতেই মাদকতা পেয়েছে,
এ নয় যে আমি মদ হতে মাদকতা পেয়েছি।'

সুতরাং সত্যের আসল সারাংশ হচ্ছে আত্মা। বলা বাহুল্য, আত্মার বিভিন্ন স্তর আছে। মুসলিম চিন্তাধারার ইতিহাসে শাহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী মকতুলের লেখায় সত্যের বিভিন্ন স্তরের ধারণা পরিদৃষ্ট হয়। বর্তমানকালে হেগেলের লেখার মধ্যেও এর আরো বিস্তৃত আলোচনা আমরা দেখতে পাই এবং অল্পকাল পূর্বে লর্ড হ্যালডেন রচিত 'আপেক্ষিকতার রাজত্ব' বা 'Reign of Relativity' নামক গ্রন্থেও দেখা যায়। এই গ্রন্থ তিনি মৃত্যুর অতি অল্পকাল পূর্বে প্রকাশ করেছিলেন। আমি পরম সত্যকে একটি খুদী (Ego) রূপে ধারণা করেছি এবং এখন আমি বলতে চাই, পরম খুদী হতেই শুধু সসীম খুদী উৎপত্তি লাভ করতে পারে। পরম খুদীর সৃজনশক্তির মধ্যে চিন্তা ও কর্ম অভিন্ন, আর বিভিন্ন সসীম খুদীর মধ্যে ঐক্য সাধনই এর কাজ। বিশ্বের সর্বত্র বস্তুর অণুর যান্ত্রিক গতি থেকে মানব-আত্মার স্বাধীন চিন্তার গতি পর্যন্ত সবই সেই এক 'মহান অহং'-এর আত্মবিকাশ। খোদায়ী শক্তির প্রত্যেকটি পরমাণু তা অস্তিত্বের মানদণ্ডে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, একটি খুদী। কিন্তু খুদিত্বের বিকাশে বিভিন্ন স্তর আছে। সমস্ত সৃষ্টির ভেতর দিয়ে চলেছে এক ক্রমবিকাশমান খুদীর সুর এবং সে সুর পূর্ণতা লাভ করেছে মানুষের মধ্যে। এ জন্যে কুরআন পরম খুদীকে মানুষের আপন গ্রীবার ধমনীর চেয়েও সন্নিকট বলে ঘোষণা করেছে। খোদায়ী সত্তার জীবনের নিত্যপ্রবাহের মধ্যে আমরা মণিমুক্তার মতো বসবাস ও সঞ্চারণ করি এবং আমাদের সত্তাও এতেই নিহিত।

উৎসারিত, তার গতি হচ্ছে আশারীয়দের পরমাণুবাদকে আধ্যাত্মিক বহুত্ববাদে পরিণত করার দিকে। ভাবীকালের মুসলিম ধর্ম-বিজ্ঞানীদের কর্তব্য হবে এর বিশদ আলোচনা করা। তবে এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে, পরমাণুর কোন যথার্থ স্থান আল্লাহ্‌র সৃজনীশক্তির মধ্যে আছে কি-না আমরা যে পরমাণুকে পরমাণু হিসেবে দেখি তা কেবল আমাদের সীমাবদ্ধ বোধশক্তির জন্যে? এ প্রশ্নের পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত চূড়ান্ত মীমাংসা কি হবে তা আমি বলতে পারি না। মনস্তাত্ত্বিক বিচারে আমার নিকট একটি বিষয়ই সুনিশ্চিত মনে হয়। ঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, যা খুদীকে উপলব্ধি করার মাত্রার অনুপাতে সত্তার মাত্রারও কম-বেশ হয়। খুদীর প্রকৃতি এমন যে, অপরাপর খুদীর ডাকে তার সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও খুদী আত্মকেন্দ্রিক এবং এর ব্যক্তিত্বের একটা নিজস্ব এলাকা আছে যেখানে অন্য খুদীর প্রবেশাধিকার নেই। কেবলমাত্র এতেই খুদী রূপে এর সত্তা নিহিত। কাজেই যে মানুষের মধ্যে খুদিত্ব অপেক্ষাকৃত পূর্ণত্ব লাভ করেছে, খোদায়ী সৃজনীশক্তির অন্তরে তার সত্যিকার একটি আসন আছে এবং এ জন্যেই সে তার পার্শ্ববর্তী অপর সকল জিনিসের চেয়ে অনেকখানি

উচ্চস্তরের সত্তার অধিকারী। আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে কেবল সেই-ই তার স্রষ্টার সৃজনী-জীবনে সচেতনভাবে অংশগ্রহণের অধিকারী। উন্নততর জগৎ কল্পনা করার শক্তি খুদীর আছে। যা আছে, তাকে 'যা হওয়া উচিত'-এর পর্যায়ে উন্নয়ন করার শক্তিও তার আছে। এই অবস্থায় একটা অতুলনীয় এবং ব্যাপক স্বকীয়তার বিকাশ সাধনের স্বার্থে খুদী তার অন্তহীন কর্মজীবনে নিজ পরিবেশকে খাটিয়ে নিতে চায়। কিন্তু খুদীর অমরত্ব ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমার বক্তৃতায় এই বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে আপনাদেরকে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করি। ইত্যবসরে আমি আপনাদের পারমাণবিক সময় সংক্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব। আমার মনে হয় এটাই আশারীয়দের সৃষ্টি সম্পর্কিত তত্ত্বের সবচেয়ে দুর্বল অংশ। চরম সত্তার চিরন্তন গুণ সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত ধারণার জন্যে এই আলোচনার প্রয়োজন।

সময়-সমস্যা হামেশাই মুসলিম চিন্তাবিদ ও মরমীবাদীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এর এক কারণ বোধহয় এই যে, কুরআনে দিন ও রাত্রির পরিক্রমকে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনের অন্যতম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রসূল্লাহ্ নিজেও তাঁর এক সুপ্রসিদ্ধ হাদীসে আল্লাহ্ ও সময় (দহ্‌র)কে অভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। আমি এর আগে এই হাদীসটির কথা আপনাদের কাছে বলেছি।

বলা বাহুল্য, কতিপয় শ্রেষ্ঠ মুসলিম সূফী বিশ্বাস করতেন যে, 'দহ্‌র' শব্দটির মধ্যে রহস্যপূর্ণ তাৎপর্য নিহিত আছে। মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর মতে 'দহ্‌র' আল্লাহ্‌র সুন্দর নামগুলোর অন্যতম এবং রাযীও তাঁর প্রদত্ত কুরআনের তফসীরে বলেছেন যে, কতিপয় মুসলিম সূফী তাঁকে 'দহ্‌র', 'দাইহুর' অথবা 'দাইহার' নামটি জপতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সম্ভবত আশারীয়দের সময় সম্বন্ধে থিওরী হচ্ছে মুসলিম চিন্তাধারার ইতিহাসে সময়কে দর্শনের সাহায্যে বুঝবার প্রথম প্রচেষ্টা। আশারীয়দের মতে সময় হচ্ছে প্রত্যেকটি বর্তমান মুহূর্ত, 'এখন'-এর আনুক্রমিক ধারা। এই ধারণা হতে সম্ভবত এ-ই বোঝায় যে, দুইটি 'এখন'-এর মধ্যে একটি অনধিকৃত মুহূর্ত অর্থাৎ শূন্য আছে। তাঁদের এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের কারণ হলো এই যে, তাঁরা এ সমস্যাকে সম্পূর্ণ বিষয়মুখী দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে চেয়েছেন। গ্রীক চিন্তাধারার ইতিহাস থেকে তাঁরা কোন শিক্ষালাভ করেন নি। গ্রীক চিন্তাবিদরাও একই মত পোষণ করতেন এবং ফলে তাঁরা কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারেন নি। আধুনিককালে নিউটন সময়কে এমন কিছু বলে বর্ণনা করেছেন, যা তার নিজস্ব অন্ত র্নিহিত প্রকৃতি বলে সমভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। এখানে আপত্তি করা যেতে পারে আশারীয়দের মতো নিউটনও বিষয়মুখী দৃষ্টিতে সময় সমস্যার দিকে চেয়েছেন বলেই সময়ের সাথে নদীর উপমা দিয়েছেন। আর এতে তিনি করেছেন এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি। এই কালপ্রবাহে নিমজ্জিত হওয়ার ফলে একটা বস্তুর প্রকৃতিতে কিভাবে পরিবর্তন ঘটে আর সে বস্তু অপর যে সকল বস্তু এই প্রবাহে নিমজ্জিত হয়নি তাদের চেয়ে কিভাবে স্বতন্ত্র তা আমাদের বোধগম্য হয় না। যদি সময়কে নদীর প্রবাহের অনুরূপ মনে করি তা হলে সময়ের সূচনা, অন্ত ও সীমারেখা সম্বন্ধেও আমরা কোন ধারণা করতে পারি না। অধিকন্তু যদি প্রবাহ গতি অথবা অতিক্রমণই সময়ের প্রকৃতির আসল স্বরূপ হয়, তা

হলে প্রথম সময়ের গতি নির্ধারণের জন্য অপর একটি সময়ের প্রয়োজন দ্বিতীয়টির জন্যে এবং এভাবে অনন্তধারায় চলতে থাকবে। অতএব নিতান্ত বিষয়মুখী সময়ের ধারণা বিভিন্ন জটিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

যা হোক, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, বাস্তববাদী আরবীয় চিন্তাবিদগণ গ্রীকদের ন্যায় সময়কে অবাস্তব বলে ভাবতে পারেন নি। যদিও সময়কে উপলব্ধি করার উপযোগী কোন ইন্দ্রিয় আমাদের নেই। তথাপি এও অস্বীকার করা চলে না যে, এ এক প্রকার প্রবাহ এবং সে জন্যেই এর একটা সত্যিকার বাস্তবতা বা পরমাণুগত দিক আছে। বস্তুত আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তও একান্তই আশারীয়দের সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ। সময়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে তদানীন্তন পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনায় বস্তুর বিচ্ছিন্নতা ধরে নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক রণজীয়ার্সের Philosophy and Physics নামক গ্রন্থের এ অংশটুকু বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : 'পরিবর্তন ঘটে- তা আকস্মিক লাফে লাফে ঘটে, উপলব্ধির অতীত ধাপে ধাপে ঘটে না। ভৌতিক পদার্থের সংস্থা কেবলমাত্র সসীম-সংখ্যক বিশিষ্ট অবস্থাতেই থাকতে পারে। যেহেতু দুটি স্বতন্ত্র এবং অতি অব্যবহিত পরপর অবস্থার মধ্যে জগৎ অচল অবস্থায় থাকে, সেহেতু ঐ সময়কালের গতি সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়ে যায়; কাজেই সময় নিজেই বিচ্ছিন্ন : অর্থাৎ সময়েরও পরমাণু (ক্ষুদ্র অংশ) আছে।' আসলে আশারীয়দের গঠনমূলক সাধনা আধুনিক বিজ্ঞানীদের সাধনার মতো একান্তই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বর্জিত ছিল এবং এই অজ্ঞতার ফলে তাঁরা সময়ের মন্ময় দিকটা উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। এই ব্যর্থতার দরুনই তাঁদের থিওরীতে বস্তুর পরমাণুর সমস্যাগুলোর সঙ্গে সময়ের পরমাণুর সংস্থাগুলোর কোন যোগসূত্র থাকে না এবং এভাবে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

এতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, নিতান্ত বিষয়মুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সময়কে বিচার করলে জটিল সমস্যাবলীর উদ্ভব হয়; কারণ আমরা আণবিক সময় আল্লাহ্‌র ওপর আরোপ করতে পারি না। অধ্যাপক আলেকজান্ডার তাঁর 'Space, Time and Deity' শীর্ষক বক্তৃতাবলীতে আল্লাহ্‌কে যেমন একটি বিকাশমান জীবন রূপে কল্পনা করেছেন, তেমনও আমরা করতে পারি না। পরবর্তী যুগের মুসলিম ধর্ম-বিজ্ঞানীরা এই সব সমস্যা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মোল্লা জালাল উদ্দীন দাওয়ানীর 'জওরা'র একটি অধ্যায় আধুনিক পাঠককে অধ্যাপক রয়েস-এর সময় সম্বন্ধীয় ধারণাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এতে তিনি বলেন যে, যদি আমরা সময়কে এক প্রকারের ফাঁক (span) বলে গ্রহণ করি, যা ঘটনাপ্রবাহকে চলমান মিছিল রূপে আবির্ভূত হওয়া সম্ভবপর করে দেয়, আর যদি এই ফাঁককে আমরা একটি ঐক্য বলে ধারণা করি, তাহলে আমাদের বলতেই হয় যে, এই ফাঁক খোদায়ী কার্যকলাপের মৌলিক অবস্থা এবং সে কার্যকলাপের পরবর্তী সব অবস্থাকেই এই ফাঁক ঘিরে আছে। কিন্তু মোল্লা সাহেব নিতান্ত সতর্কতার সঙ্গে এ-ও বলেছেন যে, আনুক্রমিকতার প্রকৃতিকে গভীরভাবে বিচার করলে এর আপেক্ষিকতা প্রকাশ পায়, অথচ এটি আল্লাহ্‌র বেলায় থাকে না। কারণ আল্লাহ্‌র কাছে যাবতীয় ঘটনা একক উপলব্ধির মধ্যে সদা বিরাজমান। সূফী কবি ইরাকীও এই বিষয়টি এই একই

ধারায় বিচার করেছেন। জড় ও আধ্যাত্মিকের ব্যবধানের মাঝে অসংখ্য সত্তা বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান। এদের আপেক্ষিকতার তুলনায় তিনি অসংখ্য ধরনের সময়ের ধারণাও করেছেন। স্থূল জড় পদার্থের সময় উৎপন্ন হয় নভোলোকের আবর্তন থেকে। একে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে ভাগ করা চলে। অতএব প্রকৃতি এমন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একটি দিন নিঃশেষ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অপর দিনটির আবির্ভাব হয় না। অজড় সত্তা যে কালের মধ্যে অবস্থিত তার প্রকৃতিও আনুক্রমিক; কিন্তু এর প্রবাহ এমন যে, জড় পদার্থ যে কালে অবস্থিত তার গোটা এক বৎসর, অজড় সত্তা যে কালে অবস্থিত তার এক দিনের বেশী নয়। আমরা অজড় সত্তার ঊর্ধ্বস্তরে উঠতে উঠতে অবশেষে ঐশী কালে উপনীত হই। সে ঐশী কালে কোনও প্রবাহ নেই। কাজেই সে কালের বেলায় ভাগ, ক্রম বা পরিবর্তন কোনটিই সম্ভব নয়। এ চিরন্তনেরও ঊর্ধ্বে; এ অনাদি ও অনন্ত। এক অবিভাজ্য অনুভূতির মধ্যে আল্লাহ্ যাবতীয় বস্তুকে দৃষ্টি ও শ্রুতি গোচর করেন। সময় আগে আছে বলে আল্লাহ্ আগে নন, বরং আল্লাহ্ আছেন বলেই সময় আছে। এইভাবে কুরআন খোদায়ী কালকে 'আদি গ্রন্থ' বলে অভিহিত করেছে যার ভেতরে সমস্ত ইতিহাস, কার্যকারণের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে এক অতি-চিরন্তন 'এখন'-এর মধ্যে জমা হয়ে আছে। মুসলিম ধর্ম-বিজ্ঞানীদের মধ্যে ফখরউদ্দীন রাযীই কাল সম্বন্ধীয় সমস্যার ওপর সবচেয়ে বেশী নজর দিয়েছেন। তিনি কাল-সম্বন্ধীয় সকল সমসাময়িক মতবাদের বিশদ গবেষণা করেছেন তাঁর Eastern Discussions নামক গ্রন্থে। তাঁর পদ্ধতিও প্রাধনত বিষয়মুখী এবং তিনিও কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। তিনি বলেন, 'এখন পর্যন্ত আমি কালের ধর্ম সম্বন্ধে কোন সত্যই আবিষ্কার করতে সমর্থ হইনি। আমার বইয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরপেক্ষভাবে কাল সম্বন্ধীয় প্রত্যেকটি মতবাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে প্রদত্ত যুক্তির সত্যাসত্য বিচার। বিশেষত কাল-সমস্যার বিচারে আমি দলগত মনোভাব সাধারণত পরিহার করেছি।'

ওপরে আলোচনা হতে এটা সুস্পষ্ট যে, বিষয়মুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে কালের ধর্ম শুধুমাত্র আংশিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভবপর। কেবলমাত্র চেতন অভিজ্ঞাতাতেই কালের সত্যিকার রূপ পরিস্ফুট হতে পারে। কাজেই কালের প্রকৃতি বুঝবার জন্যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই সঠিক পথ। আপনাদের হয়তো মনে আছে যে খুদীর দু'টি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমি আগে আপনাদের বলেছি, একটি বৈশিষ্ট্য কদরদানীমূলক (appreciative) আর একটি ক্ষমতামূলক (efficient)। কদরদান খুদী শুদ্ধকাল অর্থাৎ অনুক্রমহীন পরিবর্তনের মধ্যে অবস্থান করে। কদরদানী থেকে দক্ষতার দিকে ও সহজাত জ্ঞান থেকে বিচার-বুদ্ধির দিকে যে অগ্রগমন তাতেই খুদীর জীবন; এবং এই চলাচলের মাধ্যমেই আণবিক সময়ের উদ্ভব হয়। এইভাবে আমাদের সচেতন অভিজ্ঞতা, যা থেকে আমাদের সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা নতুন পর্যায় সূচিত হয়, তার চারিত্র্য থেকে আমরা এমন একটি ধারণার (concept) সূত্র পাই, যা একটি জৈবিক সমগ্র অথবা চিরন্তন রূপে পরিগণিত সময় এবং আণবিক রূপে পরিগণিত সময়ের স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনের পরস্পরবিরোধী ধারণার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। তাই যদি আমরা সচেতন অভিজ্ঞতাকে দিশারী বলে ধরে নিই এবং সর্বাধার খুদীর জীবনকে

সসীম খুদীর অনুরূপ বলে চিন্তা করি, তাহলে আমরা পরম খুদীর সাক্ষাৎ পাই অনুক্রমহীন পরিবর্তনের মধ্যে, সে পরিবর্তন একটি জৈবিক সমগ্র, যা খুদীর সৃজনশীল গতির জন্যে আণবিক বলে মনে হয়। মীর দামাদ ও মোল্লা বাকী এ দুজনের কথার মর্মও এই-ই। তাঁরা বলেন, 'পরম খুদী যে সৃজনমূলক কাজের দ্বারা আত্মোপলব্ধি করে ও তাঁর অনির্দিষ্ট সৃজন-সম্ভাবনার অসীম ঐশ্বর্যের পরিমাণ পরখ করতে চায়, সেই সৃজনমূলক কাজের সাথেই কালের জন্ম হয়। তাহলে খুদী একদিকে থাকে চিরন্তনের, অর্থাৎ অনুক্রমহীন পরিবর্তনের মধ্যে, অন্যদিকে থাকে ধারাবাহিক কালের মধ্যে। কেবলমাত্র এই অর্থেই কুরআনের এই আয়াতটি বোঝা সম্ভব : 'আল্লাহর হাতেই দিন ও রাত্রির আবর্তন ন্যস্ত'। সমস্যাটির এই জটিলতা সম্বন্ধে আমি পূর্ববর্তী আলোচনায় অনেক বলেছি। এখন জ্ঞান ও সর্ব শক্তিমত্তার ঐশী গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার।

'জ্ঞান' শব্দটি সসীম খুদীর প্রতি প্রযুক্ত অর্থে সর্বদাই অসম্বন্ধ অভিজ্ঞতা বোঝায়। এ একটি পার্থিব ব্যাপার এবং একটি প্রকৃত 'অন্যকে কেন্দ্র করে এর কারবার।' মনে করা হয়, এই 'অন্য' স্বাধীনভাবে বিদ্যমান এবং তা জ্ঞাতা খুদীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। এই অর্থে জ্ঞান, এমনকি সর্বজ্ঞতাও এক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা 'অন্যের সাথে আবশ্যিকভাবে সম্পৃক্ত থাকে এবং সে জন্যেই চরম খুদীর যে পরিপ্রেক্ষিত আছে তেমনটি পরম খুদীর আছে বলে ভাবা যায় না, যেহেতু পরম খুদী সবকিছুরই আধার। আমরা পূর্বেই দেখেছি, এই বিশ্ব একটি স্বাধীন ও বিরোধী 'অন্য' কিছু রূপে আল্লাহ্‌র পাশাপাশি বিদ্যমান নয়।

আল্লাহর সৃষ্টিক্রিয়াকে যখন আমরা বিশিষ্ট ঘটনা হিসেবে দেখি, কেবলমাত্র তখনই বিশ্বলোককে স্বাধীন ও আলাদা মনে হয়। সমুদয় জিনিসের আধার চরম খুদীর বেলায় আলাদা বলতে কিছু নেই। আল্লাহ্‌র বেলায় চিন্তা এবং কর্ম, জ্ঞান এবং সৃষ্টি অভিন্ন। তর্ক করা চলে যে, এক বিরোধী অ-খুদী ভিন্ন সসীম অথবা অসীম খুদীকে কল্পনা করা যায় না। আর যদি পরম খুদীর বাইরে কোন কিছু না থাকে তবে পরম খুদীকে খুদী আখ্যা দেওয়া চলে না। জবাবে বলা চলে যে, নেতিবাচক যুক্তি দিয়ে বাস্তব ধারণা সৃষ্টি করা যায় না। কারণ তার ভিত্তি হচ্ছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাস্তব বৈশিষ্ট্য। বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই চরম সত্তা প্রতিভাত হয়। আমাদের অভিজ্ঞতার বিচার-বিবেচনায় এ-ই প্রকাশ পায় যে, চরম সত্তা একটি যুক্তি-নিয়ন্ত্রিত জীবন, যাকে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি জৈবিক সমগ্রতা ভিন্ন অপর কিছু ভাবা সম্ভব নয়। এ যেন একান্ত ঘন সন্নিবিষ্ট একটা কিছু, যাতে রয়েছে সম্পর্কে একটা কেন্দ্রবিন্দু। জীবনের বৈশিষ্ট্য এমন হওয়ায় পরম জীবনকেও একটি খুদী বলেই মাত্র ভাবা যায়। সুতরাং জ্ঞান অসম্বন্ধ অভিজ্ঞতা অর্থে যতই অসীম হোক না কেন, চরম খুদীর বেলায় প্রযোজ্য নয়। কারণ চরম খুদী যে শুধু জানে তা নয়, জ্ঞানের বিষয়বস্তুর পটভূমিকাও রচনা করে। দুর্ভাগ্যবশত ভাষা এখানে বেশী সাহায্য করে না। এমন কোন ভাষাই নেই, যা দিয়ে এমন জ্ঞানের বর্ণনা করা যায়, যে-জ্ঞান নিজের বিষয়বস্তুর পটভূমিকাও সৃষ্টি করে। আল্লাহ কিভাবে জানেন তার বিকল্প ধারণা হচ্ছে আল্লাহ্‌কে সর্বজ্ঞ মনে করা যায়, অর্থাৎ

আল্লাহ্ এক অবিভাজ্য অনুভূতির মধ্যেই বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা-পরিক্রমাকে এক চিরন্ত ন 'এখন'-এর মধ্যে সাক্ষাৎভাবে অনুভব করেন। জালাল উদ্দীন দাওয়ানী, ইরাকী এবং অধুনাতন যুগে অধ্যাপক রয়েস আল্লাহ্র জ্ঞানকে এভাবে কল্পনা করেছেন। এ ধারণায় খানিকটা সত্য আছে। কিন্তু এ একটি সীমাবদ্ধ বিশ্বের ধারণা দেয়, যার ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট, যাতে অপরিবর্তনীয় ও সুনির্দিষ্ট ঘটনা-পর্যায় পূর্বাহ্ণেই অবধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আছে। আর এতে এই-ই বোঝায় যে আল্লাহর সৃজনশীল কর্মধারা যেন এক বৃহত্তর নিয়তির হাতে পূর্ব হতেই নির্ধারিত হয়ে আছে। বস্তুত আল্লাহ্র জ্ঞানকে একটি নিষ্ক্রিয় সর্বচেতনা রূপে গণ্য করলে আইনস্টাইন-পূর্ব যুগের পদার্থ বিদ্যার নিষ্ক্রয় 'শূন্যের' ধারণা ছাড়া অন্য কিছুতেই পৌছানো যায় না। এ বস্তুনিচয়কে একমাত্র সন্নিবেশিত করে তাদের ওপর একটি ঐক্যমূলক সাদৃশ্য আরোপ করে। আল্লার জ্ঞান যেন একটি আয়না, যার মধ্যে নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রতিফলিত হয় পূর্বাহ্লানেই নির্ধারিত পদার্থের রূপরাশি, আর তা সসীম চেতনায় প্রতিভাত হয় শুধু আংশিকভাবে। আল্লাহ্র জ্ঞানকে অবশ্যই ভাবতে হবে একটি জীবন্ত সৃজনী ক্রিয়ারূপে আর সেই ক্রিয়ার মধ্যে বস্তুনিচয় স্বীয় অধিকার বলেই বিদ্যমান আর এরা তার সঙ্গে জৈবিকভাবে সম্বন্ধযুক্ত। আল্লাহ্র জ্ঞানকে এক রকমের প্রতিফলনকারী আয়না মনে করলে অনাগত ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কে আল্লাহ্র পূর্ব জ্ঞানের তত্ত্বকে অবশ্য রক্ষা করা যায়। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, আমরা তা করতে পারি তাঁর স্বাধীনতার বিনিময়ে। আল্লাহ্র সৃজনী-জীবনের জৈবিক সমগ্রের মধ্যে ভবিষ্যৎ অবশ্যই পূর্ব হতেই বিদ্যমান। কিন্তু তা অনবরুদ্ধ সম্ভাবনারূপেই পূর্ব হতে বিদ্যমান, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ঘটনা-পরিক্রমার অবধারিত পর্যায়রূপে নয়। এখানে একটি দৃষ্টান্ত সম্ভবত আমার বক্তব্য অনুধাবন করতে সাহায্য করবে। মনে করুন, মানব-চিন্তার ইতিহাসে কখনও কখনও এমন ঘটে যে, চেতনার আলোতে বিশিষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ ফলবান ধারণার উদ্ভব হয়। একটি জটিল সমগ্র রূপে ধারণাটি তৎক্ষণাৎই উপলব্ধ হয়। কিন্তু তার অসংখ্য বুদ্ধিগত তাৎপর্য প্রতিভাত হয় কালক্রমে। আইডিয়াটির সমুদয় সম্ভাবনা দিব্য প্রত্যক্ষ রূপে আমাদের মনে বিদ্যমান থাকে। যদি কোন একটি বুদ্ধিগত সম্ভাবনা কোন সময়ে আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকে, তা হলে এই অজ্ঞানতার কারণ আমাদের জ্ঞানের ক্রটি নয়; তার কারণ তখন পর্যন্ত তা জ্ঞানগম্য করার কোন সম্ভাবনা না থাকা। অভিজ্ঞতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে আইডিয়াটির প্রয়োগের সম্ভাবনা প্রতিভাত হয় এবং কখনও এক যুগের সকল চিন্তাবিদের প্রচেষ্টায়ও তার সম্ভাবনা বিকাশ নিঃশেষিত হয় না। আল্লাহর জ্ঞান এক জাতীয় নিষ্ক্রিয় সর্বজ্ঞাতা মনে করলেও কোন স্রষ্টার ধারণায় পৌছানো যায় না। যদি ইতিহাসকে শুধু পূর্বাহ্ণে নির্ধারিত ঘটনা-পরিক্রমার ক্রমবিকশিত প্রতিচ্ছবি বলে মনে করা হয়। তা হলে তাতে অভিনবত্ব ও নবপ্রেরণার কোন স্থান থাকে না; ফলে সৃষ্টি শব্দটি হয়ে পড়ে নিরর্থক। কেবলমাত্র মৌলিক কর্ম সম্পাদনের নিজস্ব শক্তি থাকার অর্থেই আমরা সৃষ্টি শব্দটিকে বুঝি। প্রকৃত কথা হচ্ছে ধর্ম-তাত্ত্বিকদের অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিতর্ক নিছক কল্পনাপ্রসূত এবং জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততা, যা একটি অভিজ্ঞতা, সে কল্পনা তা থেকে বঞ্চিত। নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে, অ-পূর্ব নির্ধারিত স্বাধীন কর্ম করার

ক্ষমতাসম্পন্ন সসীম খুদীর আবির্ভাব এক অর্থে সর্বব্যাপী পরম খুদীর স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে দেয়। কিন্তু এই সসীমতা বাইরে থেকে আসে না। এ তাঁর সৃজনী স্বাধীনতাপ্রসূত এবং তা দিয়ে তিনি সসীম খুদীসমূহকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন তাঁর জীবনের ক্ষমতার ও স্বাধীনতার সহযোগী হিসেবে।

তা হলে এখন প্রশ্ন করা চলে যে, সসীমতার সঙ্গে সর্বশক্তিমত্তার সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব কি-না। সসীমতা শব্দটি দেখেই আতঙ্কিত হওয়ার কোন হেতু নেই। কুরআন বাস্তব বিশ্বজনীন নীতিসমূহকে বিশেষ স্থান দেয় না। এ প্রতিনিয়তই বাস্তবের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। মাত্র অল্পকাল পূর্বে আপেক্ষিক মতবাদ আধুনিক দর্শনকে এই সত্যটি শিক্ষা দিয়েছে। সৃজনধর্মী হোক আর অপর জাতীয়ই হোক সব কর্ম হচ্ছে এক রকম সসীমতা, যা ব্যতীত আল্লাহকে একটি যথার্থ সৃজনী শক্তিরূপে কল্পনা করা অসম্ভব। সর্বশক্তিমানকে কোন অবাস্তব কল্পনার আলোকে চিন্তা করলে মনে হবে যেন সে শক্তি শুধু একটি অন্ধ খেয়ালী সীমাহীন শক্তি। প্রকৃতি যে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত শক্তিসমূহের একটি সুসংবদ্ধ বিন্যাস, এ সম্বন্ধে কুরআনের ধারণা সুস্পষ্ট। কাজেই কুরআন মনে করে, অনন্ত শক্তি আল্লাহর জ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ এবং সে শক্তি প্রকাশ লাভ করে শৃঙ্খলা ও নিয়মের মাধ্যমে, বিশৃঙ্খল অব্যবস্থার মধ্যে নয়। কুরআন আরও বলে, আল্লাহর হাতে রয়েছে সকল মঙ্গল। যুক্তিনিয়ন্ত্রিত ঐশী ইচ্ছাই যদি মঙ্গল হয় তা হলে একটি বিরাট সমস্যার উদ্ভব হয়। আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমবিবর্তনের যে চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে, তাতে দেখা যায় যে, এ ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দুঃখ ও অনাচারও যেন বিশ্বজনীন। অবশ্য অনাচারের কাজটা কেবল মানব সমাজেই সীমাবদ্ধ; কিন্তু দুঃখ তো প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান। অবশ্য এ-ও সত্য যে, মানুষ যাকে কল্যাণ বলে ধারণা করেছে, তার জন্যে মানুষই সবচেয়ে বেশী দুঃখ ভোগ করে আসছে । কাজেই দেখা যাচ্ছে, নৈতিক ও দৈহিক অমঙ্গল প্রকৃতির জীবনে বিরাট আকার ধারণ করে আছে। অমঙ্গলের আপেক্ষিকতা এবং তাকে কল্যাণে রূপান্তরকারী শক্তিসমূহের অস্তিত্বও আমাদের সান্ত্বনার উৎস হতে পারে না; কারণ এই আপেক্ষিকতা এবং রূপান্তর-সম্ভাবনা সত্ত্বেও অমঙ্গলের একটা অত্যন্ত ধনাত্মক (Positive) অস্তিত্ব রয়েছে। তাহলে আল্লাহর সৃষ্টিতে এই যে ব্যাপক দুঃখ ও অনাচার, এর সঙ্গে আল্লাহ্ যে মঙ্গলময় ও সর্বশক্তিমান, এ ধারণার সামঞ্জস্য ঘটে কি করে? এই মর্মান্তিক সমস্যা সত্যিই আস্তিক্যবাদের এক জটিল গ্রন্থি। ন-ম্যান (Naumann) তাঁর 'Briefe Uber Religion' নামক গ্রন্থে সুন্দর বলেছেন, "এ জগৎ সম্বন্ধে সর্বশক্তিমান; তিনি আলো ও ছায়ার মতো একই সঙ্গে জীবন ও মৃত্যু পাঠান; তিনিই মানুষের মুক্তির জন্যে পাঠান প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম এবং সে ধর্ম শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বর আমাদের পরম পিতা। মর্ত্যের ঈশ্বরের (World God) অনুসরণ শিক্ষা দেয় অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের নৈতিকতা, আর যীশু খ্রীস্টের পিতার ভজনা শিক্ষা দেয় দয়া-ধর্মের নীতি; অথচ এরা দুই নন, একই ঈশ্বর। কেমন করে যেন তাঁরা বাহুতে বাহুতে মিলে যান। মর মানুষ বলতে পারে না কোথায় এবং কিরূপে তাঁদের মধ্যে মিলন ঘটে। আশাবাদী ব্রাউনিংয়ের মতে দুনিয়ার সবই ঠিক মতো চলেছে; হতাশাবাদী শপেনহাওয়ার

বলেন, দুনিয়া একটা অনন্ত শীতকাল; এখানে একটা অন্ধশক্তি অসংখ্য প্রকার জীবসৃষ্টির ভেতর দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করে, সে জীবেরা মুহূর্তের জন্যে তাদের জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণনা করে। তারপর চিরকালের জন্যে বিলীন হয়ে যায়। আশাবাদ আর নিরাশাবাদের মধ্যে এই যে বিতর্ক, আমাদের জ্ঞানের বর্তমান পর্যায়ের সাহায্যে এর সমাধান সম্ভব নয়। আমাদের বুদ্ধির সংগঠনই এমন যে, আমরা কোন বস্তুর খণ্ড খণ্ড ধারণা ছাড়া আর কিছু করতে পারি না। বিশ্বজগতের এই যে প্রচণ্ড শক্তি, যে শক্তি একদিকে করে ধ্বংস সাধন, অন্যদিকে করে জীবনের সংরক্ষণ ও সংবর্ধন, তার প্রকৃত স্বরূপ আমরা বুঝতে পারি না। কুরআন শিক্ষা দেয় যে, মানুষের ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক শক্তির ওপর তার নিয়ন্ত্রণক্ষমতার উন্নতি সাধন সম্ভব; কুরআনের এই শিক্ষাকে আশাবাদ বা নিরাশাবাদ কোনটাই বলা চলে না। এ হচ্ছে উন্নতিবাদ। উন্নতিবাদ বলে, বিশ্ব ক্রমবর্ধনশীল, আর আশা করে যে. মানুষ পরিণামে অমঙ্গলের ওপর জয়লাভ করবে।

কিন্তু মানুষের পতন সম্পর্কিত উপাখ্যানে এই জটিল সমস্যা অনুধাবন করার খানিকটা সূত্র মিলে। এই উপাখ্যানে প্রাচীন রূপকগুলো কুরআন আংশিকভাবে রেখে দিয়েছে, তবে নতুনভাবে অর্থবোধক করার মানসে এর যথেষ্ট পরিবর্তনও সাধন করেছে। নতুন যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি সাধন করে নতুন ধর্ম সংযোজনের জন্যে কুরআন অনেক উপাখ্যানকে সামগ্রিক বা আংশিকভাবে রূপান্তরিত করেছে। এই বিশেষ তাৎপর্যটি মুসলমান ও অমুসলমান নির্বিশেষে ইসলাম গবেষক মাত্রই প্রায় সর্বত্রই উপেক্ষা করেছেন। কুরআন এইসব উপাখ্যানকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দান করে নি। কুরআন প্রায় সর্বত্রই এগুলোর একটি নৈতিক ও দার্শনিক ভাষ্য দিতে প্রচেষ্টা নিয়েছে এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে ব্যক্তির নাম ও ঘটনাস্থানকে উপাখ্যান থেকে বর্জন করেছে; কারণ সেগুলো আখ্যায়িকাকে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা বলে ধারণা সৃষ্টির দ্বারা তাদের অর্থ সীমাবদ্ধ করে দেয়। আর এই একই উদ্দেশ্যে কাহিনীর বাহুল্য অংশগুলোও কুরআন বর্জন করেছে। কাহিনীগুলোকে এভাবে সাজানো কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য সাহিত্যেও এই নিয়ম প্রচলিত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফাউস্ট উপাখ্যানের উল্লেখ করা যায়। গ্যেটের প্রতিভার অগ্নি-স্পর্শে এ সম্পূর্ণ অভিনব অর্থসূচক হয়ে উঠেছে।

'পতন'-এর কাহিনী প্রাচীন যুগের সাহিত্যে নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। কখন্ কোন্ প্রয়োজনের তাগিদে এর কোন্ রূপান্তর ঘটেছে তা বলা কঠিন। তবে সেমেটিক জাতির মধ্যে কাহিনীটি যেভাবে চলে এসেছে, তা বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, প্রাচীন যুগের মানুষ তার জীবনের চারদিকে অহরহ যে নিদারুণ দুঃখ, ব্যাধি ও বিপদের লীলা দেখেছে, তাতে অধীর হয়ে সে বেদনার্ত পরিস্থিতির একটি ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য এই কাহিনীর সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতির দুর্জয় শক্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন শক্তি না থাকায় সে যুগের মানুষ স্বভাবতই জীবনকে দুঃখময় মনে করেছে। একটি প্রাচীন ব্যাবিলনীয় উৎকর্ণ চিত্রে আমরা দেখি একটি সাপ (লিঙ্গবাদের প্রতীক), একটি গাছ এবং একটি পুরুষকে একটি আপেল ফল (কুমারিত্বের প্রতীক) প্রদানরতা একটি নারী। এ কাহিনীর মর্মার্থ

পরিষ্কার; অর্থাৎ কল্পিত সুখস্থান হতে পতনের কারণ হল নর-নারীর আদি যৌনমিলন। বাইবেলের আদি পুস্তকে এ কাহিনী যেভাবে বর্ণিত আছে তার সাথে তুলনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় কুরআন কিভাবে এ কাহিনীটির ব্যবহার করেছে।

১. সর্প ও পঞ্জরের কাহিনী কুরআন একেবারে বাদ দিয়েছে। প্রথমটি বাদ দেওয়ার সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে কাহিনীটিকে লিঙ্গবাদ ও দুঃখবাদের পরিবেশ থেকে মুক্ত করা। কুরআন আখ্যায়িকাটিকে ঐতিহাসিক অর্থে প্রয়োগ করতে চায় না, এই জন্যেই পরবর্তীটি বাদ দেওয়া হয়েছে। আদি নর-নারী যুগলের উৎপত্তির কাহিনীকে বনী-ইসরাইলের ইতিহাসের ভূমিকা রূপে বর্ণনা করে ওল্ড টেস্টামেন্ট একে ঐতিহাসিকতার ভিত্তিদান করেছে। বস্তুত, কুরআন যে সকল আয়াতে, চেতনাশীল জীবরূপে মানুষের উৎপত্তি বর্ণনা করেছে, সেখানে 'বাশার' ও 'ইনসান' শব্দ দু'টিই প্রয়োগ করেছে, 'আদম' শব্দটি প্রয়োগ করে নি; মানুষকে দুনিয়ায় আল্লাহ্র প্রতিভূরূপে বর্ণনা করার জন্যে 'আদম' শব্দটি আলাদা করে রেখেছে। বাইবেলে বর্ণিত আদম ও ঈভ- এই বিশেষ নাম বর্জন করে কুরআন তার এই উদ্দেশ্য আরও সার্থক করেছে। 'আদম' শব্দটি কোন বাস্তব ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, মানব জাতির সাধারণ প্রতীক। এই অর্থে শব্দটির প্রয়োগের সমর্থন কুরআনের মধ্যেই পাওয়া যায়। নিম্নে উদ্ধৃত আয়াতটি পরিষ্কারভাবে এর পরিপোষক :

> আমরা তোমাদের সৃষ্টি করার পর রূপ দিয়েছি, তারপর ফেরেশ্তাদের বলেছি : তোমরা আদমের (মানবতার) নিকট মাথা নত কর (তোমরা আদমকে সিজদা কর)।

২. কুরআন দুটি স্বতন্ত্র ঘটনায় উপাখ্যানটিকে ভাগ করেছে- একটি শুধু 'বৃক্ষের' সম্পর্কে এবং অন্যটি 'চিরন্তন বৃক্ষের', আর সেই জগতের যার ক্ষয় নেই। কুরআনের সপ্তম সূরায় প্রথম ঘটনাটি ও বিংশ সূরায় দ্বিতীয় ঘটনাটির উল্লেখ আছে। কুরআন বলে যে, আদম ও তার স্ত্রী হাওয়া শয়তানের প্ররোচনায় বিপথগামী হয়েছে : শয়তানের কাজই হচ্ছে মানুষের সংশয় সৃষ্টি করা, তার ফলে মানুষ উভয় বৃক্ষের ফল আস্বাদন করেছে। পক্ষান্তরে ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনানুসারে মানুষ বেহেশতের বাগিচা থেকে তখনই বিতাড়িত হয়েছিল, যে মুহূর্তে সে প্রথম অবাধ্যতা করেছিল এবং আল্লাহ্ বাগানের পূর্বপ্রান্তে প্রহরায় রেখেছিলেন ফেরেশ্তাদের, আর রেখেছিলেন চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান একটি জ্বলন্ত তলোয়ার, যাতে জীবন বৃক্ষের কাছে যাওয়া সম্ভব না হয়।

৩. আদমের অবাধ্যতার জন্যে ওল্ড টেস্টামেন্টে এই জগৎকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। আর কুরআন এই জগৎকে মানুষের আবাসভূমি ও এক বড় নিয়ামতের উৎসস্থল বলে ঘোষণা করেছে. যার দখল লাভের জন্যে আল্লাহ্র কাছে মানুষের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

> আমরা তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং সেখানে তোমাদের জীবনধারণের সামগ্রীসমূহ প্রদান করেছি, এর জন্যে তোমরা কতটুকু কৃতজ্ঞ? (৭ : ৯)

অথবা যে অতিপ্রাকৃত স্বর্গলোক হতে মানুষ মর্ত্যে নির্বাসিত হয়েছে বলে মনে করা হয়. এখানে 'জান্নাত' শব্দটি যে সে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এমন মনে করার কোন হেতু নেই।

কুরআনের মতানুসারে মানুষ এই মর্ত্যলোকে আগন্তুক নয়। কুরআন বলে, 'আমরা তোমাদিগকে এই মর্ত্যলোক থেকেই জন্ম দিয়েছি।'

উপাখ্যানে উল্লিখিত 'জান্নাত'-এর দ্বারা পুণ্যবানদের নিত্য-আবাস জাতীয় কোন স্থান বোঝায় না। পুণ্যাত্মাদের নিত্য-আবাসস্বরূপ জান্নাতের যে বর্ণনা কুরআন দিয়েছে, তাতে দেখা যায় 'সেখানে পুণ্যবানরা পরস্পর পেয়ালা বদল করবেন, কিন্তু তাতে কোন লঘু আলোচনা বা পাপাসক্তির উদ্রেক হবে না।'

কাজেই আমরা দেখতে পাই, কুরআন বর্ণিত 'আদমের পতন' উপাখ্যানের সাথে এই ধরা-পৃষ্ঠে মানুষের প্রথম আবির্ভাবের কোনই সম্বন্ধ নেই; বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যখন সহজাত বৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো, তা থেকে সচেতন স্বাধীন খুদীর আবির্ভাবের আভাস দান, যাতে করে মানুষ অর্জন করল সংশয় ও অবাধ্যতার শক্তি। এই পতন কোন নৈতিক ভ্রষ্টতা বোঝায় না; এ হচ্ছে মানব-জীবনে নিছক চেতন অবস্থা হতে আত্মসচেতন অবস্থায় উন্নতি হওয়ার প্রথম চমক, এ-যেন প্রকৃতির স্বপন হতে ব্যক্তির নিজের জীবনে সক্রিয়তার উন্মেষেরই স্পন্দন। আর কুরআন এই ধারাকে এমন একটি নির্যাতনাগার বলে মনে করে না- যেখানে পাপাচারী মানব তার আদিম পাপের জন্যে কারারুদ্ধ হয়ে আছে। মানবের প্রথম অবাধ্যতাজনিত কাজ তার স্বনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন কাজও বটে এবং সে জন্যেই কুরআনের বর্ণনায় মানুষের প্রথম অবাধ্যতাজনিত অপরাধকে ক্ষমা করা হয়েছে। সততা কোন বাধ্যবাধকতার ব্যাপার নয়; এ হচ্ছে নৈতিক আদর্শের নিকট খুদীর স্বাধীন আত্মসমর্পণ এবং তা বিভিন্ন খুদীর ইচ্ছাকৃত পরস্পর-সহযোগিতার মধ্যে উৎপত্তি লাভ করে। যে জীবের যাবতীয় আচরণ যন্ত্রের মত একান্ত নিয়ন্ত্রিত সে কোন ভাল কাজ করতে পারে না; যেহেতু ভাল করার শর্ত হচ্ছে স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বাধীনতা না থাকলে ভাল-মন্দের প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু সামনের বিভিন্ন পথের বিচার করে তারপর একটিকে গ্রহণ করার যে শক্তি, এমন শক্তিবিশিষ্ট একটি সসীম খুদীর আবির্ভাব হতে দেওয়া আল্লাহর পক্ষে বেশ ঝুঁকি নেয়ার কাজ। কারণ যে খুদীর ভালকে পছন্দ করার স্বাধীনতা আছে, মন্দকে পছন্দ করার ব্যাপারেও সে স্বাধীন। আল্লাহর এ ঝুঁকি নেওয়া থেকে বোঝায় মানুষের ওপর আল্লাহর বিরাট আস্থা। এখন এই ন্যস্ত বিশ্বাসের মর্যাদা যাতে রক্ষা পায় সে কাজ মানুষকেই করতে হবে। সম্ভবত এ জন্যেই আল্লাহ্ মানুষকে 'উৎকৃষ্টতম উপাদানে' সৃষ্টি করেও তাকে নানা বিপদে ফেলে পরীক্ষা করে নিচ্ছেন। কুরআন বলে, 'তোমাদিগকে যাচাই করার জন্যেই আমরা ভাল ও মন্দের ভেতর তোমাদিগকে পরীক্ষা করি।" (২১ : ৩৫) অতএব ভাল এবং মন্দ যদিও বিপরীত তথাপি উভয়েই অবশ্য একই সমগ্রের অন্তর্ভুক্ত। বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে কোন কিছুই নেই, কারণ এক-একটি ঘটনা হচ্ছে এক সুসংবদ্ধ সমগ্র; তাদের উপাদানসমূহকে বুঝতে হলে তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ককে অনুধাবন করতে হবে। তর্কশাস্ত্রের বিচারে বস্তুর উপাদানসমূহকে বিচ্ছিন্ন করা হয় কেবলমাত্র তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে প্রতিভাত করার জন্যে।

অধিকন্তু খুদীকে যথার্থ খুদীরূপে বাঁচিয়ে রাখাই হচ্ছে খুদীর ধর্ম। এই জন্যেই এ

অন্বেষণ করে জ্ঞান, আত্মবিস্তার আর শক্তি; অথবা কুরআনের ভাষায় 'সেই রাজ্য যেখানে অভাব দুঃখ নেই'। কুরআনের উপাখ্যানের প্রথম ঘটনাটি মানুষের জ্ঞান লাভের এবং দ্বিতীয়টি তার আত্মবিস্তার ও ক্ষমতা লাভের স্পৃহাকেই বর্ণনা করে। প্রথম ঘটনাটি সম্বন্ধে দু'টি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। যে আয়াতে মানুষকে জিনিসের নাম স্মরণ রাখা ও পুনরাবৃত্তি করার অধিকারী হওয়ায় তাকে ফেরেশ্‌তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে তার অব্যবহিত পরেই প্রথম ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়েছে। আমি ইতিপূর্বেই দেখিয়েছি যে, এই সকল আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবীয় জ্ঞানের ধারণাত্মক স্বরূপ প্রতিপাদন। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন রূপক সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞানের অধিকারিনী মাদাম বলভাস্কি তাঁর Secret Doctrine নামক গ্রন্থে বলেন, আদিম যুগের মানুষ গাছকে তত্ত্বজ্ঞানের গুপ্ত প্রতীক মনে করত। আদমকে যে এই গাছের ফলের আস্বাদ করতে বারণ করা হয়েছিল তার কারণ এই যে, খুদীরূপে তার সসীমতা, তার ইন্দ্রিয়-সম্পদ এবং বুদ্ধিবৃত্তি মোটের ওপর ভিন্ন ধরনের জ্ঞান আহরণের উপযোগী ছিল-যে জ্ঞান কেবলমাত্র একাগ্রতাপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ও ধৈর্যশীল প্রচেষ্টার মারফতই আস্তে আস্তে সঞ্চিত হয়ে থাকে। কিন্তু শয়তান এই গূঢ় জ্ঞান-বৃক্ষের নিষিদ্ধ ফলের আস্বাদ নিতে মানুষকে প্ররোচিত করেছিল এবং আদম তার এ ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। এই ফাঁকিতে পড়ার মানে এ নয় যে, আদম প্রকৃতিতেই পাপপরায়ণ ছিলেন; তার মানে এই যে, তিনি অধীর প্রকৃতির ছিলেন বলে জ্ঞান লাভের সংক্ষিপ্ত পথে চলতে চেয়েছিলেন। তাঁর অধীর হওয়ার এই প্রবণতাকে সংশোধন করার একমাত্র পথ ছিল তাঁকে এমন এক পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করা, যা বেদনাদায়ক হলেও তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের অধিকতর সহায়ক ছিল। কাজেই দুনিয়ার এই দুঃখময় পরিবেশের মধ্যে আদমকে স্থাপন করার মানে তাঁকে শাস্তি দেওয়া নয়, বরং শয়তানের উদ্দেশ্য ব্যাহত করার জন্যেই এই ব্যবস্থা। কারণ অন্তহীন বিকাশ ও সম্প্রসারণের যে আনন্দ, মানুষকে তা থেকে দূরে রাখাই ছিল মানুষের দুশমন ধূর্ত শয়তানের মতলব। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে সসীম খুদীর জীবন নির্ভর করে বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্ভূত জ্ঞানের চিরসম্প্রসারণশীলতার ওপর। আর সসীম খুদীর অভিজ্ঞতা সম্প্রসারণের একমাত্র পথ হল পরীক্ষা ও ভুল করে শোধরানোর পথ। অতএব ভুলকে যদিও একটি বুদ্ধিগত অমঙ্গল বলে বর্ণনা করা চলে, তবু তা অভিজ্ঞতা অর্জনেরই একটি অপরিহার্য অংশবিশেষ।

কুরআনের উপাখ্যানের দ্বিতীয় ঘটনাটি নিম্নরূপ

> কিন্তু শয়তান আদমের কানে কানে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে চিরন্তন গাছ এবং যে রাজ্যে কোন পতন নেই তা দেখাব? তারা উভয়েই তা আস্বাদ করল এবং তাদের নগ্নতা তাদের নিজের কাছে ধরা পড়ল। আর সেই নগ্নতা ঢাকার জন্যে তারা বাগানের পাতা সেলাই করতে শুরু করল এবং আদম তার প্রভুকে অমান্য করল ও বিপথগামী হল; তারপর তার প্রভু তাকে নিজের জন্যে পছন্দ করে নিলেন এবং তার দিকে ফিরে চাইলেন ও তাকে পথ দেখিয়ে দিলেন।

বাস্তব ব্যক্তিত্ব হিসেবে একটা অক্ষয় রাজ্য ও অনন্ত কর্মজীবন অর্জনের জন্যে জীবনের যে অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষা, উপরে উদ্ধৃত অংশের আসল ইশারা তা-ই। জীবন অস্থায়ী, কাজেই সে ভয় পায় যে, মৃত্যুর সঙ্গেই বুঝি তার কর্মজীবনের অবসান হয়ে যায়; তাই তার একমাত্র পথ হচ্ছে প্রজননের দ্বারা আত্মবিস্তারের মারফত এক প্রকারের সমবেত অমরত্ব অর্জন করা। চিরন্তন বৃক্ষের ফল ভক্ষণ মানে যৌন-আস্বাদ গ্রহণ, যার ফলে জন্মে সন্তান এবং তার পূর্ণ বিলোপের পথ হয় রুদ্ধ। ঠিক যেন জীবন মৃত্যুকে বলে, 'তুমি যদি জীবের এ পুরুষকে নিয়ে যাও আমি আর এক পুরুষ সৃষ্টি করব।' কুরআন পূরাকালের আর্টের লিঙ্গ-প্রতীকবাদ বর্জন করেছে, কিন্তু আদমের নগ্ন দেহকে আবৃত করার আগ্রহের মধ্যে তার প্রথম যৌন মিলনের লজ্জানুভূতির উন্মেষ প্রতিভাত হয়। জীবন ধারণ করার মানে হল একটা নির্দিষ্ট অবয়ব-রেখা ও একটি বাস্তব স্বকীয়তার অধিকারী হওয়া। এই মূর্ত স্বকীয়তা অভিব্যক্তি লাভ করে অগণ্য প্রকার জীবনের মধ্যে আর তাদের ভেতর দিয়ে বিকাশ লাভ করে পরম খুদীর অস্তিত্বের অনন্ত সম্পদ। এই স্বকীয়তাবিশিষ্ট জীব-মণ্ডলীর প্রত্যেকেই নিজ সম্ভাবনার স্ফূরণের জন্যে উদগ্রীব। প্রত্যেকেই করতে চায় তার আধিপত্য বিস্তার, আর তারই ফলে এই যুগ-যুগান্তব্যাপী ভয়াবহ জীবন-সংগ্রাম। কুরআন বলে, "তোমরা একেঅপরের শত্রু হিসেবে নেমে যাও"। পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিত্বের এই দ্বন্দ্বই বিশ্বের বেদনার মূল, আর এই বেদনা মানুষের ইহজীবনকে একদিকে করেছে মহিমান্বিত, অন্যদিকে করেছে দুঃখভারাক্রান্ত। মানুষের বেলায় স্বকীয়তা ক্রমে ব্যক্তিত্বে পরিণতি লাভ করে, তার অন্যায় করার শক্তি জন্মে, ফলে তার জীবনের বেদনাও হয়ে পড়ে গভীর। কিন্তু খুদীকে মানব জীবনে ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে তার সসীমতার আনুষঙ্গিক বিপুল অসম্পূর্ণতাকেও গ্রহণ করতে হয়। কুরআন বলে, যে ব্যক্তিত্ব বহনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে স্বর্গ, মর্ত্য ও পর্বত অস্বীকার করেছিল, মানুষ বিপদ স্বীকার করেও স্বেচ্ছায় সে আমানতের ভার নিজ স্কন্ধে নিয়েছে।

> সত্যিই এই গুরুদায়িত্ব নেওয়ার ভার গ্রহণ করার প্রস্তাব আমরা স্বর্গ, মর্ত্য ও পর্বতকে দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সকলেই সে ভার গ্রহণ করতে ভয় করেছিল এবং অস্বীকার করেছিল। মানুষ এগিয়ে এল এবং এই আমানত গ্রহণ করল, কিন্তু তারা নিজেদের অন্যায়কারী ও নির্বোধ বলেই প্রমাণিত করেছে। (৩৩ : ৭২)

তা হলে আনুষঙ্গিক যাবতীয় বিপদ সত্ত্বেও আমরা ব্যক্তিত্বের এ আমানত গ্রহণ করব কি করব না? কুরআনের মতে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব হচ্ছে যাবতীয় বিপদ-আপদে ধৈর্য অবলম্বন। অবশ্য খুদীর ক্রমবিকাশের বর্তমান স্তরে দুঃখের পরিচালন-শক্তি যে শৃঙ্খলাবোধ জাগায়, তার পূর্ণ তাৎপর্য আমরা অনুধাবন করতে পারি না। সম্ভবত দুঃখ খুদীকে শক্তিশালী করে তার লোপ পাওয়ার সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে। তবে এই প্রশ্ন উত্থাপন করে আমরা শুদ্ধ চিন্তার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছি। পরিণামে সততার জয়লাভের প্রতি বিশ্বাস এই স্তরে ধর্মীয় তত্ত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। "আল্লাহ্ তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।" (১২ : ২১)

ইসলামী মতে, আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, তাকে দর্শনের বিচারে কিভাবে সমর্থন করা যায় তা আমি আপনাদের নিকট এতক্ষণ ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু আমি ইতিপূর্বেও বলেছি এবং এখনও বলছি যে, ধর্মীয় লক্ষ্য দর্শনের লক্ষ্যের চেয়েও উর্ধ্বগতিসম্পন্ন। ধর্ম শুধু ধারণা দিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না, তার অভীষ্ট বস্তুর আরো ঘনিষ্ঠ জ্ঞান ও সান্নিধ্য পেতে চায়। যে কর্মের মারফত এ সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব হয় তা হচ্ছে ইবাদত বা প্রার্থনা, যা পরিশেষে আধ্যাত্মিক আলো দান করে। অবশ্য বিভিন্ন পর্যায়ের চৈতন্যের ওপরে ইবাদত বিভিন্ন রকম ক্রিয়া করে। পয়গাম্বরদের চেতনার বেলায় এ মূলত সৃজনধর্মী, অর্থাৎ এ এক অভিনব নৈতিক জগৎ সৃষ্টি করতে চায়, যেখানে পয়গম্বর তদীয় প্রাপ্ত প্রত্যাদেশগুলোর প্রয়োগ-মূল্য যাচাই করতে চান। মুসলিম কৃষ্টির তাৎপর্য প্রসঙ্গে আমার বক্তৃতায় আমি এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা করব। মরমীদের চেতনায় এ প্রধানত জ্ঞানাত্মক (Cognitive)। ইবাদতের অর্থ আমি এই জ্ঞানাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকেই আবিষ্কার করতে চেষ্টা করব। আর ইবাদতের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বিবেচনা করলে এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। আমেরিকার বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্‌স-এর লেখার নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

> বিজ্ঞানের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও এটাই সম্ভব মনে হয় যে, মানুষ অনন্তকাল পর্যন্ত প্রার্থনা করে যাবে যদি না তার মানসিক প্রকৃতির এমন পরিবর্তন ঘটে- যেমনটি ঘটবে বলে আশা করতে পারি; তেমন কিছুই আমাদের চোখে পড়ছে না। উপাসনা করার আগ্রহের হেতু হল এই যে, যদিও মানুষের অভিজ্ঞতা নির্ভর অহংসমূহের অন্ত রতম অহং সামাজিক ধরনের, তবু একমাত্র আদর্শ জগতের সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোথাও তার তৃপ্তি লাভ ঘটে না। ......বেশির ভাগ লোকই হয় সর্বদা না হয় কখনো কখনো তাদের অন্তরে এই আকুতি অনুভব করে থাকে। এই উচ্চতর উপলব্ধির মাধ্যমে দুনিয়ার হীনতম সমাজ বিতাড়িত ব্যক্তিও নিজেকে সত্য ও খাঁটি বলে ভাবতে পারে। পক্ষান্তরে, বাইরের সামাজিক সত্তা ব্যর্থ ও বিড়ম্বিত হওয়ার পর এ ধরনের একটি আন্তর্জাতিক আশ্রয়ের অভাবে আমাদের অধিকাংশের কাছে এ জগৎ বিভীষিকার এক অতলগহ্বর বলে মনে হতো। 'আমি আমাদের অধিকাংশের কাছে বল্‌ছি' এই জন্যে যে, এমন হতে পারে যে বিভিন্ন মানুষ আদর্শ দ্রষ্টার ধারণার দ্বারা অনেকখানি বিভিন্ন পরিমাণে প্রভাবিত হয়। কতক মানুষের চেয়ে অন্য কতক মানুষের চেতনায় তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আছে। যাদের মধ্যে তা সবচেয়ে বেশিমাত্রায় বিদ্যমান, সম্ভবত তারাই সবচেয়ে বেশি ধর্মপ্রাণ মানুষ। কিন্তু এ বিষয়ে আমি নিশ্চত যে, যারা বলে, এ তাদের মধ্যে আদৌ নেই, তারা নিজেকে প্রতারণা করে; বস্তুত তাদের মধ্যে অল্প হোক আর বেশীই হোক, আছেই।

অতএব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বলতে গেলে মানুষের সহজাত বৃত্তি হতেই ইবাদতের উৎপত্তি। ইবাদতের উদ্দেশ্য ধ্যানেরই মতো জ্ঞান অন্বেষণ।

তথাপি উচ্চতর পর্যায়ে ইবাদত নির্বস্তুক ধ্যানের চেয়ে অনেক বেশি। ধ্যানের ন্যায় এ-ও আত্মস্থ করার একটি পদ্ধতি। কিন্তু ইবাদতের মধ্যে আত্মস্থ করার প্রক্রিয়া নিবিড় ঘনিষ্ঠতা লাভ করে এবং তার ফলে এমন একটি শক্তির অধিকারী হয়, যা বিশুদ্ধ চিন্তার অগোচর। চিন্তার মধ্যে মন পরম সত্তার কর্মধারা পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করে; ইবাদতের মধ্যে মন ধীরগতি, বিশ্বজনীনতা অনুধাবনের পথ ছেড়ে দেয় এবং চিন্তার উর্ধ্বে উঠে পরম সত্তাকে উপলব্ধি করত তার কাজের সহযোগী হতে চায়। এর মধ্যে রহস্যময় কিছুই নেই। আধ্যাত্মিক দীপনার প্রক্রিয়া হিসেবে ইবাদত একটি স্বাভাবিক উজ্জীবক ক্রিয়াবিশেষ; এর মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিত্বের দ্বীপটি অকস্মাৎ এক বৃহত্তর সমগ্র জীবনের মধ্যে নিজ অবস্থান খুঁজে পায়। আপনারা মনে করবেন না, আমি এখানে আত্ম-নির্দেশনের (auto-suggesation) কথা বলছি। মানবের খুদীর গভীরতম প্রদেশে যে জীবন-উৎস নিহিত তার মুখ খুলে দেওয়ার মধ্যে আত্মনির্দেশনের কোন ভূমিকা নেই। আধ্যাত্মিক দীপনা (ilomination), ব্যক্তিত্বকে গঠন করে এক অভিনব শক্তির দুয়ার খুলে দেয়। কিন্তু আত্মনির্দেশন জীবনের ওপর কোন স্থায়ী রেখাপাত করে রাখে না। আমি কোন প্রকার গুপ্ত বা বিশিষ্ট জ্ঞানলাভের পদ্ধতির কথাও বলছি না। আমি শুধু আপনাদের দৃষ্টি মানুষের একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর নিবদ্ধ করতে চেষ্টা করছি, যার পেছনে রয়েছে একটা ইতিহাস এবং সম্মুখে আছে এক বিরাট ভবিষ্যৎ।

এ কথা সত্য যে, এই ধরনের অভিজ্ঞতার বিশেষ গবেষণা করে মরমীবাদ খুদীর এক নতুন প্রদেশকে আবিষ্কার করেছে। এর সাহিত্য দীপক; তথাপি এক জীর্ণ দর্শনের চিন্তার ছাঁচে নির্মিত এর গতানুগতিক ভাষা আধুনিক মানুষের মনে করে এক অবসাদের সঞ্চার। খৃস্টান-মুসলিম নির্বিশেষে মরমীবাদীদের অনামা 'কিছুই না'র অন্বেষণ আধুনিক মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। আধুনিক মানুষ বাস্তবের অভিজ্ঞতায় অভ্যস্ত, তারা চায় আল্লাহ্‌র মূর্ত, জ্যান্ত অভিজ্ঞতা; এবং জাতির ইতিহাস এই-ই প্রতিপন্ন করে যে, ইবাদতের মধ্যে যে মনোভঙ্গী মূর্ত, তা এ-ধরনের অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে অপরিহার্য। বস্তুত ইবাদতকে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের বুদ্ধিগত কার্যকলাপের এক অপরিহার্য পরিপূরক অংশরূপে মনে করতে হবে। প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা সত্তার রীতি সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে ওয়াকেফহাল হই এবং এই উপায়ে উক্ত সত্তা সম্বন্ধে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি তীক্ষ্নতর হয়। আমি এখানে মরমী কবি রূমীর একটি সুন্দর কথা উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। মরমীবাদী কি করে পরম সত্তার সন্ধান করেন এতে রূমী তার বর্ণনা করেছেন :

> সূফীর গ্রন্থ কালি এবং অক্ষর দিয়ে লেখা হয় না। তাঁর গ্রন্থ আর অন্য কিছু নয়, সে হচ্ছে তুষারের মতো শুভ্র তাঁর হৃদয়। পণ্ডিতের সম্বল হচ্ছে কলমের দাগ। আর সূফীর সম্বল কি? পদ-চিহ্ন। সূফী শিকারীর মতো সঙ্গোপনে শিকারের খোঁজে যান। তিনি কস্তুরী-মৃগের পদ-চিহ্ন দেখতে পান এবং তার অনুসরণ করেন। মৃগের পদ-চিহ্ন কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর কাছে উপযুক্ত সন্ধান-সূত্র হয়, কিন্তু পরে মৃগের কস্তুরী-

গ্রন্থিই হয় তাঁর পথ নির্দেশক। কস্তুরী-গ্রন্থির সৌগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে এক মঞ্জিল অগ্রসর হওয়া পদ-চিহ্ন অনুসরণ করে শত মঞ্জিল ঘোরাফেরার চেয়ে শ্রেয়।

আসলে জ্ঞানের অন্বেষণ মাত্রই মূলত এক প্রকার ইবাদত। প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক পর্যবেক এক শ্রেণীর উপসনারত মরমী সন্ধানী। এখন যদিও তিনি শুধু কস্তুরী-মৃগের চিহ্ন অনুসরণ করছেন এবং বিনয় ভরে তাঁর অনুসন্ধানের পদ্ধতিকে সীমাবদ্ধ করে রাখছেন, তথাপি তাঁর জ্ঞান-পিপাসা তাঁকে পরিণামে অবশ্যই এমন পর্যায়ে নিয়ে যাবে, যেখানে কস্তুরী-গ্রন্থির সৌগন্ধ তাঁর কাছে মৃগের পদ-চিহ্নের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দিশারী হয়ে দেখা দেবে। কেবলমাত্র তার ফলেই প্রকৃতির ওপরে তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁর সেই সমগ্র অনন্তের দৃষ্টি লাভ হবে যা দর্শনও অন্বেষণ করে কিন্তু পায় না। ক্ষমতাবিহীন দৃষ্টি (Vision) নৈতিক উন্নতি সাধন করতে পারে, কিন্তু স্থায়ী কৃষ্টি গঠন করতে পারে না। দৃষ্টিহীন ক্ষমতা ধ্বংসাত্মক ও অমানুষিক হয়ে পড়ে। মানবতার আধ্যাত্মিক সম্প্রসারণের জন্যে উভয়ের ঐক্য সাধন অতীব প্রয়োজনীয়। ইবাদতের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তখনই, যখন ইবাদত সংঘবদ্ধভাবে বা জামাতে করা হয়। যাবতীয় খাঁটি ইবাদতের মর্ম সামাজিক। এমনকি দরবেশ যে মানুষের সমাজ ছেড়ে নির্জনে চলে যান, তিনিও যান সেখানে একান্তভাবে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের জন্যে। জামাত মানুষের সম্মিলন, যেখানে সবাই একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একই বস্তুর ওপর মনোনিবেশ করে এবং অন্তরাত্মাকে উন্মোচিত করে একই প্রবণতার তাগিদে। এটা মনস্তত্ত্বসম্মত সত্য যে, সম্মিলনে সাধারণ মানুষের উপলব্ধি-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, আবেগ গভীরতর হয় এবং সঙ্কল্প এত অধিক মাত্রায় উজ্জীবিত হয়, যা তার একক নির্জন মুহূর্তের অগোচর। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার হিসেবে ইবাদতের রহস্য আজও উদ্ঘাটিত হয়নি, যেহেতু সম্মিলিত অবস্থায় মানুষের উপলব্ধি-শক্তি কিভাবে এত বৃদ্ধি পায় তার নিয়ম আজও মনোবিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারেনি। সম্মিলিত উপাসনা ইসলামের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। জামাতের মারফত ইসলাম তার আধ্যাত্মিক দীপনাকে ছাড়িয়ে দিতে চায়। দৈনিক জামাতের নামায থেকে মক্কার কেন্দ্রীয় মসজিদের চতুস্পার্শ্বে বাৎসরিক সম্মিলনীর কথা বিচার করলে আপনারা অতি সহজে বুঝতে পারবেন, কি করে ইসলাম ইবাদত-অনুষ্ঠান ক্রমে মানুষের মেলামেশায় সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে।

তা হলে ইবাদত ব্যক্তিগতই হোক আর জামাতগতই হোক, তা হচ্ছে বিশ্বের অভেদ্য নিস্তব্ধতার মধ্যে সাড়া পাওয়ার জন্য মানুষের অন্তরের গভীর আকুতি। উদ্ঘাটনের এ একটা অনুপম পদ্ধতি, যাতে সন্ধানশীল খুদী ঠিক আত্ম-বিস্মরণের মুহূর্তেই নিজেকে খুঁজে পায় এবং এইভাবে বিশ্বের জীবনধারায় একটি শক্তিমন্ত উপাদান হিসেবে নিজের মূল্য এবং সঙ্গতি আবিষ্কার করে। ইসলামী ইবাদত হচ্ছে একদিকে আত্মবিলোপ, অন্যদিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতীক। ইবাদতের এই রূপই ইবাদতের মধ্যে নিহিত মনোভঙ্গীর মনস্তাত্ত্বিক বিচারসম্মত রূপ। কিন্তু দেখা যায়, জাতির ইতিহাসে অন্তরের ক্রিয়ারূপে ইবাদত বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে; সে জন্যেই কুরআন বলে :

> সকল মানুষের কাছেই আমরা ইবাদতের পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছি এবং সেভাবেই তারা ইবাদত করে। কাজেই এই নিয়ে যেন তারা তোমার সঙ্গে কোন কলহের অবকাশ না পায়। তবে তোমার প্রভুর দিকে তাদের আহবান কর, কারণ তুমি নির্ভুল পথে আছ। কিন্তু যদি তারা তোমার সঙ্গে তর্ক করে, তবে বল, তোমরা কি কর- তা আল্লাহ্ সবচেয়ে ভাল জানেন। তোমাদের মধ্যে যে যে বিষয়ে মতভেদ আছে কিয়ামতের দিন তিনি তার বিচার করবেন।

ইবাদতের রূপ কি হবে তা নিয়ে বিতর্ক করা উচিত নয়। কোন্ দিকে মুখ করে নামায পড়বে, সেটা ইবাদতের আসল কথা নয়। কুরআন এই ব্যাপারে একেবারে সুস্পষ্ট।

> পূর্ব ও পশ্চিম উভয়ই আল্লাহর; কাজেই যে কোন দিকে তুমি মুখ ফিরাও না কেন, সে দিকেই আল্লাহ আছেন। (২ : ১১৫) পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোর মধ্যে কোন পুণ্য নেই; তবে সেই পুণ্যবান যে আল্লাহ, কিয়ামত, ফেরেশতা, কিতাব এবং পয়গাম্বরে বিশ্বাসী; যে আল্লাহর প্রেমের জন্য স্বজন, এতীম, অভাবী ও পথিককে নিজের সম্পদ হতে দান করে, আর দান করে প্রার্থীকে ও কৃতদাসের মুক্তির জন্যে; আর যে ইবাদত কায়েম করে, বিধিমত যাকাত দেয় এবং যে তাদেরই একজন- যারা কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং তা বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে বিপদকালে ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যশীল হয় এবং সেই সব লোক যারা ন্যায়পরায়ণ এবং সেই সব লোক যারা আল্লাহকে ভয় করে। (২ : ১৭৭)

তথাপি মনের গতি নিয়ন্ত্রণে দেহভঙ্গীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। ইসলামী ইবাদতে একটি বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করা হয়েছে এই জন্যে যে, এতে জামাতের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে। তাছাড়া এর সাধারণরূপ ইবাদতকারীদের মধ্যে একটা সামাজিক সাম্যবোধের উন্মেষও লালন করে; তাদের মধ্যে শ্রেণী ও বর্ণগত উচ্চমন্যতার উচ্ছেদ সাধন করাই তার লক্ষ্য। যদি দক্ষিণ ভারতের গর্বিত উচ্চমন্য ব্রাহ্মণ্যদের প্রত্যহ অস্পৃশ্যদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হতো, তা হলে অত্যল্পকালেই কী বিরাট এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব সংঘটিত হতো। যাবতীয় সসীম খুদীর স্রষ্টা ও রক্ষক সর্বাধার খুদীর একক স্বরূপ থেকেই প্রতীয়মান হয় সর্বমানবের অন্তর্নিহিত ঐক্য। কুরআনের মতে মানবতাকে বর্ণ, জাতি ও উপ-জাতিতে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের পরিচয় নির্দেশ করা। ইসলামে জামাতে নামায পড়ার যে ব্যবস্থা আছে, জ্ঞানগত মূল্য ছাড়াও তার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে, যেসব সংস্কারের দেয়াল মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে, তা ভূমিসাৎ করে তাদের জীবনে এই অন্তর্লীন ঐক্যের বাস্তব উপলব্ধি জাগানো।

চার

মানুষের খুদী : তার আযাদী ও অমরতা

কুরআন নিজস্ব সহজ অথচ বলিষ্ঠ ভাষায় মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অনন্যসাধারণতা ঘোষণা করেছে। আমার জ্ঞান-বুদ্ধিতে যতখানি বুঝতে পেরেছি, তাতে বলতে পারি যে, জীবনের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে মানুষের নিয়তি সম্বন্ধে কুরআনের অভিমত সুস্পষ্ট। এই অনন্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ বোঝা বহনে বাধ্য হয়েছে এবং এরই জন্যে নিজ নিজ প্রচেষ্টার অতিরিক্ত লাভ তার পক্ষে অবিধেয় বিবেচিত হয়েছে। এই একই কারণে কুরআন যীশুর প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা মানবের পাপ-মোচন সংক্রান্ত মতবাদ নাকচ করেছে। কুরআনে তিনটি বিষয় নিখুঁতভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১. মানুষই আল্লাহর মনোনীত :

> অতঃপর প্রভু তাকে (আদমকে) নিজের পক্ষ থেকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি কৃপান্বিত হলেন এবং তাকে পথ দেখালেন। (২০ : ১২২)

২. মানুষ তার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিদের জন্য সৃষ্ট :

> তোমার প্রভু যখন ফেরেশ্‌তাদের বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হয়েছি', তারা বলল- 'তুমি কি এমন একজনকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও যে অন্যায় ও রক্তপাত ঘটাবে, অথচ আমরা তোমার প্রশংসা-গান করি এবং তোমার মহিমা কীর্তন করি?' আল্লাহ বলেন- 'নিশ্চয়ই আমি তা জানি, যা তোমরা জান না।' (২ : ৩০)

> এবং তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন আর তোমাদের একজনকে অন্যের চেয়ে বিভিন্ন মানে যোগ্যতর করে গড়ে তুলেছেন, যাতে তাঁর দান সম্পদ তোমাদের মধ্যে প্রমাণিত হয়। (৬ : ১৬৫)

৩. মানুষ একটি মুক্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং তার বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও এ অধিকার গ্রহণ করেছে :

> নিশ্চয়ই আমরা আকাশ, পৃথিবীতে এবং পর্বতমালার কাছে এ গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করতে প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু তারা সে ভার বহন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল এবং শঙ্কা প্রকাশ করল। মানুষ সে দায়িত্ব গ্রহণ করল; কিন্তু সে অন্যায় ও অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। (৩৩ : ৭২)

তবু এ অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, মানব ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রীয় বস্তু যে 'মানুষের চেতনার একত্ব,' তা নিয়ে আজ পর্যন্ত মুসলিম চিন্তাধারার ইতিহাসে সত্যিকারভাবে আলোচনা

হয়নি। 'মুতাকাল্লিমীন' দল আত্মাকে একটি 'সূক্ষ্মতর বস্তু' বা নিতান্ত আকস্মিক জিনিস বলেই মনে করতেন। তাঁদের মত ছিল যে, দেহের সাথে সাথে এর মৃত্যু এবং পুনর্বিচার দিবসে এর পুনঃ সৃষ্টি হয়। মুসলিম দার্শনিকেরা প্রেরণা লাভ করেন গ্রীক দর্শন থেকে। অন্য মতবাদীদের বেলায় এ কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে তার গণ্ডির ভেতরে আসে নেস্টোরীয়, ইহুদী, যেরোস্ট্রিয় ইত্যাদি ধর্ম-সম্প্রদায়। এদের বুদ্ধিগত দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয়েছিল সেই সংস্কৃতি থেকে, যা মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় দীর্ঘকাল পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ছিল। এই সংস্কৃতি উদ্ভব ও বিকাশের বেলায় মোটামুটিভাবে আদিম পারসিক (Magi) ভাবাপন্ন : এর কল্পনায় আত্মার গড়ন দ্বৈতরূপী; এ কারণে ইসলামী ধর্মীয় চিন্তাধারায়ও এই দ্বৈতধর্মিতার প্রতিফলন স্পষ্ট। কুরআন অনুসারে জ্ঞানের তিনটি মূল সূত্র হল 'ইতিহাস', 'প্রকৃতি' এবং 'অনুভূতির অন্তর্নিহিত ঐক্য'। একমাত্র ধ্যানমূলক সূফীবাদই এই শেষোক্ত সূত্রের অর্থ বোঝাবার চেষ্টা করেছে। ইসলামের ধর্মীয় জীবনে এ অনুভূতির চরমতম প্রকাশ লাভ হয়েছিল প্রসিদ্ধ মনসুর হাল্লাজ-এর 'আনাল হক' (আমিই সৃষ্টিধর্মী সত্য) বাণীতে। তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তীরা এ বাণীকে খোদায়ী দাবী বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু আধুনিককালে ফরাসী প্রাচ্যবিদ মঁসিয়ে ম্যাসিনন এ সম্পর্কে সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য তথ্যাবলীর সংযোজনা করে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করেছেন যে, এই মহান সত্যসাধক শহীদের পক্ষে আল্লাহর বিশ্বাতীত অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হওয়া অসম্ভব ছিল। সমুদ্রে বারি-বিন্দু যেমন লীন হয়ে যায়, আল্লাহর মধ্যেও মানুষের সত্তা তেমনি নিশ্চিহ্নভাবে লীন হয়ে যায়- মনসুর হাল্লাজ এ কথা বলেন নি; কারণ তাঁর অভিজ্ঞতার অমন কোন ব্যাখ্যাই করা চলে না। তিনি বরং সাহসদৃপ্ত অমর ভাষায় এই দাবীই করে গেছেন যে, আল্লাহর বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে মানুষের খুদী অবিনশ্বরভাবে বেঁচে থাকে। এ বাণী যেন মুতাকাল্লিমীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই নামান্তর। ধর্ম-তত্ত্বের বর্তমানকালীয় পাঠকদের পক্ষে এ তথ্য যথার্থত হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়ে পড়েছে; কেননা, এ অনুভূতি প্রারম্ভে পুরোপুরি স্বাভাবিকভাবে দেখা দিয়ে থাকলেও গভীরতর বিকাশের সাথে সাথে এ চেতনার জ্ঞানানীত স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। বহুকাল আগেই ইব্‌ন খালদুন এসব স্তরের যথাযথ অনুসন্ধানের জন্যে কার্যকরী বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে গেছেন। আধুনিক মনস্তত্ত্ব সবেমাত্র এ বিষয়ে মনোযোগী হয়েছে; কিন্তু এখন পর্যন্ত চেতনার মরমী অভিব্যক্তির কিছুটা বৈশিষ্ট্যের অতিরিক্ত কিছু এর ধারণায় আসে নি। হাল্লাজ-এর প্রতীতির সীমারেখায় পৌঁছাবার মতো কোন বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার আমাদের হাতে না থাকায়, এ অনুভূতি থেকে জ্ঞানের প্রসার কতখানি লাভ হতে পারে, তা ধারণা করতেও আমরা অক্ষম। তাছাড়া, বস্তুত একটি মৃত দর্শনের পরিভাষায় বর্ণিত সেকালের ধর্মীয় পদ্ধতির ধারণাবলী বর্তমানকালের আলাদা আবহাওয়ায় গড়ে-ওঠা মনের ওপর তেমন গভীরভাবে রেখাপাত করতে পারে না, যাতে করে অধিকতর গবেষণার পথ সুপ্রশস্ত হবে। এসব বিবেচনায়, আধুনিক মুসলিম গবেষকের দায়িত্ব বিশালতর হয়ে পড়েছে। প্রথমত, অতীতের সাথে সব সম্পর্ক ত্যাগ না করেই তাকে সমগ্র ইসলামী

পদ্ধতির পুনর্বিবেচনা করতে হবে। সম্ভবত দিল্লীর শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ-ই সর্বপ্রথম নবপ্রেরণা-উদ্বুদ্ধ অন্তর নিয়ে এ-পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু যিনি এ কার্যের পূর্ণ গুরুত্ব ও বিশালত্ব হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, মুসলিম চিন্তা ও জীবন ইতিহাসের নিগূঢ় তাৎপর্যের প্রতি যাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি মানুষও তাঁর রীতি-নীতি সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতার ফলে গড়ে-ওঠা প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনসেতু রচনা করেছিল, তিনি হলেন জামাল উদ্দীন আফগানী। তাঁর ক্লান্তিহীন অথচ বহুধাবিভক্ত কর্মস্পৃহা যদি মানবীয় বিশ্বাস ও রীতি-নীতির কেন্দ্র হিসেবে ইসলামের প্রতি পুরোপু-রিভাবে প্রযুক্ত হতে পারত, তবে আজকের মুসলিম জগত চিন্তাক্ষেত্রে নিজেকে আরও অনেকখানি আত্মপ্রতিষ্ঠিত দেখতে পেত। এখন আমাদের সামনে একমাত্র যে পথ খোলা রয়েছে, তা হল আধুনিক জ্ঞানরাজির প্রতি সশ্রদ্ধ অথচ বিমুক্ত দৃষ্টিতে অবলোকন করে সেই জ্ঞানেরই আলোকে ইসলামী শিক্ষাকে নতুন করে অন্তর- গ্রহণের চেষ্টা করা। এতে পূর্ববর্তীদের সাথে আমাদের মতবিরোধ হলেও উপায় নেই। আজকের বক্তৃতায় মানবীয় খুদীকে অবলম্বন করে এই আলোচনার অবতারণাই আমার উদ্দেশ্য।

আধুনিক চিন্তাধারার ইতিহাসে ব্রাড্‌লীই উৎকৃষ্টতম তথ্যাবলীর সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের খুদী বা 'অহং'-কে অস্বীকার করা অসম্ভব। তাঁর 'এথিক্যাল স্টাডিজ' গ্রন্থে তিনি খুদীর বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে ধরে নিয়েছেন; তাঁর 'লজিক'-এ তিনি কাজের সুবিধার জন্যেই এর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। 'অ্যাপিয়ারেন্স এন্ড রিয়ালিটি' গ্রন্থেই তিনি অহং-এর বিশদ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে খুদীর তাৎপর্য ও বাস্তবতা সম্পর্কিত তার দু'টি অধ্যায়কে 'জীবাত্মা'র অবাস্তবতা সম্পর্কিত এক রকম আধুনিক উপনিষদ বলা চলে। তাঁর মতে, স্ববিরোধিতা থেকে মুক্তিই হলো বাস্তবতার প্রমাণ। কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করে তিনি দেখতে পান যে, অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধ কেন্দ্রস্থল হল পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয়, ঐক্য ও বৈচিত্র্য ইত্যাদি বিরোধধর্মী ব্যক্তিসমূহের সমাহার; অতএব 'অহং' একটি মায়া মাত্র। খুদী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যা-ই হোক না কেন, একে বিচার করবার একমাত্র অস্ত্র হল চিন্তার সূত্রাবলী; চিন্তার সূত্র আবার একটি সম্পর্কমূলক বৃত্তি এবং 'সম্পর্ক' ব্যাপারটিই অসামঞ্জস্যপূর্ণ। দুর্ধর্ষ তর্কবাণে অহং-সম্পর্কিত ধারণাকে জর্জরিত করেও ব্রাড্‌লী শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছেন যে, খুদী অবশ্যই 'এক অর্থে' 'বাস্তব', এক অর্থে 'নিঃসংশয় সত্য'। আমরা সহজেই স্বীকার করতে পারি যে, খুদীর অসীমতার কথা ভাবলে তাকে জীবনের ঐক্য হিসেবে অপূর্ণই বলতে হবে। আসলে খুদীর প্রকৃতিই হল আরো ব্যাপক, আরো কার্যকরী, আরো সুসামঞ্জস্য এবং এক অনুপম ঐক্যের লক্ষ্যের পানে অভিসার। এই আকাঙ্ক্ষিত ঐক্যে পৌঁছাতে একে কত রকম বিভিন্ন পরিবেশ পার হয়ে যেতে হবে তা কে জানে? বর্তমানে এর বিকাশ যে স্তরে পৌঁছেছে, তাতে নিজেকে নিদ্রার ক্রোড়ে ঘন ঘন এলিয়ে দেওয়া ছাড়া এ তার গাঢ়তা রক্ষা করতে পারে না। কখনো কখনো সামান্য উত্তেজনাতেই এর ঐক্য ব্যাহত হতে পারে এবং এ তার নিয়ন্ত্রণশক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। তবুও

তর্কচ্ছলে একে যত কায়দায় খণ্ডন বা বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, খুদীর অনুভূতি মানব অন্তরের চরমতম স্তরে সংরক্ষিত, আর তার প্রাণবন্ত অস্তিত্বকে অধ্যাপক ব্রাড্‌লী অনিচ্ছাসত্ত্বে হলেও স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন।

কাজেই, অনুভূতির সীমিত কেন্দ্রস্থল বাস্তব সত্য; হতে পারে এর সত্যতা এত গভীর যে, চিন্তাসূত্রে তাকে আবেষ্টন করা সম্ভব নয়। তবে খুদীর বিশিষ্ট স্বরূপ কি? বলা যায় যে, মনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যে ঐক্য আছে, তাতেই অহং-এর প্রকাশ। মানসিক অবস্থাবলী পরস্পর সম্পর্কহীন হতে পারে না; এগুলোর একটি আসে অপরটি থেকে এবং এরা একে-অপরকে জড়িয়ে থাকে। এদের অবস্থিত মনরূপ একটি জটিল সমগ্রের মধ্যে। অবশ্য এই পরস্পর-সম্পর্কিত অবস্থাবলীর, অন্য কথায়-ঘটনাবলীর জীবন্ত একত্বকে একটি বিশেষ ধরনের একত্ব বলাই ঠিক। বস্তুজগতের কোন দ্রব্যের একত্বের সাথে এ একত্বের প্রভেদ মৌলিক; কেননা, কোন দ্রব্যের অংশবিশেষ অন্য অংশ থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারে। মানসিক একত্ব একান্তভাবে আত্মবৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। আমরা বলতে পারি না যে, আমাদের কোন একটি বিশ্বাস অন্য একটি বিশ্বাসের দক্ষিণে বা বামে অবস্থিত। এ কথাও বলা চলে না যে, তাজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমার উপলব্ধি আগ্রা থেকে আমার দূরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে। স্থান সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্থানের অবস্থিতির সাথে সম্পর্কিত নয়। প্রকৃতপক্ষে খুদী একাধিক রকম স্থানের ধারণা করতে পারে। জাগ্রত চেতনায় আমরা যে স্থিতিকে চিনি, তার সাথে স্বপ্ন-স্থিতির কোন সম্পর্ক নেই। এগুলি একে-অন্যকে বাধা দেয় না, কিংবা একে-অন্যের সীমায় গিয়ে হামলা করে না। দেহের জন্যে মাত্র একটি অবস্থিতি থাকতে পারে। অতএব দেহ যে রকম অবস্থিতির দ্বারা সীমাবদ্ধ, সে রকমভাবে বা সে অর্থে খুদী অবস্থিতির দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। আমার দৈহিক ও মানসিক ঘটনাবলী যেমন কোন না কোন বিশেষ সময়কে অবলম্বন করে ঘটে থাকে, খুদীর বেলায় তা নয়। খুদীর সময় পরিমাপ পদার্থ জগতের সময় পরিমাপের থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। পদার্থজাগতিক ঘটনার স্থিতিকাল অবস্থানে প্রতিফলিত হয়ে বর্তমানরূপে দেখা দেয়; সে ঘটনাকে আমরা বর্তমানকালের ঘটনা বলি। খুদীর স্থিতিকাল তার নিজের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত এবং তার বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে নিজ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সম্পর্কিত। পদার্থ জগতে যখন কোন ঘটনা ঘটে তখন তা বর্তমানের কোন না কোন চিহ্ন ধারণ করে; এ থেকেই বোঝা যায় যে, ঘটনাটি একটি সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু এসব চিহ্ন ঘটনাটির সময়কালের নির্দেশনাত্মক প্রকাশ মাত্র, খোদ সময়কাল নয়। সত্যিকারের সময়কালের মালিক একমাত্র খুদী।

খুদীর ঐক্যের আর একটি বিশিষ্ট গুণ হল এর ঐকান্তিক নিজস্বতা। এ জন্যে প্রতিটি খুদীই তার আলাদা বিশিষ্ট রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে তার সব কয়টি সূত্রকে একই অন্তর দিয়ে যাচাই করতে হয়। যদি এক মন বিশ্বাস করে যে, 'সব মানুষ মরণশীল' এবং অন্য মন ভাবে যে, 'সক্রেটিস একজন

মানুষ',–এভাবে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। সিদ্ধান্ত তখনই সম্ভব হয়, যখনই এই দু'টি কথা একই মন দিয়ে গ্রহণ করা যায়। আবার, কোন বস্তুর জন্যে আমার আকাঙ্ক্ষা একান্তভাবে আমার। এ আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমার নিজেরই ব্যক্তিগত তৃপ্তি। সমগ্র মানবজাতি যদি একই বস্তু আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের সকলের আশা পূরণ হলেও আমার পরিতৃপ্তি হবে না– যে পর্যন্ত না আমার কাম্যবস্তু আমার নিজের ভোগে আসে। আমার দাঁতের ব্যথার জন্য দন্ত চিকিৎসক সহানুভূতিশীল হতে পারেন, কিন্তু তিনি সে ব্যথার অংশীদার হতে পারেন না। আমার আনন্দ-বেদনা-আকাঙ্ক্ষা একান্তভাবে আমার একার-আমার ব্যক্তিগত অহং-এরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমার চিন্তা-ভাবনা, আমার ঘৃণা-বিদ্বেষ বা প্রেম-প্রীতি, আমার বিচার-বুদ্ধি বা সংকল্প অন্য নিরপেক্ষভাবেই আমার। আমার সামনে যতক্ষণ একাধিক পথ খোলা রয়েছে ততক্ষণ স্বয়ং আল্লাহ্ আমার হয়ে চিন্তা, বিচার বা নির্বাচন করতে পারেন না। একই কারণে আপনাকে দেখে আমি তখনই চিনতে পারি, যখন আপনার সাথে আমার পূর্বেকার পরিচয় থাকে। কোন স্থান বা পাত্রকে আমার চেনার মানে হল, আমার বিগত অভিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টিনিপেক্ষ; অন্য কোন অহং-এর অভিজ্ঞতায় এ ছায়াপাত করে না। এই বিশিষ্ট পারস্পরিক অবস্থার সম্পর্কমূলক আধারকেই আমরা 'আমি' বলে অভিহিত করি। এখানেই আমরা সম্মুখীন হচ্ছি মনস্তত্ত্বের একটি বিশাল সমস্যার সাথে : এই 'আমি'র প্রকৃতি কি?

গাযালী-অনুসারী মুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতে, খুদী হল একটি সরল অবিভাজ্য এবং নির্বিকার আত্মা-বস্তু এ আমাদের মানসিক অবস্থাবলী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং কালপ্রবাহের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমাদের জ্ঞানগোচর অনুভূতি যে একটি ঐক্য তার কারণ হল এই যে, ঐ সরল বস্তুটির সাথে আমাদের মানসিক অবস্থাবলী তার বিভিন্ন গুণাবলীরূপে সংযোজিত; অন্য কথায়, এসব গুণাবলীর প্রবহমান বর্ণচ্ছটার অন্তরালেই অপরিবর্তেয় খুদী নিজ চিরন্তন রূপে বিরাজিত রয়েছে। আমার দ্বারা আপনাকে চিনতে পারা মাত্র তখনই সম্ভব হতে পারে– যখন আপনার সাথে আমার পূর্বেকার পরিচয় ও আজকের পূর্বস্মৃতির পুনরাবির্ভাবের মধ্যে আমি অপরিবর্তিত থেকে যেয়ে থাক। অবশ্য এ-সম্প্রদায়ের মনোগতি ছিল বিশেষভাবে প্রজ্ঞানমুখী, মনস্তত্ত্বের প্রতি এঁরা এক রকম উদাসীনই ছিলেন। যা হোক, আত্মা-সত্তাকে আমরা চেতনাগ্রাহ্য ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা-স্বরূপই নিই, বা অমরত্বের উৎস হিসেবেই নিই, এতে মনস্তাত্ত্বিক বা প্রজ্ঞাসম্পর্কিত কোন সমস্যারই সমাধান হয় বলে আমি মনে করি না। আধুনিক দর্শন-জিজ্ঞাসুর কাছে কান্ট-এর নিরেট যুক্তিবাদ-সংক্রান্ত অপসিদ্ধান্তগুলি সুপরিচিত। তাঁর মতে, সব চিন্তাধারার সাথে যে 'আমি ভাবি' ভাব বিজড়িত রয়েছে, তা চিন্তার একটি নিছক বাইরের শর্ত মাত্র; এবং এ রকম একটি বাহ্যিক আচরণমূলক সূত্র থেকে তত্ত্বদর্শনের কোন গুরুতর সিদ্ধান্তে পৌঁছা তর্ক-বিচারে অবিধেয়। তা ছাড়া অনুভূতি বিষয়ে কান্ট-এর দৃষ্টিভঙ্গির কথা ছেড়ে দিলেও, একটা কিছু অখণ্ডনীয় হল বলেই যে সেটি অবিনশ্বর হতে হবে, তার কোন কথা নেই। কান্ট নিজেই বলেছেন যে, কোন অখণ্ডনীয় বস্তু, যেমন

কোন প্রকৃষ্ট গুণ নিজের অখণ্ডতা বজায় রেখেও ধীরে ধীরে লয়প্রাপ্ত হতে পারে; অথবা, এমনকি, অকস্মাৎ শূন্যে বিলীন হয়ে যেতেও পারে। বস্তুর এই স্থিতিশীলতার ধারণা থেকে কোন মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না। প্রথমত, একটি দেহবস্তুর ওজনকে যে-অর্থে তার একটি গুণ বলে ধরে নেওয়া হয়, সে অর্থে আমাদের চেতনামূলক অনুভূতির খণ্ডপ্রকাশসমূহকে আত্মা বস্তুর গুণ বলে ধারণা করা কঠিন। পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা যায় যে, অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি কোন কোন বিশেষ সম্পর্ক জ্ঞাপন কার্যাবলী থেকেই রূপ নেয়। অতএব এই কার্যাবলীর নিজ নিজ বিশিষ্ট সত্তা রয়েছে। লেয়ার্ড-এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, এদের সম্যক পরিচয় পুরাতন জগতে নতুন আগন্তুক হিসেবে নয়, এরা নবতর জগত সৃষ্টি করে নেয়।' দ্বিতীয়ত, অভিজ্ঞতাকে গুণ বলে স্বীকার করে নিলেও তাকে আত্মা বস্তুতে অন্তর্নিহিত গুণ হিসেবে উপলব্ধি করা যায় না। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, খুদীকে আত্মা বস্তু হিসেবে বুঝবার বেলায় আমাদের চেতনাজাত অনুভূতি থেকে কোন হদিসই পাওয়া যায় না; কেননা, আমাদের প্রারম্ভিক সূত্রই হল যে, আত্মা বস্তু প্রত্যক্ষ অনুভূতির অতীত। এও উল্লেখযোগ্য যে, একই দেহে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আত্মার বস্তুর অধিষ্ঠান সম্ভভ নয়; কাজেই, এ প্রস্তাব থেকে আমরা এমন কোন তথ্য পাই না যা মানুষের ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দিতে পারে। অবশ্য পূর্বকালে এ সবকে মনে করা হত দেহের ওপর প্রেত-যোনীর অস্থায়ী প্রভাবের ফল হিসেবে।

তবুও খুদীকে বুঝতে পারা যদি সম্ভব হয়, তবে তা একমাত্র চেতনাজাত অনুভূতির প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেই হতে পারে। অতএব আধুনিক মনস্তত্ত্ব খুদী সম্পর্কে কি আলোকপাত করে, এখন তা-ই বিবেচনা করা যাক। উইলিয়ম জেম্‌স-এর মতে চেতনা 'একটি চিন্তাপ্রবাহ'–ঐক্যবোধ সূত্রে আবদ্ধ ঘটনাধারা। তাঁর ধারণায়, আমাদের অনুভূতিসমূহ যেন কতকগুলি এক পালের বস্তু-বিশেষ; তাদের গায়ে লাগানো আংটাগুলি মানসিক জীবনের স্রোতে একটির সাথে অপরটি জুড়ে জুড়ে চলেছে। খুদী হল ব্যক্তিগত জীবনের উপলব্ধির সমাহার, তথা চিন্তাধারার অংশবিশেষ। চিন্তার প্রতিটি স্পন্দন হল এক-একটি অবিভাজ্য ঐক্য–যার বুঝবার এবং স্মরণ করবার ক্ষমতা রয়েছে। চিন্তাধারার এই বিগত তরঙ্গের সাথে বর্তমানের এবং বর্তমান তরঙ্গের সাথে ভবিষ্যতের সহযোগই খুদীরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। আমাদের মনোজীবনের এই বর্ণনা একটি অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ উদ্ভাবন, বিশেষ। কিন্তু আমার খুব জোরের সঙ্গে এ কথাই মনে হয় যে, আমাদের নিজেদের মধ্যে চেতনার যে পরিচয় আমরা অনবরত পাচ্ছি, এ বর্ণনা তার সাথে যথাযথ রূপে মেলে না। চেতনা একটি একক অস্তিত্ব, সমগ্র মনোজগত নিয়ে এর প্রকাশ; একে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলাদা চিৎ-তরঙ্গাবলীর পারস্পরিক সংযোগ বলে মনে করা চলে না। জেম্‌স-এর ধারণা থেকে খুদী সম্পর্কে কোন তথ্য উদ্ঘাটন দূরে থাকুক, বরং তা থেকে অনুভূতির মধ্যে চিরন্তনতার অস্তিত্বকেই একেবারে অস্বীকার করতে হয়। পরম্পরাগত চিন্তাসমূহ থেকে একটি অখণ্ড ধারাবাহিকতা কল্পনা করা যায় না। এদের একটি যখন থাকে হাজির, অন্যটি তখন একেবারে অতীতের মধ্যে হারিয়ে যায়। অতীত

চিন্তাকে যদি বিলীয়মান বলেই ধরে নেয়া হয়, তবে তা হারিয়েই যাবে; বর্তমান চিন্তার সাথে তাকে যুক্ত করা যেতে পারে কিরূপে? আমার বক্তব্য নয় যে, খুদী আমাদের অভিজ্ঞতার নাগালের বাইরের জিনিস। অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতাই সক্রিয় খুদীর নামান্তর। উপলব্ধি, বিচার ও আকাঙ্খার প্রকাশে আমরা খুদীরই কার্যকারিতা দেখতে পাই। সে প্রাণশক্তি আহরণ করে চলেছে পারিপার্শ্বিকতার সাথে নিজের আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণের তীব্রতা থেকে। অতএব এই পরস্পর আক্রমণের ক্ষেত্র থেকে খুদী বাইরে দাঁড়িয়ে নেই; এর মধ্যেই সে পরিচালনাকারী শক্তিরূপে বিরাজিত। এখানেই সে নিজ অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে পূর্ণাবয়বে গড়ে তুলছে এবং নিজের পথনির্দেশ করছে। খুদীর এই নির্দেশাত্মক সত্তা সম্বন্ধে কুরআনের স্পষ্ট উক্তি নিম্নরূপ :

> আর তোমাকে আত্মার কথা জিজ্ঞেস করছে। বল : আত্মা আমার প্রভুর 'আম্‌র' (আদেশ থেকে উদ্ভূত। কিন্তু জ্ঞানের মাত্র সামান্য অংশই তোমাদের দেওয়া হয়েছে। (১৭ : ৮৫)

'আম্‌র'-শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝতে হলে কুরআন বর্ণিত 'আম্‌র' ও 'খাল্‌ক-এর পার্থক্য আমাদের মনে রাখা দরকার। প্রিঙ্গল প্যাটিসন সখেদে বলেছেন যে, ভূমার সাথে একদিকে পরিব্যাপ্ত বিশ্বের এবং অন্যদিকে মানুষের খূদীর সম্বন্ধ ব্যাখ্যানে ইংরেজী ভাষায় 'Creation' (সৃষ্টি) ব্যতীত অন্য কোন শব্দ নেই। এ ব্যাপারে আরবী ভাষা অধিকতর সৌভাগ্যবান। আল্লাহর সৃষ্টিধর্মী কার্যাবলী যে দু'টি আলাদা পন্থায় আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে, বর্ণনায় আরবীতে দু'টি ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে-একটি 'খাল্‌ক' অন্যটি 'আমর'। 'খাল্‌ক্' হল সৃষ্টি (Creation) আর আম্‌র' হল নির্দেশ (direction)| কুরআন বলছে : 'সৃষ্টি এবং নির্দেশের তিনিই নিয়ন্তা'। উদ্ধৃত বাক্যের অর্থ এই যে, আত্মার মৌলিক প্রকৃতি নির্দেশাত্মক; কেননা আত্মা আসছে আল্লাহর নির্দেশমূলক স্পৃহা থেকে। অবশ্য ঐশী 'আম্‌র' খুদীরূপে কিভাবে কাজ করে তা আমাদের জানা নেই। খুদীর প্রকৃতি ও আচরণ সম্পর্কে আরও কিছু আলোকসম্পাত হয় 'রাব্বী' (আমার প্রভু) কথাটিতে যেভাবে 'আমার' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার থেকে। এর অর্থ হল আত্মার একত্বের সীমা, সামঞ্জস্য বা কার্যকারিতার সহস্র বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাকে যে একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট কিছু বলে মেনে নিতে হবে তার প্রতি ইঙ্গিত। কুরআনে আছে, 'প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ রীতি অনুযায়ী আচরণ করে; কিন্তু তোমাদের প্রভুই উত্তমরূপে জানেন কে শ্রেষ্ঠতম পন্থা অনুসরণ করছে।' (১৭ : ৮৪) অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, আমার ব্যক্তিত্ব আসলে একটি বস্তু নয়, বরং তা একটি কার্য। পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং একই উদ্দেশ্যে চালিত কতকগুলো কাজই আমাদের অভিজ্ঞতা। এই নির্দেশাত্মক সত্তার মধ্যেই আমার প্রকৃত 'আমি' নিহিত। আপনি যদি আমাকে দেখতে চান, তবে শুধু স্থানে অবস্থিত একটি বস্তু বা কালপ্রবাহে কতকগুলো অনুভূতির সমাহাররূপে আমাকে দেখলেই হবে না; আমার প্রকৃষ্ট পরিচয় রয়েছে আমার বিচার-বুদ্ধি, আমার আকাঙ্ক্ষাপ্রবণতা, লক্ষ্য ও আদর্শাবলীর বিচারে। এসবকে যথাযথরূপে হৃদয়ঙ্গম করে, এসবের যথার্থ মর্যাদা দিয়ে এবং এসবের প্রকৃত ব্যাখ্যা থেকেই প্রকৃত আমাকে আবিষ্কার করতে হবে।

এর পরেকার প্রশ্ন হল, স্থান কাল সংস্থায় খুদীর অভিব্যক্তি কিরূপ? এ সম্পর্কে কুরআনের প্রতিটি শিক্ষা অতি পরিষ্কার :

> আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সূক্ষ্ম কর্দম দিয়ে; সে অবস্থায় একটি আর্দ্র জীবাণূরূপে আমরা তাকে সংরক্ষিত করেছি; সেই আর্দ্র জীবাণুকে আমরা এক বিন্দু রক্তে পরিণত করেছি; সেই রক্তবিন্দুকে এক টুকরা মাংসে, এবং সেই মাংস টুকরাকে হাড়ে পরিবর্তিত করেছি, তারপর সেই হাড়গুলোকে মাংস দিয়ে আবৃত করেছি; তারপর মানুষকে আরও একটি অন্যরূপ গড়নে গড়ে তুলেছি। সুতরাং আল্লাহ মঙ্গলময়, আর সকল স্রষ্টার মধ্যে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট। (২৩ : ১২-১৪)

মানুষের এই 'অন্যরূপ গড়ন' শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অবলম্বন করেই বিকাশ লাভ করে; এই দেহই হল ক্ষুদ্রতর অহংসমূহের অধিবাস ভূমি; এবং এই ক্ষুদ্রতর অহংসমষ্টির মাধ্যমেই মহত্তর খুদী ব্যক্তি জীবনের ওপর সম্পূর্ণ ক্রিয়া করে যাচ্ছে। এর থেকেই অভিজ্ঞতার একটি সুসামঞ্জস্য একত্ব গড়ে তোলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এখন আমরা দেকার্তের ভাষায় জিজ্ঞেস করতে পারি-আত্মা এবং আত্মার অঙ্গ দু'টি কি আলাদা জিনিস? কেবল কোন রকম রহস্যজনকভাবে কি এরা একত্রিত হয়েছে? ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা এই যে, বস্তুর অন্য-নিরপেক্ষ অস্তিত্ববাদের মূলে কোন সত্য নেই। এ মতবাদ সমর্থনের একমাত্র হেতু রয়েছে এই রকম অনুভূতিতে যে, 'আমি'-র বাইরের আরও কিছু আছে। এই 'আমি'র বাইরের বস্তুর কতকগুলো গুণ আছে বলে মনে করা হয়, যা প্রাথমিক বলে অভিহিত এবং যার সাথে আমার অনুভূতির মিল আছে। এ সব গুণাগুণের ওপর আমাদের আস্থা স্থাপনের ভিত্তি হল এই যে, কারণ ও কার্যের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছুটা সাদৃশ্য থাকা চাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কারণ ও তার ক্রিয়ার মধ্যে সাদৃশ্য না থাকতেও পারে। উদাহরণত, যদি আমার জীবনের কৃতকার্যতা অন্যের জীবনে বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এতে আমার কৃতকার্যতা ও তার বিপর্যয়ের মধ্যে সাদৃশ্য রইল কোথায়? তবুও আমাদের প্রতিদিনকার অনুভূতি এবং পদার্থ বিজ্ঞান- এ দুই-ই বস্তুর অন্যনিরপেক্ষ অস্তিত্ব-স্বীকার করে চলেছে। অতএব উপস্থিত তর্কের খাতিরে আমরা এ মতবাদ প্রথমত স্বীকার করে নিতে পারি যে, দেহ এবং আত্মা কোন রহস্যজনকভাবে একত্রিত দুইটি পরস্পর-নিরপেক্ষ বস্তু। দেকার্তে-ই এ-প্রস্তাবের প্রথম উদ্ভাবক। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ-প্রসঙ্গে তাঁর বর্ণনা ও শেষ সিদ্ধান্ত প্রাথমিক খৃস্টধর্মের ম্যানিকীয় ঐতিহ্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। যা হোক, লাইব্‌নিয্ মনে করতেন যে, এরা পরস্পর-নিরপেক্ষ এবং পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তারে অক্ষম হয়ে থাকলেও, এদের মধ্যে আগে থেকেই কোন মিল আছে এবং সে-জন্যে তাদের পরিবর্তন ঠিক সমান্তরাল পথে চলে। এ মতবাদ অনুসারে আত্মা শারীরিক ঘটনাবলীর একটি নিরুদ্যম দর্শকমাত্রে পরিণত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, আমরা যদি মনে করি যে, দেহ ও আত্মা পরস্পরের ওপর প্রভাবশীল, তা হলেও আমরা এমন কোন প্রকাশ্য ঘটনা পাই না যার দ্বারা কিভাবে এবং কোথায় এ দু'য়ের সংযোগ ঘটিত হচ্ছে বা কার্যকালে এদের মধ্যে কে অগ্রণী, তা বুঝতে পারা যায়।

দেহের ওপর আত্মা ক্রিয়া করে, আবার আত্মার ওপর দেহ ক্রিয়া করে-এ মতবাদ স্বীকার করে নিলে বলতে হয়, আত্মা দেহের একটা যন্ত্র; দেহ তাকে নিজ কাজে খাটিয়ে নেয় এ যেমন সত্য, আবার এও তেমনি সত্য যে, দেহ আত্মার একটা যন্ত্রবিশেষ। ল্যাঞ্জ তাঁর হৃদয়াবেগ (emotion) সংক্রান্ত মতবাদ দ্বারা এই দেখতে চান যে, দেহ ও আত্মার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেহই প্রথম শুরু করে। আবার এ মতবাদের বিরুদ্ধেও নানা তথ্য রয়েছে। এখানে অবশ্য সে সব ব্যাখ্যানের অবতারণা সম্ভব নয়। উপস্থিত এ-কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, এ-ক্ষেত্রে দেহ অগ্রণী হয়ে থাকলেও হৃদয়াবেগের বিকাশের বিশেষ স্তরে আত্মা ইচ্ছা করেই গিয়ে হাজির হয়। মনের ওপর অনবরত ক্রিয়াশীল অন্যান্য বাহ্যিক উদ্দীপনাবলী সম্পর্কেও এ কথা সমানভাবে সত্য । কোন হৃদয়াবেগ আরও প্রসার লাভ করবে না কোন উদ্দীপনাই ক্রিয়া করে চলবে, তা নির্ভর করে আমি কোন্ দিকে কতখানি মন দিই- তার ওপর। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আবেগ বা উত্তেজনার পথ নিয়ন্ত্রিত হয় মন দ্বারা। অতএব সমান্তরালবাদ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ দুই-ই অসন্তোষজনক। তবুও মন এবং দেহ কাজের সময় এক হয়ে যায়। টেবিলের ওপর থেকে আমার একটি বই তুলে নেওয়া একটিমাত্র ও অবিভাজ্য কাজ। এ কাজে দেহেরও মনের অংশের মধ্যে বিভেদ রেখা টেনে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। যে কোন প্রকারেই হোক, দেহ ও মন এখানে একই শৃঙ্খলায় আবদ্ধ; আর কুরআনের সিদ্ধান্তও তাই। “খালক’ (সৃষ্টি) এবং ‘আমর’ (নির্দেশ)-এর তিনিই নিয়ন্তা।” এ ব্যাপারটি কিভাবে ধারণায় আসে? আমরা দেখছি যে, দেহ সম্পূর্ণ শূন্যে অবাস্থত কোন বস্তু নয়; দেহ শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনা বা জাজ। যে শৃঙ্খলাবদ্ধ অভিজ্ঞতাকে আমরা আত্মা বা খুদী বলি, তাও শৃঙ্খলাবদ্ধ কাজ। এতে আত্মা ও দেহের পার্থক্য লোপ পাচ্ছে না, কেবল তাদের সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। খুদীর বৈশিষ্ট্য হল স্বতঃফূর্তি; যে ঘটনাবলী দেহকে গড়ে তুলছে, সেগুলো বার বার করে ঘটছে। দেহ হল আত্মার একত্রীকৃত কর্ম বা অভ্যাস। অতএব দেহ আত্মা থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। অন্য কথায়, দেহ হল চেতনার একটি শাশ্বত উপাদান; এবং শাশ্বত বলেই বাইরের দিক থেকে একে স্থায়ী কোন বস্তু বলে মনে হয়। তাহলে বস্তু কি? বস্তু হল কতকগুলো নিকৃষ্টতর খুদীর সমাবেশ। এদের পরস্পর সংযোগ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্রমে একটি অঙ্গাঙ্গী ভাব গড়ে ওঠে এবং তার ফলে এক মহত্তর খুদী বিকাশ লাভ করে। জগৎ যখন আত্ম-নিয়ন্ত্রণের স্তরে উপনীত হয়, তখন সে-জগতে হয় তো চরম সত্য তার গোপন তত্ত্বের দ্বার খুলে দেয় এবং তার ফলে পরম সত্যের আসল প্রকৃতি কি তাও কিছুটা টের পাওয়া যায়। নিকৃষ্ট থেকে বিকাশ লাভ করেছে বলে উৎকৃষ্টের মূল্য বা মর্যাদা যেহ্রাস পায়, তা নয়। কোন্ কুলে কার জন্ম তা বড় কথা নয়; তার জীবনের প্রকৃত মর্যাদা নির্ধারিত হবে তার সামর্থ্য, তার গুরুত্ব, তার কর্মসাধনক্ষমতার দ্বারা। এমন কি, আর্থিক জীবনের মূল ভিত্তিরূপে দেহকে পুরোপুরিভাবে মেনে নেয়া হলেও, তা থেকে প্রমাণ হয় না যে, আত্মাকে তার জন্ম ও বিকাশের শর্তাবলীর দ্বারা আবদ্ধ করে রাখা চলে। অভাবিত-পূর্ব বিবর্তনবাদের সমর্থকেরা বলেন যে, ঘটনা একটি আকস্মিক ও অভিনব ব্যাপার, যা পূর্ব থেকে কল্পনায় আসে না । এ

নিজ অস্তিত্বের সীমার মধ্যেই সংঘটিত হয় বটে, কিন্তু যান্ত্রিক তথ্যের সাহায্যে এর ব্যাখ্যাদান সম্ভব নয়। বস্তুত জীবনের বিবর্তন থেকে এটা স্পষ্ট দেখা যায় যে, প্রথম দিকে দৈহিক শক্তি মানসিক শক্তির ওপর অধিকতর প্রভাবশালী থাকে, কিন্তু মন ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে দেহের ওপর নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। মন শেষ পর্যন্ত পূর্ণ আত্মা নির্ভরতা অর্জন করতেও সক্ষম হতে পারে। জীবন ও মনকে ক্রমে বিকশিত করার মত মৌলিক ক্ষমতা মোটেই নেই, বাইরে থেকে আল্লাহ্ তার মধ্যে চেতনা ও মনন-শক্তি ঢুকিয়ে না দিলে-এমন কোন বস্তু পদার্থ জগতে নেই। যে পরম খুদী ঘটনার অভিব্যক্তি ঘটান, তিনি বিশ্ব প্রকৃতিতেই অন্তর্নিহিত। তাঁরই কথা কুরআন বলেছে যে, তিনি "আদি এবং অন্ত, দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য।"

বস্তুর এই ধারণা থেকে একটি বড় প্রশ্ন ওঠে। আমরা দেখেছি যে, খুদী একটি বিকাশ-অক্ষম পদার্থ নয়। খুদী কালের পরিবেশে গড়ে ওঠে এবং নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এও স্পষ্টত স্বীকার্য যে, কারণ-প্রবাহ এ-থেকে প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি থেকে এতে প্রবাহিত হচ্ছে। তা হলে খুদী কি নিজেই নিজের কার্যাবলী নির্ধারণ করে? তা যদি হয়, তবে স্থান-কালের বিধানের সঙ্গে খুদীর আত্মনিয়ন্ত্রণ-শক্তির সম্বন্ধ কি? ব্যক্তি যে কারণের নিয়মে কাজ করে, সে কি তার নিজস্ব কারণ, না বিশ্ব প্রকৃতির কারণ ছদ্মবেশে তার নিজস্ব কারণ বলে তাকে পরিচালনা করে? দাবী করা হয় যে, এই দু'ধরনের কারণ পরস্পরবিরোধী নয়। আরও বলা হয়, মানবীয় কার্যাবলীতেও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার প্রয়োগ সমানভাবেই খাটে। বলা হয়, মনের ময়দানে বাইরের নানা শক্তি অহরহ দ্বন্দ্বে মেতে আছে, এই শক্তির সংঘাত হতে পয়দা হয় মানুষের চিন্তা। এইসব শক্তির মধ্যে যেটি সবচেয়ে শক্তিশালী, চিন্তার গতি নির্ধারিত হয় তারই দ্বারা। আমার সুদৃঢ় অভিমত এই যে, 'যান্ত্রিকতা' ও 'স্বাধীনতা'-র অনুসারীদের মধ্যে এই বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে আসলে আধুনিক মনস্তত্ত্বের বুদ্ধি-আশ্রয়ী কর্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝির ফলে। মনস্তত্ত্ব নিজেই একটি অন্য-নিরপেক্ষ বিজ্ঞান; তার নিজের আলাদা কর্মক্ষেত্র ও দেখবার আলাদা বিষয়বস্তু রয়েছে। কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ত্বতার নিজের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে ভুলে গিয়ে দাসের মত পদার্থ বিজ্ঞানের অনুকরণ করছে; আর এই-ই হল উপরোক্ত ভুল-বোঝাবুঝির আসল হদিস। এ অবস্থায় এ-ধরনের ভ্রম-প্রমাদ অবধারিত। খুদীর কর্মতৎপরতাকে যদি চিন্তা ও ধারণার কর্মধারা মাত্র বলে মনে করা হয় তবে তার দ্বারা বর্তমান বিজ্ঞানের মূল-সূত্র যে আণবীয় বস্তুবাদ, তারই সমর্থন করা হয়। এ মতবাদ চেতনার যান্ত্রিক ব্যাখ্যাকে সমর্থন না করে পারে না। অবশ্য এ-ভেবে কিছু সান্ত্বনাও পাওয়া যায় যে, 'কনফিগারেশান্ সাইকোলজি' বলে আখ্যাত মনস্তত্ত্বের নবতর দৃষ্টিভঙ্গি একে একটি আত্মনির্ভর বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হতে পারে; এবং সেই একই পন্থায় অভাবিত বিবর্তনবাদের আলোকে জীববিজ্ঞানও আত্মনির্ভরতা অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা যায়। এই নব্যপন্থী জার্মান মনস্তাত্ত্বিক গবেষকদের মতে, বুদ্ধিমূলক আচরণের প্রকৃতি উত্তমরূপে অনুধাবন করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, এতে

অনুভূতি-পরম্পরা ব্যতীত অন্তর্দৃষ্টিরও অস্তিত্ব রয়েছে। এই অন্তর্দৃষ্টি দেশ-কাল ও কার্যকারণ সম্বন্ধে অহমের ধারণা। ...অহংকে একটি জটিল পরিবেশের মধ্যে বাস করতে হয়; সেই পরিবেশের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন না করলে খুদী সেখানে থাকতে পারে না; কারণ তার পরিবেশ কখন, কেমন ব্যবহার করবে, সে সম্বন্ধে তার সম্ভবমত নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। ...

খুদীর কার্যকলাপের মধ্যে এই যে পরিচালনা ও নির্দেশ দানের ভাব, এর থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, এ একটি স্বাধীন ব্যক্তিত্ব-অধিকারী হেতুস্বরূপ। এ খুদী পরম খুদীরই জীবন ও স্বাধীনতার অংশীদার। স্বয়ং পরম খুদী এই উদ্যমধর্মী, সসীম অহং-কে অভ্যুদয়ের অবকাশ দিয়ে তার নিজ বুদ্ধি প্রয়োগের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করেছেন। চেতনাত্মক আচরণের এই স্বাধীনতার কথা কুরআন সমর্থিত খুদীর ক্রিয়াশীলতা থেকেও পাওয়া যায়। কুরআনে এ-সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত রয়েছে :

> "এবং বল, সত্য তোমাদের প্রভুর নিকট থেকেই আসে; অতএব যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাসী থাকুক।" (১৮ : ২৯)
>
> "তোমরা যদি সৎকর্ম কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যেই করছ; আর তোমরা যদি অসৎ কর্ম কর, তা-ও তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই করছ।" (১৭ : ৭)

প্রকৃতপক্ষে মানব-মনস্তত্ত্বের একটি অতি বিশিষ্ট সত্য ইসলামে স্বীকৃত হয়েছে। তা হল স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতার উত্থান-পতন। ইসলাম মানুষের এই স্বাধীন কর্মক্ষমতাকে খুদীর জীবনে একটি চিরন্তন ও ক্ষয়হীন উপাদান হিসেবে রক্ষা করতে বিশেষ যত্নবান। কুর্‌আনের মতে, উপাসনার কাজ হল খুদীকে তার জীবন ও স্বাধীনতার আকরের নিকট তার সংস্পর্শে এনে 'আত্মোপলব্ধি' ফিরে পেতে সহায়তা করা। এই দৈনন্দিন উপাসনাবলীর সময়-নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিদ্রা, ব্যবসায় কার্য-ইত্যাদির যান্ত্রিকতা থেকে 'স্বাধীনতা'র পানে খুদীর অভিসার। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, কুর্‌আনের সর্বত্র নিয়তির উল্লেখ রয়েছে। ব্যাপারটি বিবেচনাযোগ্য; কেননা, পাশ্চাত্য লেখকেরা এই নিয়ে অনেকখানি মাথা ঘামিয়েছেন। বিশেষ করে, স্পেঙ্গার তাঁর 'ডিকাইন অফ দি ওয়েস্ট' গ্রন্থে এই মত ব্যক্ত করতে চেয়েছেন বলে মনে হয় যে, ইসলাম খুদীকে একেবারেই অস্বীকার করে। আমি ইতোপূর্বে আপনাদের কাছে 'তক্‌দীর' (নিয়তি)-এর কুর্‌আনসম্মত অর্থ সম্বন্ধে আমার মত ব্যাখ্যা করেছি। স্পেঙ্গার নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, জগতকে আমাদের নিজস্ব করে নেবার দু'টি পন্থা আছে। প্রথম পন্থা হল বুদ্ধিবৃত্তিক; আর (সুষ্ঠুতর প্রতিশব্দের অভাবে) দ্বিতীয়টিকে বলা যায়, প্রাণ-বৃত্তিক (Vital)। বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় জগতকে বোঝা হয় কার্যকারণের কঠোর শৃঙ্খলায় বেঁধে। প্রাণবৃত্তিক পন্থা হল জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনকে শর্তহীনভাবে স্বীকার করে নেওয়া। এই জীবনই নিজ অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্যাবলীর বিকাশ-সাধন উপলক্ষে ধারাবাহিক কালের জন্ম দেয়। বিশ্বপ্রকৃতিকে প্রাণবৃত্তি দিয়ে অনুধাবনের পন্থাকেই কুর্‌আন 'ঈমান' বলে অভিহিত করেছে। কেবল কতকগুলো নির্ধারিত বচন বা সূত্রে নিষ্ক্রিয় বিশ্বাস স্থাপনই

ঈমান নয়; আসলে ঈমান হল একটি দুর্লভ অনুভূতিজাত জীবন্ত প্রতীতি। শক্তিমান ব্যক্তিত্বই মাত্র এই মহান অনুভূতি পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে এবং এতে নিহিত উচ্চতর 'অদৃষ্টবাদ' আয়ত্ত করতে পারে। নেপোলিয়ন না-কি বলেছিলেন : "আমি একটি বস্তু, ব্যক্তি নই"। একীভূত অনুভূতির এ-ও একবিধ প্রকাশ। হযরত রসূলুল্লাহ্‌র (সা.)-এর মতে, ইসলামের ধর্মীয় অনুভূতির তাৎপর্য হল আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে মানবচরিত্রকে ভূষিত করা। ইসলামের ইতিহাসে এই অনুভূতি রূপ লাভ করেছে উদাহরণত নিম্নোক্ত বাণীসমূহে :

" আমিই সৃষ্টিশীল সত্য"। (হাল্লাজ)

" আমিই কাল।" (মুহাম্মদ)

" আমিই বাঙময় কুর্‌আন।" (আলী)

" মহিমা আমারই।" (বা-ইয়াযিদ)

ইসলামী সূফীবাদের উচ্চতর স্তরে এই একত্বমূলক অনুভূতি সসীম খুদী নয়, এ খুদী কোনরূপ শোষণ-প্রক্রিয়া মারফত অসীম খুদীর মাঝে আপনাকে হারিয়ে ফেলে না ; বরং এ হল সসীমের প্রেমালিঙ্গনে অসীমের ধরা দেওয়া। রূমী বলছেন :

> ঐশী জ্ঞান সাধুর জ্ঞান-সমুদ্রে ডুবে যায়। এমন একটি ব্যাপার লোকেরা কিভাবে বিশ্বাস করবে?

এ ক্ষেত্রে যে ধরনের অদৃষ্টবাদ সূচিত হয়েছে, তাকে খুদীর অস্বীকৃতি মনে করে থাকলে স্পেঙ্গলার ভুল করেছেন। এ-ই জীবন এবং এ-ই সীমাহীন ক্ষমতার মূলাধার। এ কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করে না; এমন কি, চতুর্দিকে প্রাণঘাতী গোলাগুলি পরিবৃত হয়েও এ প্রশান্ত চিত্তে উপাসনায় নিমগ্ন থাকতে পারে।

কিন্তু আপনারা জিজ্ঞেস করবেন, এ কি সত্যি নয় যে, কয়েক শতাব্দী যাবত মুসলিম জাহানে একপ্রকার সর্বনাশা অদৃষ্টবাদ রাজত্ব করছে? এ কথা সত্য। অবশ্য এর পেছনে আছে একটি দীর্ঘ ইতিহাস, যা আলাদা-ভাবে বিবেচ্য। এখানে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইসলামের ইউরোপীয় সমালোচকেরা অদৃষ্টবাদের যে বিশিষ্ট রূপকে এক কথায় 'কিস্‌মত' বলে আখ্যায়িত করেছেন, তার অভ্যুদয় হয়েছে কতকটা দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে, কতকটা রাজনৈতিক সুবিধাবাদ থেকে আর বাদবাকী, প্রাথমিক ইসলাম মুসলিম জীবনে যে কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল, তার ক্রমঅবলুপ্তির ফলে। দর্শন শাস্ত্র আল্লাহ্‌কে বিশ্ব-কারণ স্বরূপ গ্রহণ করে এর তাৎপর্য অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করে এবং কালকে গ্রহণ করে কার্যকারণ সম্পর্কের সার স্বরূপ। এমতাবস্থায় তার পক্ষে আল্লাহ্‌কে বিশ্বজগত সৃষ্টির পূর্ব থেকে বিরাজমান এবং তার ওপর বাইরে থেকে ক্রিয়াশীল একটি ইন্দ্রিয়াতীত অস্তিত্ব হিসেবে মেনে না নিয়ে উপায়ান্তর থাকে না। কাজেই আল্লাহ্‌কেই মনে করা হয়েছে কারণ-শৃঙ্খলের শেষতম গ্রন্থি-তথা, বিশ্বজগতে যা কিছু হচ্ছে তার আসল কারক। দামেশকের সুবিধাবাদী উমাইয়া শাসকেরা ছিলেন কার্যত বস্তুবাদী।

কারবালার নৃশংসতাকে ঢাকা দিতে এবং আমীর মুয়াবিয়ার বিদ্রোহের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান রোধ করতে তাঁদের জন্যে একটি টেক্‌সই ছদ্মবেশ ধারণের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ল। কথিত আছে, মা'বাদ হাসান বস্‌রীকে বলেছিলেন যে, উমাইয়াদের মুসলিম হনন কার্য আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারেই সংঘটিত হয়েছিল। হাসান জবাব দেন, "এই আল্লাহ্‌র দুশমনেরা মিথ্যাবাদী।" এভাবে মুসলিম ধর্মবেত্তাদের প্রকাশ্য প্রতিবাদ সত্ত্বেও মুসলিম জাহানে এক ধরনের নৈতিক অধোগতিসূচক অদৃষ্টবাদের সৃষ্টি হয়, যার সাহায্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সমর্থনের হাতিয়ার স্বরূপ গঠনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে 'পূর্ব নিস্পন্ন ঘটনা' (Accomplished fact) বলে খ্যাত মতবাদের জন্ম হয়। এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। আমাদের একালেও প্রখ্যাত দার্শনিকেরা সমাজের বর্তমান ধনতান্ত্রিক গঠনের দায়িত্বের সমর্থনে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন। উদাহরণত উল্লেখ করা যায় যে, হেগেল পরম-সত্যকে মনে করেছেন সীমাহীন যুক্তি স্বরূপ, যার থেকে দৈনন্দিন সত্যের মৌলিক যৌক্তিকতার স্বীকৃতি আসে; এবং অগাস্ত কোঁতে সমাজকে কল্পনা করেছেন এমন একটি শরীরী জীবরূপে, যার প্রত্যেকটি বিশেষ কর্ম এক একটি বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর চিরন্ত নভাবে ন্যস্ত। ইসলামের বেলায়ও এই একই ব্যাপার ঘটেছে বলে মনে হয়। কিন্তু মুসলমানেরা সব সময়েই তাদের বিভিন্ন এবং সময়ে সময়ে বিরোধাত্মক মনোভাবের সমর্থন কুরআন থেকে আহরণের চেষ্টা করেছে। তাতে অবশ্য কুর্‌আনের সোজা অর্থকেও অনেক সময় আড়ষ্ট করে তুলতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত মুসলিম জনগণের জীবনে অদৃষ্টবাদের ব্যাখ্যাবলীর প্রভাব অত্যন্ত গভীরভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ-সম্পর্কে অনেকগুলো ভ্রান্ত ব্যাখ্যার উল্লেখ করা কঠিন নয়; কিন্তু বিষয়টি যথস্থানে বিশেষভাবে বিবেচ্য। এখন আমি 'অমরত্বের' প্রশ্নের দিকে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

অমরত্ব সম্বন্ধে অন্য কোন সময়েই বর্তমানের মত এত বেশী লেখালেখি হয়নি। আধুনিক বস্তুবাদের সহস্র বিজয় সত্ত্বেও এ নিয়ে চর্চা বেড়েই চলেছে। কিন্তু নিরেট প্রজ্ঞামূলক যুক্তিতর্ক থেকে আমরা ব্যক্তিগত অমরত্বের সুস্পষ্ট বিশ্বাসে উপনীত হতে পারি না। ইস্‌লামী চিন্তাধারার ইতিহাসে, ইব্‌নে রুশদই এই অমরত্বের প্রশ্নটি পুরোপুরি প্রাজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, কোন ফললাভে তিনি সক্ষম হন নি। যেহেতু কুর্‌আনে 'নফ্‌স' ও 'রূহ্' বলে দু'টি কথা আছে, সম্ভবত সে জন্যে তিনি জ্ঞান ও বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য দেখাতে অনেক শ্রম স্বীকার করেছেন। এই কথা দু'টি দৃশ্যত মানব চরিত্রের উপর দুই পরস্পরবিরোধী প্রবণতা আরোপ করে অনেক মুসলিম চিন্তানায়ককে বিপথে পরিচালিত করেছে। যা হোক, ইবন রুশ্‌দ যদি মনে করে থাকেন যে, তাঁর এ দ্বৈতবাদ কুর্‌আন-সমর্থিত, তবে, আমার বিশ্বাস, তিনি ভুল করেছেন; কেননা, মুসলিম ধর্মবেত্তারা নফ্‌স্-কে যে ধরনের একটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করে গেছেন, কুর্‌আনে তার সেই অর্থ পাওয়া যায় বলে আমার মনে হয় না। ইবন রুশ্‌দ-এর মতে, বুদ্ধিবৃত্তি দেহাবলম্বী কিছু নয়; এ হল ভিন্ন জাতের জিনিস, এ ব্যক্তিত্বকে ছাড়িয়ে চলে যায়। অতএব বুদ্ধি হল অদ্বিতীয়, সার্বজনীন এবং অবিনশ্বর।

এ থেকে স্পষ্টত এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, এই একত্বমূলক বুদ্ধিবৃত্তিকে যখন ব্যক্তিত্বের সীমারেখায় আবদ্ধ রাখা যাচ্ছে না, তখন মানবীয় ব্যাপারের অগণিত বৈচিত্র্যের মধ্যে এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র প্রকাশ ছাড়া মায়া বৈ আর কিছুই নয়। বুদ্ধিবৃত্তির অবিনাশী একত্ব হয় তো মানবতা ও সভ্যতার চিরস্থায়িত্বকে বোঝায়-রেনান এই মত পোষণ করেন। এতে নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত অমরত্ব বোঝায় না। উইলিয়ম জেম্‌স বোঝাতে চেয়েছেন, ইন্দ্রিয়-জগতের অতীত এক রকম যান্ত্রিকতা চেতনা রয়েছে; দৈহিক মাধ্যমে কিছুকাল কার্যশীল থাকবার পর এ-চেতনা দেহকে নিছক ক্রীড়াচ্ছলে ত্যাগ করে যায়। ইব্‌নে রুশ্‌দ-এর ধারণাও কার্যত এই একই প্রকার। বর্তমানকালের ব্যক্তিগত অমরত্ব সম্বন্ধীয় যুক্তি-তর্কের ধারা মোটের ওপর নীতিশাস্ত্র-ভিত্তিক; কিন্তু নীতি-শাস্ত্রীয় যুক্তিসমূহ নির্ভর করে এই শ্রেণীর বিশ্বাসের ওপর যে, হক বিচারের দাবী শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হবেই, অথবা এ বিশ্বাসের ওপর যে মানুষ অনন্ত আদর্শের অভিসারী। কান্ট-এর মতবাদ এবং তার আধুনিক সংশোধিত ব্যাখ্যা সম্পর্কে এ কথা খাটে। কান্ট-এর ধারণায় অমরত্ব কল্পনাগ্রাহ্য যুক্তির অতীত। এ হল কার্যকরী যুক্তিবাদের একটি স্বীকৃত সত্য, মানবের নৈতিক চেতনা-ক্ষেত্রে একটি স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়। মানুষ পুণ্য ও আনন্দ-স্বরূপ পরম শ্রেয়কে পেতে চায়, তাকে অনুসরণ করে চলে। কিন্তু কান্ট-এর মতে পুণ্য ও আনন্দ, কর্তব্য ও আকাঙ্খা এরা পরস্পর বিসদৃশ বৃত্তি। এ জ্ঞান-গ্রাহ্য জগতে সাধকের স্বল্প পরিসর জীবনে এ-সব বৃত্তির সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব নয়। অতএব আমরা এ সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হচ্ছি যে, পুণ্য ও আনন্দের পরস্পর-সম্পর্কহীন ধারণার মধ্যে ব্যক্তিগত সাধনা দ্বারা একত্ব গড়ে তুলতে অনন্ত জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে এবং এ দু'ধারার মিলনকে সফল করে তুলতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যা হোক, পুণ্য ও আনন্দের সমন্বয় সাধনে কেন যে অনন্তকালের প্রয়োজন হবে, অথবা পরস্পর নিরপেক্ষ দু'টি ব্যাপারকে আল্লাহ্ কি করে যে একত্বে আনয়ন করতে পারেন, তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে না। এ সব প্রজ্ঞামূলক যুক্তির সাহায্যে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে অসামর্থ্যের দরুন অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি আধুনিক বস্তুবাদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিগুলো খণ্ডনের দিকেই অধিকভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। বস্তুবাদে অবশ্য অমরত্বের ধারণা সরাসরি অস্বীকৃত হয়েছে; এবং চেতনাকে মস্তিষ্কের একটি ক্রিয়াবিশেষ ও মস্তিষ্কের বিনাশের সাথে সাথে বিনাশশীল বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। উইলিয়াম জেমস মনে করেন যে, অমরত্বের অস্বীকৃতিসূচক এ মত গ্রহণযোগ্য হতে পারে কেবল তখনই, যখন মস্তিষ্ক ক্রিয়াকে উৎপাদনক্ষম স্বীকার করে নেওয়া হবে। কতকগুলো শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে কতকগুলো মানসিক পরিবর্তন ঘটে থাকে-শুধুমাত্র এই তথ্য থেকেই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি না যে, সেই শারীরিক পরিবর্তনগুলোর দ্বারাই সেই মানসিক পরিবর্তনগুলো ঘটে থাকে বা ঘটতে বাধ্য। ক্রিয়াটি যে উপাদানমূলক হবে, এমন কোন কথা নেই; এ হয় তো সম্মতিসূচক বা বহনকারী মাত্র হতে পারে-যেমন বন্দুকের ঘোড়ার ক্রিয়া বা লেন্‌স্-এর প্রতিফলন। আগেই উল্লেখ করেছি যে, এ-মতে আমাদের অন্তর্নিহিত জীবনকে দেখা হয় চেতনার, এক প্রকার ইন্দ্রিয়াতীত যন্ত্রশক্তির

ক্রীড়াচ্ছলে, অল্পকালের জন্যে দেহাবয়বে আবির্ভাব ও ক্রিয়াশীলতারূপে। অতএব আমাদের বাস্তব অনুভুতির বিষয়-পরম্পরা যে একটি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে, সে মত দৃঢ় প্রত্যাশ্যা এ-থেকে করা চলে না। বাস্তববাদের মুকাবিলা আমাদের কিভাবে করতে হবে সে-সম্বন্ধে আমার মতামত আমি পূর্ব বক্তৃতাদিতে ব্যক্ত করেছি। বিজ্ঞান পরম সত্যের কয়েকটি বিশিষ্ট দিক মাত্র নিয়েই গবেষণা করতে হবে, সমবাদ বাকী সম্বন্ধে সে অধিকারী নয়। সত্যের যে আংশিক রূপে বিজ্ঞানের আওতায় আসে, তা নিয়ে সমগ্র সত্যকে অবধারণ করতে যাওয়া এবং তার বাইরের সব কিছুকে অস্বীকার করা বিজ্ঞানের পক্ষে নিছক গোঁড়ামী বৈ আর কিছু নয়। অবশ্যই মানুষের একটি অবস্থিতিমূলক রূপ আছে। কিন্তু তাই কি তার একমাত্র বা সমগ্র রূপ? মানব-চরিত্রের অন্যান্য অনেক দিক রয়েছে- যেমন, মূল্যমান নিরূপণ, উদ্দেশ্যমূলক অনুভূতিসমূহের ঐক্যবোধ, সত্যোপলব্ধি-প্রচেষ্টা ইত্যাদি যা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক্ষেত্রের বহির্ভূত বলে স্বীকার করতেই হবে এবং যার পর্যবেক্ষণ বা পরিমাপের হাতিয়ার বিজ্ঞান-লভ্য নয়, বরং ভিন্ন জগতের ব্যাপার।

যা হোক, আধুনিক চিন্তাধারার ইতিহাসে অমরত্বের একটি প্রত্যক্ষ রূপও স্বীকৃত হয়েছে; সে হল নীট্‌শের চিরন্তন পৌনঃপুনিকতাবাদ। নীট্‌শে তাঁর এ মতবাদকে প্রত্যাদেশ-বাণীর মতো জোরের সাথে প্রচার করে গেছেন। তা ছাড়া বর্তমান যুগমনের একটি প্রকৃত প্রবণতার সন্ধানও এ-থেকে মেলে। অতএব এ মতবাদ কিছুটা বিস্তারিতভাবে বিবেচ্য। ব্যাপারটি অনেকের মনে আংশিকভাবে ছায়াপাত করেছিল; এবং শেষতক্ নীট্‌শের কাছে আসে একটি কাব্যিক অনুপ্রেরণার মতো। হার্বটি স্পেন্সারে-ও এর বীজ বর্তমান। নীট্‌শের আধুনিক অথচ প্রত্যাদিষ্টসুলভ মনে এ আদর্শের যুক্তিমূলক অভিব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী হয়েছে এর প্রাণশক্তির তীব্রতা। এর থেকে আরও একটি ব্যাপার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, চরমতম সত্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা প্রত্যা!দেশের মাধ্যমেই লভ্য; প্রাজ্ঞানিক তর্ক-সূত্র এ-পথে বেশি দূর এগোতে পারে না। যা হো,ক নীট্‌শে তাঁর এ-বিশ্বাসকে একটি সুবিবেচিত মতবাদের রূপ দিয়ে গেছেন; এবং সে হিসেবে এ আমাদের বিচার-সীমায় এসে পড়েছে। এ বিশ্বাসের মূল ভিত্তিস্বরূপ একটি প্রাকৃতিক তথ্যকে প্রথমে মেনে নেওয়া হয়েছে; তা হল এই যে, বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত শক্তি বা এনার্জির পরিমাণ বরাবরই এক, অতএব সীমাবদ্ধ। স্থান হল একটি প্রত্যয়গত (subjective) ব্যাপার।

জগতকে আমরা স্থানে অবস্থিত মনে করি; কিন্তু স্থানকে একটি নিঃসীম শূন্যতা বলে স্বীকার করে নিয়ে এই স্থানের ক্রোড়ে জগতের অবস্থিতির বিশেষ কোন অর্থ পাওয়া যায় না। যা হোক, নীট্‌শে সময়-এর বিচারে কান্ট ও শোপেনহাওয়ার থেকে আলাদা পথ ধরেছেন। সময় বা কাল একটি প্রত্যয়গত বিষয় নয়, এটি একটি সীমাহীন পর্যায়ক্রম এবং তাকে বুঝতে পারা যায় একমাত্র এর 'আবর্তশীল' রূপে। অতএব এ স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে যে, একটি অসীম শূন্যস্থানের মধ্যে শক্তির বিলয় ঘটতে পারে না। এই শক্তির

কেন্দ্রাবলী সংখ্যায় নির্দিষ্ট এবং তাদের যোগাযোগও পুরোপুরিভাবে গণন সাধ্য। এই সর্বদা কর্মশ্রবণ শক্তির কোন আদি বা অন্ত নেই, কোন ভারসাম্য নেই; কোন প্রথম বা অন্তিম পরিবর্তন নেই। যেহেতু সময় সীমাবদ্ধ, অতএব শক্তির কেন্দ্রাবলীর সর্বপ্রকার সম্ভাব্য যোগাযোগ ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে। বিশ্ব-জগতে নতুন ঘটনা বলে কিছু নেই, যা কিছু ঘটছে তা ইতিপূর্বেও অশেষবার ঘটে গেছে এবং ভবিষ্যতেও অশেষবার ঘটবে। নীট্‌শের মতে, বিশ্ব-প্রকৃতিতে ঘটনাবলীর পর্যায়ক্রম নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় রূপে বিরাজ করছে। কেননা, ইতোমধ্যেই যে অনন্তকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে, তার মধ্যে শক্তি কেন্দ্রাবলী নিজ নিজ চলনভঙ্গীর যা যা সম্ভাব্য রূপ ছিল, তার সবকিছুই নির্ধারিত করে নিয়েছে। পৌনঃপুনিকতা কথাটি থেকেই 'নির্ধারিতত্ত্বে'র ধারণা আসে তা ছাড়া আমাদের এ-সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই হবে যে, শক্তিকেন্দ্রাবলীর যে-সব যোগাযোগ কোন-না-কোন কালে হয়ে গেছে, তা আবার ফিরে না এসে পারে না; তা না হলে 'অতি-মানুষের' ফিরে আসা সম্বন্ধেও আমরা স্থির নিশ্চয় হতে পারি না :

সব কিছুই ফিরে এসেছে। লুব্ধক নক্ষত্র এবং উর্ণনাভ, তোমার এই মুহূর্তের চিন্তাধারা, তোমার এই শেষতম মনোভাব-প্রত্যেকটিই ফিরে আসবে। হে মনুষ্য-সন্তান ! তোমার সমগ্র জীবন বারবার নতুন করে গড়তে হবে ধুলিদর্পণের মতো, বারবার ধূলিসাৎ হবে। এই কাল-চক্রে তুমি একটি অণুকণা-অনন্তকাল ধরে বার বার ঘুরে আসবে এবং বারবার সূর্যকিরণ প্রতিফলিত করবে।"

এই-ই হল নীট্‌শের পৌনঃপুনিক চিরন্তনতাবাদ। এ মতবাদ কোন পরীক্ষিত সত্যের ওপর নির্ভর করে গড়া হয়নি; এর উৎপত্তি হয়েছে বিজ্ঞানের একটি কার্যকরী অনুমানের ওপর। নীট্‌শে কালের প্রশ্নকেও যথাযোগ্য আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করেন নি। তিনি একে দেখেছেন একটি বস্তুধর্মী বিষয়রূপে (Objectively)। তাঁর ধারণায়, কাল হল ঘটনাবলীর একটি সীমাহীন পর্যায়ক্রম, যা নিজের শৃঙ্খ বন্ধনের ফলে বারবার ঘুরে আসছে। এখন কালকে এরূপ একটি অনন্তস্থায়ী বৃত্তাকার গতি-রূপ মনে করলে, অমরত্বের কল্পনা একেবারেই অসহনীয় হয়ে পড়ে। নীট্‌শে নিজেই এ-কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং সে-জন্যেই তাঁর এই প্রত্যয়কে তিনি অমরত্ববাদ না বলে বলেছেন যে, জীবন সম্বন্ধে এ এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা অমরত্বকে স্থায়িত্ব দিতে পারে। এখন দেখা যাক, নীট্‌শের মতে অমরত্বকে সহনীয় করে তুলবার উপায় কি? এর জন্যে তিনি এই প্রত্যাশা করেছেন যে, আমার বেঁচে থাকায় যে শক্তি কেন্দ্রগুলো কাজ করছে তাদেরই আদর্শ সমন্বয় হতে উদ্ভূত হবে অতিমানুষ। কিন্তু এই অতিমানুষ পূর্বেই অগণিতবার হয়ে গেছেন। তাঁর জন্ম অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু এই শুভ আশা আজকে আপনাকে বা আমাকে কিভাবে প্রেরণা যোগাতে পারে? আমরা চাই একটি সম্পূর্ণ নতুন কিছু পেতে; কিন্তু নীট্‌শের কল্পনায় এ-রকম নতুন কিছুর অভ্যুদয় চিন্তার অতীত। আমরা এক কাথায় যাকে 'কিসমত' বলি, তাঁর ধারণা তার চেয়েও অপকৃষ্ট একটি অদৃষ্টবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ-মতবাদ জীবন-যুদ্ধে মানুষের দেহমনকে কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা দূরে

থাকুক, বরং তার কর্মপ্রবৃত্তিকে স্তিমিত করে দেয় এবং খুদীর উত্তেজনাময় অস্তিত্বে শৈথিল্য আনে।

এখন কুর্‌আন কি শিক্ষা দিচ্ছে দেখা যাক। কুরআন সমর্থিত নিয়তি বাদ অংশত জীববিজ্ঞান-ভিত্তিক। আমি একে অংশত জীবতাত্ত্বিক বলছি; কেননা, এ বিষয়ে কুর্‌আনে যে সব উক্তি রয়েছে, তার প্রস্তুতি জীববিজ্ঞান অনুসারী। জীবনের মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া তার মর্মোদ্ধার করা সম্ভব নয়। উদাহরণত এতে 'বরযখ' বলে একটি অবস্থার উল্লেখ রয়েছে যা সম্ভবত মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যকার একটি সাময়িক ব্যাপার। পুনরুত্থানকেও অন্য আলোকে দেখা হয়েছে মনে হয়। খৃস্ট ধর্মমতে, একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির পুনরুত্থান হবে, এই তথ্যের ওপর নির্ভর করে বিশ্বজনীন পুনরুত্থানকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কুরআনের মতে তা নয়। কুরআনের বর্ণনা ও যুক্তি থেকে এই-ই যেন প্রতিপন্ন হয় যে, পুনরুত্থান জীবনের একটি বিশ্বজনীন সত্য; এমনকি পশু-পক্ষীর ক্ষেত্রেও এ কোন কোন বিশেষ রূপে প্রতিভাত হতে পারে। (৬ : ৩৮)

যা হোক, ব্যক্তিগত অমরত্ব সম্বন্ধে কুর্‌আনীয় নির্দেশের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাবার আগে, এ সম্পর্কে কুর্‌আন থেকে যে তিনটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয় এবং যা নিয়ে কোন মতভেদ নেই বা হবার কথা নিশ্চয়ই নয়-তা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার :

প্রথমত, কালস্রোতের কোনস্তর হতে খুদী শুরু হয়েছে এবং এই স্থান-কালীয় ব্যবস্থাপনায় আগে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। কয়েক মিনিট আগে আমি যে কুরআন বাক্য উদ্ধৃত করেছি, তা থেকেই এর প্রমাণ সুপ্রকট।

> দ্বিতীয়ত, কুরআনের মতে এই পৃথিবীতে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। নিম্নোদ্ধৃত বাক্যাবলী অনুধাবন করুন :
>
> মৃত্যু যখন তাদের একজনের ওপর আপতিত হয়, তখন সে বলে, প্রভু! আমাকে আবার ফিরে পাঠাও, যাতে যে সৎকাজগুলো আমি না করে এসেছি সেগুলো সমাপ্ত করে আসতে পারি। তা কিছুতেই হতে পারে না। ঠিক এই কথাগুলোই সে বলবে, কিন্তু তাদের পেছনে রয়েছে একটি অন্তরায় (বর্‌যখ); এবং তাদের পুনরুত্থিত করা পর্যন্ত তা থাকবে। (২৩ : ৯৯, ১০০)
>
> এবং পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত চন্দ্রের শপথ, নিশ্চয়ই তোমাদের এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে। (৮৪ : ১৮, ১৯) জীবন-কণিকাগুলো, -এদেরকে কি সৃষ্টি করেছ তোমরা; না, আমরাই এদের সৃষ্টিকর্তা। আমরাই বিধান দিয়েছি যে, তোমাদের জন্যে মৃত্যু আসবে। তবুও তোমাদেরই মত অন্যদের দিয়ে তোমাদের স্থান পূরণ করতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই, অথবা তোমাদেরই আমরা আবার এমন আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারি যা তোমাদের অজ্ঞাত! (৫৬ : ৬৮ : ৬১)

তৃতীয়ত, সসীমতা দুর্ভাগ্য নয় :

> নিশ্চয়ই স্বর্গে-মর্ত্যে এমন কেউই নেই যে, দয়াময় আল্লাহ্র সন্নিধানে দাসরূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদের জেনে রেখেছেন এবং সঠিক সংখ্যায় তাদের স্মরণে রেখেছেন; এবং পুনরুত্থানের দিনে তাদের প্রত্যেকেই এক-একজন আলাদা ব্যক্তি হিসেবে তাঁর কাছে আসবে। (১৯ : ৯৩-৯৫)

এ বিষয়টি বিশেষ জরুরী ও প্রণিধানযোগ্য। ইসলামী মুক্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে যথাযথ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে হলে এটি উত্তমরূপে বোঝা দরকার। নিজ ব্যক্তিত্বের এই অপরিবর্তনীয় একত্ব নিয়েই সসীম খুদী অসীম খুদীর সম্মুখে উপস্থিত হবে এবং অতীতে সে যে-সব কাজ করেছে তার পরিণাম সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হবে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বিচার করবে।

> এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অদৃষ্টই আমরা তার স্কন্ধের সাথে বেঁধে দিয়েছি; এবং পুনরুত্থান দিবসে আমরা তার সামনে একটি বই হাজির করব, যা সম্পূর্ণ খোলা অবস্থায় থাকবে। (তারপর, আমরা বলব-) 'তোমার বই পড়; আজকের দিনে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার জন্যে তুমি ছাড়া আর কারোর প্রয়োজন নেই। (১৭ : ১৩-১৪)

মানুষের অন্তিম অদৃষ্ট যা-ই হোক না কেন, সে অদৃষ্ট সসীমতা থেকে মুক্তিকেই মানবীয় সৌভাগ্যের চরম বলে মনে করে না। মানুষের জন্যে অফুরন্ত পুরস্কার হল তার আত্মাধিকারের ক্রমবিকাশ, তার অনন্য-সাধারণত্ব এবং মানবীয় খুদীরূপে তার কর্ম-তৎপরতার প্রগাঢ়তা। এমনকি, পুনরুত্থান দিবসের অব্যবহিত পূর্বেকার বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলার দৃশ্যও পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত খুদীর পরম প্রশান্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না :

> এবং তূরীতে একটি ফুৎকার-ধ্বনির সাথে সাথে যারা বেহেশত ও দুনিয়ায় রয়েছে তাদের সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়বে, কেবল তারা ব্যতীত যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভিন্ন ইচ্ছা পোষণ করেন। (৩৯ : ৬৮)

সাধারণ নিয়মের এই ব্যতিক্রম কাদের জন্যে সম্ভব হতে পারে? একমাত্র তাদেরই জন্যে যাদের মধ্যে খুদীর উচ্চতম বিকাশ সাধিত হয়েছে। এ বিকাশের শেষতম সীমায় পৌঁছাবার পর, এমনকি সর্বব্যাপী পরম খুদীর সংস্পর্শে এসেও ব্যক্তিগত খুদী নিজ আত্মাধিকার বজায় রাখতে পারে। রসূলুল্লাহর পরম খুদীর দর্শনলাভ সম্বন্ধে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

> তাঁর দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুত হয় নি, বা ইতস্তত করে নি। (৫৩ : ১৭)

এই-ই ইসলামে পরিপূর্ণ মানবত্বের আদর্শ। হযরতের ঐশী আলোকপ্রাপ্তির বর্ণনায়, এ সম্পর্কে একটি অত্যন্ত চমৎকার ফার্সী বয়াত রয়েছে :

> পরম সত্যের বাইরের সামান্যমাত্র কিরণচ্ছটায় মূসা মূর্ছিত হয়ে পড়ে, আর তুমি গঢতম প্রকোষ্ঠে স্মিতহাস্যে দৃষ্টিপাত কর।

সর্বভূতে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী সূফী সম্প্রদায়ের পক্ষে এ দৃষ্টিভঙ্গি যে গ্রহণযোগ্য নয়, তা অবশ্য সহজেই বোঝা যাচ্ছে। তাঁরা এতে নানারূপ দার্শনিক অসঙ্গতি দেখিয়েছেন। অসীম এবং সসীম খূদী পরস্পর পরস্পরের বাইরে কি করে অবস্থান করতে পারে? অসীম খূদীর সামনে কি সসীম খূদী নিজের সসীমতা রক্ষা করতে পারে? এসব অসঙ্গতি কল্পনা অসীমের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভুল ধারণারই ফল। একটি অসীম সম্প্রসারণের কল্পনা করতে গেলে যতপ্রকার সসীম সম্প্রসারণ থাকতে পারে, তার সবগুলোকে আয়ত্ত না করে তাকে দাঁড় করানো যায় না। কিন্তু সত্যিকার অসীমত্ব এ ধরনের অসীম সম্প্রসারণকে বোঝায় না। এর প্রকৃতি প্রসারধর্মী নয়, বরং গভীরত্বধর্মী; এবং খুদীর এই গভীরত্বব্যঞ্জক রূপের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর মাত্রই আমরা দেখতে আরম্ভ করব যে সসীমখুদী অসীম খুদী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, অথচ তার স্পষ্ট আলাদা অস্তিত্ব রয়েছে। ব্যপ্তির দিক থেকে বিচার করলে আমরা যে স্থান-কাল সংস্থায় রয়েছি, আমরা তার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু গভীরত্বের দিক থেকে সেই একই স্থান-কাল সংস্থাকে আমি বিবেচনা করি আমার সামনাসামনি অথচ আমা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে অবস্থিত একটি অন্য কিছু। প্রাণধারণ বা জীবনযাপনের জন্য আমি যার ওপর নির্ভর করি, তার সাথে আমি নিশ্চয়ই নিকট সম্পর্কে আবদ্ধ কিন্তু তবুও আমি তার থেকে পৃথক। এই তিনটি বিষয় ভাল করে বুঝে নিলে সিদ্ধান্তটির বাকী অর্থ সহজ হয়ে পড়ে। কুরআনের মতে, বিশ্ব-মর্মে নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে অমরত্ব আয়ত্ত করার দ্বার মানুষের জন্য খোলা রয়েছে।

> মানুষ কি মনে করে যে, তাকে একটি অনাবশ্যক বস্তুর মতো ফেলে রাখা হবে? সে কি একটি ভ্রূণ মাত্র ছিল না? তারপর সে ঘন রক্তে পরিণত হল, যা থেকে আল্লাহ তাকে আকৃতি ও অবয়ব দিলেন; এবং তাকে ভাগ করা হল পুরুষ এবং নারীতে। আল্লাহ কি মৃতে জীবন সঞ্চালনে ক্ষমতাবান নন? (৭৫ : ৩৬-৪০)

এ একান্ত অসম্ভাব্য যে, শত শত বছর যে প্রাণীর ক্রমবিকাশ-সাধনে কেটে গেছে, শেষতক তাকে উচ্ছিষ্টের মত ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। কিন্তু কেবল ক্রমবিকাশমান খূদী হিসেবেই সে বিশ্বের মর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

> আত্মার, এবং যিনি তাকে ভারসাম্য দান করেছেন, দুষ্ট ও শিষ্ট পথ প্রদর্শন করেছেন তাঁর শপথ, যে ব্যক্তি আত্মাকে বিকশিত করে তুলেছে সে-ই ভাগ্যবান; এবং যে ব্যক্তি আত্মাকে কলুষিত করেছে সে-ই লাঞ্ছিত। (৯১ : ৭-১০)

আত্মাকে বিকশিত করে তোলা ও কলুষমুক্ত রাখবার উপায় কি? উপায় হল কর্মসাধন :

> তিনিই ধন্য, রাজ্য যাঁর হাতে ন্যস্ত এবং সব জিনিসের ওপরই তিনি প্রভাবশালী; তিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু এবং জীবন যাতে তোমাদের মধ্যে কর্ম-সাধনায় কে সবচেয়ে উত্তম তা প্রমাণিত হয়; এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান ও ক্ষমাশীল। (৬৭ : ১, ২)

জীবন হল খূদীর কার্যকারিতার একটি সুযোগ বিশেষ। মৃত্যু হল তার সমন্বয়মূলক কার্য-সাধনার প্রথম পরীক্ষা। আনন্দদায়ক বা বেদনাদায়ক কার্য বলে কিছু নেই; আছে অহং-

সমর্থক এবং অহং-এর বিলোপক কার্য। কর্মই খুদীকে বিলোপের পথে নিয়ে যায়; এবং কর্ম দ্বারাই তা ভবিষ্যৎ জীবনের পথ-নির্দেশ পায়। অহং-সমর্থক কর্মের নীতি হল নিজের ও পরের মধ্যে অহং-এর প্রতি সম্ভ্রমভাব। এটিও কর্মবিশেষ। অতএব অধিকার হিসেবে ব্যক্তিগত অমরত্ব আমাদের নয়; ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারাই একে অর্জন করতে হবে। মানুষ এর জন্যে একজন প্রার্থী মাত্র। বস্তুবাদের সবচেয়ে দুঃখজনক ভুল এই যে, এর মতে সসীম চেতনা নিজ লক্ষ্য বস্তুকেই নিঃশেষিত করে দেয়। দর্শন এবং বিজ্ঞান এই লক্ষ্যবস্তুতে পৌছাবার পথ মাত্র। আমাদের সামনে অন্যান্য পথও খোলা রয়েছে; খুদী যদি জীবনকালীন কর্মদ্বারা দৈহিক বিলোপজনিত স্নায়বিক আঘাত সহ্য করবার শক্তি অর্জন করে থাকে, তবে মৃত্যুকে কুরআন-বর্ণিত 'বরযখ'-এ পৌছবার একটি প্রবেশপথ মাত্র বলে মনে করা যায়। সূফী-সাহিত্যে বর্ণিত অনুভূত তথ্যাবলী থেকে জানা যায় 'বরযখ' একপ্রকার চেতনাবিশেষ; এ অবস্থায় খুদী কাল ও স্থানের দিকে নতুন ভঙ্গীতে দৃষ্টিপাত করে। এর মধ্যে অসম্ভাব্য কিছু নেই। হেমহোল্‌জ্‌ই (Hwlmholtx) প্রথম আবিষ্কার করেন যে, স্নায়বিক উত্তেজনার চেতনায় পৌছাতে কিছু সময় লাগে। তা-ই যদি হয়, তবে কাল-সম্বন্ধে আমাদের আধুনিক ধারণার মূলে আমাদের বর্তমান শারীরিক গঠনের ক্রিয়া যে রয়েছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এবং খুদী যদি বর্তমান দেহের বিলোপপ্রাপ্তির পরেও আত্মরক্ষা করতে পারে, তবে সাথে সাথে আমাদের স্থান-কাল সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন হওয়াও একান্ত স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এ রকম পরিবর্তন যে আমাদের একেবারে অজানা, তাও নয়। আমাদের খণ্ডিত স্মৃতি বা মনোভাবাবলীর যে অসাধারণ প্রগাঢ় রূপ কখনও কখনও স্বপ্নরাজ্যে ধরা দেয়, কিংবা কারও কারও মৃত্যু-মুহূর্তে স্মরণশক্তির যে অভাবিত উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়, তা থেকে খুদীর কাল সম্বন্ধে বিভি-ন্ন মান আয়ত্ত করবার ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব 'বরযখ' যে কেবল একটি নিষ্ক্রিয় আশার অবস্থা, তা মনে হয় না। এ অবস্থায় খুদী পরম সত্যের নতুনতর রূপের কোন কোন দিকের আকস্মিক দৃষ্টি লাভ করে এবং এসব দিকের সাথে নিজের সামঞ্জস্য বিধানে প্রস্তুত হতে থাকে। আধ্যাত্মিক জীবনে এ অবশ্যই একটি অতি সংকটজনক ভাঙা-গড়ার অবস্থা, বিশেষ করে পূর্ণ-বিকাশপ্রাপ্ত খুদীর বেলায় নিজ বিশিষ্ট স্থান-কাল-সংস্থার পরিবেশ এবং চিরাচরিত রীতি-নীতি থেকে বিচ্যুতির পূর্ণ ধাক্কা এতে উহ্য; দুর্বলতর খুদীর পক্ষে এ মৃত্যুবাণ রূপে প্রতিভাত হওয়াও অসম্ভব নয়। যা হোক, খুদীকে এখন থেকে আবার আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং নবতর জীবনে উন্মেষ ও অগ্রগতির জন্যে সংগ্রাম আরম্ভ করতে হবে। পুনরুত্থান তাহলে কোন বাহ্যিক ব্যাপার নয়; এ খুদীর মধ্যেই জীবন-প্রক্রিয়ার চরমতম অভিব্যক্তি। ব্যক্তিগতভাবেই হোক বা সাধারণভাবেই হোক, এ খুদীর বিগত কার্যাবলীর ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাবলীর একটি হিসাব-নিকাশ নেওয়া মাত্র। কুরআনে খুদীর এই পুনরুজ্জীবন ঘটনাকে তার প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে তুলনা করে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে :

মানুষে বলে 'কি! মরে যাবার পরে আবার কি আমাকে জীবন্ত করে তোলা হবে?' লোকে কি এ-কথা মনে রাখে না যে, প্রথমে সে যখন কিছুই ছিল না, তখন আমরা

তাকে সৃষ্টি করেছিলাম? (১৯ : ৬৭-৬৮)

আমরাই বিধান দিয়েছি যে তোমাদের কাছে মৃত্যু আসবে।...

তবুও তোমাদেরই মত অন্যদের দিয়ে তোমাদের স্থান পূরণ করতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই, অথবা তোমাদেরই আবার আমরা এমন আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারি, যা তোমাদের অজ্ঞাত। তোমরা তো প্রথম সৃষ্টির কথা জানতে পেরেছ ; তোমরা কি চিন্তা করে দেখবে না? (৫৫ : ৬০-৬২)

মানুষের প্রথম আবির্ভাব কিরূপ? ওপরের উদ্ধৃতি দু'টির শেষ বাক্যাবলীতে এ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিতময় যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে, তা থেকে মুসলিম দার্শনিকদের সামনে প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন বাতায়ন উন্মুক্ত হচ্ছে, বলা চলে। প্রাণী জগতে সাধারণত বাসস্থান ও পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তনের সাথে সাথে যে জীবন-যাত্রায়ও পরিবর্তন আসে, তা প্রথম উল্লেখ করেন জাহিয় (মৃত্যু : ২২৫ হি.)। 'ইখওয়ানুস্ সাফা' নামধেয় সমিতি জাহিয্-এর মতকে আরো খোলাসা করেন। অবশ্য ইব্‌নে-মাস্কাওয়েহ্-ই (মৃত্যু : ৪২১) হি.) ছিলেন প্রথম মুসলিম চিন্তানায়ক, যিনি মানুষের অভ্যুদয় সম্বন্ধে একটি পরিচ্ছন্ন এবং অনেক দিক থেকে পুরোপুরি আধুনিক বর্ণনা দিয়েছেন। রূমী যে অমরত্বের প্রশ্নকে জীববিজ্ঞান-সংক্রান্ত ক্রমবিকাশের পর্যায়ে ফেলেছেন এবং পূর্ববর্তী কতিপয় মুসলিম দার্শনিকের মত তাকে নিরেট প্রাজ্ঞানিক তর্কাবলী দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চান নি, তা-ও একান্ত স্বাভাবিক এবং কুরআনের অন্তর্নিহিত অর্থের সাথে উত্তরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্তমান পৃথিবীতে ক্রমবিকাশবাদ মানব-জীবনে আশা ও উদ্যম আনবার পরিবর্তে এনেছে হতাশা ও উদ্বেগ। কেননা, আধুনিক বিবর্তনবাদীরা অকারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, মানুষের বর্তমান শারীরিক ও মানসিক গঠনই জৈব-বিকাশের চরমতম ফল, এবং মৃত্যু মৃত্যুতেই শেষ, তারপর আর কিছু নেই। এ পরিস্থিতিতে পুনর্বার আশাবাদী মনোভাব জাগাতে এবং মানুষকে উদ্যম-মুখর করে তুলতে একজন রূমীরই প্রয়োজন। তাঁর অন্তর্বাণীর একটি অননুকরণীয় প্রকাশ নিম্নের কয়েকটি ছত্রে পাওয়া যাবে :

মানবের প্রথম আবির্ভাব হয় অ-জৈব পদার্থের পর্যায়ে;
তারপর সেখান থেকে সে বৃক্ষলতার পর্যায়ে চলে যায়।
তার অ-জৈব অবস্থার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে বহুবর্ষ সে এই
উদ্ভিদ স্তরেই র'য়ে যায়;
তারপর যখন সে উপনীত হল উদ্ভিদের পর্যায় থেকে জীব-জন্তুর পর্যায়ে
তখন সে পূর্বেকার উদ্ভিদ জীবনের অবস্থাও ভুলে গেল।
শুধুমাত্র তরু-জগতের প্রতি তার কিছুটা আর্কষণ রয়ে গেল-
বিশেষ করে সুমধুর বসন্ত দিনে, পুষ্প-সম্ভারের কালে;
শিশুরা যেমন আকৃষ্ট হয় তাদের মায়ের দিকে,
মাতৃস্তনের প্রতি তাদের আকর্ষণের হেতু সম্বন্ধে

সচেতনতা ছাড়াও।
তারপর সেই মহান স্রষ্টা মনুষ্য-জাতিকে রূপান্তরিত করলেন
পশু-জীবন থেকে মানব জীবনে।
এভাবে মানুষ সঞ্চরিত হতে থাকল
প্রকৃতির এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে,
যে পর্যন্ত না সে আজকের বোধশীল, জ্ঞানশীল
শক্তিমান রূপে পরিণতি লাভ করল।
তার প্রাথমিক আত্মাসমূহের সম্বন্ধে এখন
আর তার কিছুই মনে নেই;
এবং সে পুনর্বার পরিবর্তিত হবে,
বর্তমান আত্মা থেকে নবতর আত্মায়।

যা হোক, যে ব্যাপারটি মুসলিম দার্শনিক ও ধর্মবেত্তাদের মধ্যে বহুতর মতবিরোধের সৃষ্টি করেছে, তা হল কিয়ামতের ময়দানে মানুষ তার পুর্বতন দেহের মাধ্যমে উঠবে কি-না। ইসলামের শেষ মহান ইমাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ সমেত তাঁদের প্রায় সকলের মতে, খুদীর এই নতুন পরিবেশের উপযোগী কোন প্রকার দৈহিক মাধ্যমের প্রয়োজন হবারই সম্ভাবনা রয়েছে। আমার মনে হয়, এই ধারণার ভিত্তি এই যে, কিছুটা স্থানীয় সম্পর্ক বা পরীক্ষাসিদ্ধ পশ্চাদপ ছাড়া খুদীকে ব্যক্তি হিসেবে কল্পনা করা কঠিন। যা হোক, কুর্আনের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে এ সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে :

> 'কি! মৃত এবং ধুলিতে পর্যবসিত হবার পর আমরা কি আবার জেগে উঠব? সে প্রত্যাবর্তন দূরের ব্যাপার বটে। আমরাই জানি, মাটিতে তাদের কতখানি মিশে যাবে; এবং আমাদের কাছে রয়েছে একটি রক্ষিত ফলক, যাতে এর সব হিসাব লিপিবদ্ধ আছে। (৫০ : ৩, ৪)

আমার ধারণায় এ বাক্য থেকে এটা পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা চলে যে, বর্তমানে পরিবেশে মানুষের যে স্বকীয় অবস্থা আছে, মৃত্যুর সঙ্গে তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরেও তার কর্মের শেষতম পরিণতিকে রূপ দেওয়ার জন্যে বিশ্ব-প্রকৃতিতে কোন ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবপর। সেই ব্যবস্থা কি, তা আমরা জানি না। এই 'দ্বিতীয় সৃষ্টি'র প্রকতি কিরূপ হবে, দেহের সাথে পুনরুত্থানের সম্বন্ধ স্থাপন করেও সে বিষয়ে নতুন কোন হদিস পাওয়া যায় না। কুরআনের উপমাবলী থেকে একে কেবল একটি সত্য বলেই জানা যায়; এর প্রকৃতি বা চরিত্র সম্বন্ধে কোন আভাস মিলে না। অতএব দার্শনিক বিচারে আমরা যতখানি অগ্রসর হতে পারি তা হল এই : মানুষের যা অতীত ইতিহাস, তার বিবেচনা এ-কথা সম্ভব বলে মনে হয় না যে, তার দেহ-বিলোপের সাথে সাথে তার অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

যা হোক, কুরআনের শিক্ষা অনুসারে, খুদী তার পুনরাবির্ভাবের সাথে সাথে এক প্রকার

'তীক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ করবে (৫০ : ২১) এবং তার সাহায্যে সে নিজেই তৈরি 'নিয়তি'কে স্পষ্টরূপে 'নিজ স্কন্ধের সাথে আবদ্ধ' অবস্থায় দেখতে পাবে। বেহেশত ও দোজখ দু'টি অবস্থা বিশেষ- স্থান নয়। কুর্‌আনের এসব বর্ণনা হল একটি অন্তর্নিহিত সত্যের বাহ্য-দৃষ্টিসুলভ রূপ। কুর্‌আনের কথায় দোজখ হল : 'আল্লাহর জ্বালানো অগ্নি যা হৃদয়সমূহকে বেষ্টন করে উত্থিত হয়।' অন্য কথায় ব্যক্তির মানুষ হিসেবে কর্তব্যচ্যুতির বেদনাদায়ক অনুভূতি। বেহেশত হল ধ্বংসাত্মক শক্তিসমূহের ওপর বিজয় লাভজনিত পরম আনন্দ। ইসলামে চিরন্তন দোজখ বলে কোন কিছু নেই। কুরআনের কতিপয় বাক্যে দোজখ সম্পর্কে যে 'চিরন্তনতা'র উল্লেখ আছে, তার ব্যাখ্যা আবার কুর্‌আনেই রয়েছে যে, তার অর্থ 'মাত্র একটি নির্ধারিত কাল' (৭৮ : ২৩)। ব্যক্তিত্বের বিকাশে 'কাল'-কে পুরোপুরিভাবে অবান্তর মনে করা চলে না। চরিত্র সর্বদা একটি চিরন্তন রূপ নিতে উন্মুখ; অতএব চরিত্রের পুনর্গঠন অবশ্যই সময়-সাপেক্ষ। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে, দোজখকে একজন প্রতিহিংসাপরায়ণ বিধাতার সৃষ্ট অনন্ত নির্যাতনমূলক কারাগার বলে মনে করা চলে না; একে বুঝতে হয় একটি শোধনমূলক অভিজ্ঞতাবিশেষ বলে, যা পাপ-কলুষাচ্ছন্ন খুদীকে পুনর্বার ঐশী প্রশান্তির প্রাণ-প্রদায়িনী মৃদু সমীরণের আকাঙ্ক্ষী করে তুলতে পারে। বেহেশ্‌তও একটি ছুটির দিনবিশেষ নয়। জীবন এক এবং চিরপ্রবহমান। মানুষ সর্বক্ষণ সম্মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে-প্রতি-মুহূর্তে নতুনতর মহিমায় ভূষিত এক অসীম সত্যরূপের আলোকে নিজেকে নিয়ত অভিষিক্ত করতে। এ ঐশী আলোকে সে একান্ত নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করতে পারে না। মুক্ত-বুদ্ধি খুদীর প্রতিটি নতুন কর্মোদ্যম নতুনতর পরিবেশের সৃষ্টি করে এবং এইভাবে সৃষ্টিধর্মী বিকাশের জন্যে নবতর সুযোগের সৃষ্টি করে দেয়।

পাঁচ

মুসলিম তমদ্দুনের মর্মকথা

"মুহম্মদ উচ্চতম বেহেশ্‌তে উপনীত হয়েছিলেন এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; আল্লাহ্‌র কসম-আমি যদি সেখানে পৌছতে পারতাম তা হলে কখনই প্রত্যাবর্তন করতাম না।" খ্যাতনামা মুসলিম সাধক আবদুল কুদ্দুস গাংগোহী এই উক্তি করেছিলেন। সমগ্র সূফী সাহিত্যের আর কোথাও বোধহয় একটিমাত্র বাক্যে নবী মানস এবং সূফী মানসের চৈতন্যের এরূপ সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য প্রকাশ পায়নি। সূফী তাঁর অখণ্ড অভিজ্ঞতার প্রশান্তি থেকে প্রত্যাবর্তন করতে চান না; এবং যদিও তিনি প্রত্যাবর্তন করেন তবুও বৃহত্তর মানব-সমাজের পক্ষে তাঁর এই প্রত্যাবর্তনের কোন সার্থকতা থাকে না। নবীর প্রত্যাবর্তন কিন্তু সৃষ্টিধর্মী। তিনি প্রত্যাবর্তন করেন কালের প্রগতির সাথে যোগদান করতে, ইতিহাসের ঘটনাবর্ত নিয়ন্ত্রণ করে নব-আদর্শের পৃথিবী সৃষ্টি করতে। সূফীর কাছে অখণ্ড অভিজ্ঞতার প্রশান্তিই শেষ কথা; নবীর পক্ষে এ হচ্ছে যুগান্তর আনয়নকারী মানসিক শক্তির উদ্বোধন। এই শক্তি দিয়ে তিনি মানব-জগতের রূপান্তর সাধন করেন। নবীর চরম কামনা তাঁর ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে একটি জীবন্ত জাগতিক শক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করা। এইরূপে তাঁর প্রত্যাবর্তন তাঁর ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণের একটা প্রায়োগিক (pragmatic) মানদণ্ড। সৃষ্টিধর্মী কর্মের মধ্যে নবী নিজের সঙ্কল্পকে এবং যে-সকল মূর্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি একে রূপ দেবেন সেগুলোকে যাচাই করে দেখেন। সামনের দুর্লজ্ঘ্য বাধা জয় করার মধ্য দিয়ে নবী নিজেকে আবিষ্কার করেন এবং ইতিহাসের সম্মুখে প্রকাশিত করেন। অতএব তাঁর ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণের আরেকটা মানদণ্ড হবে কী ধরনের মানুষ তিনি গড়ে তুলতে পেরেছেন এবং তাঁর বাণীর প্রেরণায় কি ধরনের তমদ্দুন বিকাশ লাভ করেছে। এই বক্তৃতায় আমি শেষোক্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা করব। জ্ঞানরাজ্যে ইসলামের বিবরণ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়; আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ইসলামী তমদ্দুনের কতকগুলি প্রধান ধ্যান-ধারণার প্রতি। এতে এইসব ধ্যান-ধারণার পেছনে যে চিন্তাধারা বর্তমান সে- সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব হবে, এবং আরও সম্ভব হবে ইসলামী তমদ্দুনের ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়ে প্রকাশমান মর্মরূপের পরিচয় লাভ। কিন্তু' তা করার আগে ইসলামের একটা বড় অভিমতের তামদ্দুনিক মূল্য উপলব্ধি করা দরকার। এই অভিমতটা হচ্ছে নবুয়ত খতম হওয়ার কথা।

নবীকে বলা যেতে পারে এক ধরনের মরমীয় (mystic) চৈতন্যের প্রতীক- যার মধ্যে 'অখণ্ড অভিজ্ঞতা' আপনার সীমা অতিক্রম করে এবং সমষ্টিগত জীবনের গতির মোড় ফেরাবার অথবা একে নতুন রূপ দেবার সুযোগ সন্ধান করে। জীবনের সসীম কেন্দ্রস্থল

তাঁর ব্যক্তিত্বের অসীম গভীরতায় ডুবে যায় এবং তার পরেই নতুন উদ্যমে আবার জেগে ওঠে পুরাতনকে ধ্বংস করতে এবং জীবনের নতুন নতুন দিক খুলে দিতে। আপন সত্তার মূল কেন্দ্রের সাথে এই যোগাযোগ অবশ্য শুধু মানুষেরই বৈশিষ্ট্য নয়। বস্তুত কুরআনে 'ওয়াহী' শব্দটি যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, 'ওয়াহী' হচ্ছে জীবনের একটা বিশ্বজনীন ধর্ম, যদিও এর প্রকৃতি এবং স্বরূপ জীবনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার।

পৃথিবীর বুকে গাছপালা এই যে স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠে, নতুন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্যে প্রাণী-জগতে এই যে নতুন অঙ্গ গড়ে ওঠে, আর মানুষ এই যে তার জীবনের গহীন তল থেকে আলোক পায়-এ সবই 'ওয়াহী' (অনুপ্রেরণা); প্রয়োজন মুতাবিক বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এর বিভিন্ন রূপ। মানব জাতির অপরিণত অবস্থায় তার মানসিক শক্তি এমন একটা বিশেষ উন্নত স্তরে বিকাশ লাভ করে যাকে আমি বলি নবী সুলভ চৈতন্য; এই চৈতন্য মানুষের ব্যক্তিগত চিন্তার অপেক্ষা না করে উপস্থিত বুদ্ধি ও সিদ্ধান্ত-বলে জীবনের কর্মধারার পথনির্দেশ করে। মানব জাতির ক্রমবিকাশের আগের দিকে তার মানসিক শক্তি এই যে যুক্তিনিরপেক্ষভাবে প্রবাহিত হয়েছে, পরবর্তীকালে তার মধ্যে যুক্তি ও বিচার শক্তির বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে জীবন তার নিজেরই স্বার্থের খাতিরে এই যুক্তি-নিরপেক্ষ মানসিক শক্তির বিকাশ পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মানবজাতির বিবর্তনের প্রথম স্তরে এই চেতনার মধ্য দিয়ে মানসিক শক্তির স্ফূরণ হতো। মানুষ পরিচালিত হয় প্রধানত আবেগ ও প্রবৃত্তির দ্বারা। কেবল আরোহমান যুক্তিই (inductive reason) মানুষকে তার পারিপার্শ্বিকের ওপর প্রভুত্ব দান করতে পারে। এ একটি অর্জিত বস্তু। একবার জন্ম হলে এই বিচারবৃত্তি জ্ঞানের অন্যান্য প্রণালীর প্রতিরোধ করে আপনার শক্তির বৃদ্ধি করবেই । এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, পৌরাণিক জগতে মানুষ যখন ছিল অনেকখানি আদিম প্রকৃতির এবং কম-বেশী প্রবৃত্তির তাগিদেই যখন তারা পরিচালিত হত, তখন তারা দর্শনের কয়েকটি উন্নত মতবাদের প্রবর্তন করেছিল । কিন্তু' এ কথা ভুললে চলবে না যে, পৌরাণিক পৃথিবীর এই মতবাদ ভাবাত্মক (abstruct) চিন্তার সৃষ্টি। এই চিন্তাধারা অস্পষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐতিহ্যগুলিকে প্রণালীবদ্ধ করার (systematization) বাইরে যেতে পারে না এবং এর থেকে বাস্তব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন পথ পাওয়া যায় না।

এদিক দিয়ে দেখলে মনে হয়, ইসলামের পয়গম্বর প্রাচীন আর আধুনিক জগতের মধ্যখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর নিকট প্রকাশিত বাণীর উৎসমূলের দিক দিয়ে তিনি প্রাচীন জগতের এবং সেই বাণীর মর্মরূপের (the spirit of his revelation) দিক দিয়ে তিনি আধুনিক জগতের। জীবনের নতুন পথে চলার উপযোগী জ্ঞানের নতুন নতুন উৎসমূল তাঁর সাধনায় আবিস্কৃত হয়েছে। আশা করি, আমি অচিরেই প্রমাণ করে আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পারব যে, ইসলামের জন্ম হচ্ছে আরোহমান বুদ্ধিবৃত্তিরই জন্ম। আর যে নবুয়তের প্রয়োজন নেই, এই উপলব্ধিই ইসলামে নবুয়তকে পূর্ণতা দান

করেছে। এতে বোঝা যায় যে, জীবন চিরদিন পরের পরিচালনায় চলতে পারে না; পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধির জন্যে মানুষকে তার নিজস্ব সঙ্গতির ওপরই নির্ভর করতে হবে। ইসলামে পুরোহিত প্রথা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে রাজক্ষমতা লাভ নিষিদ্ধকরণ, কুরআনে সর্বদা যুক্তি আর অভিজ্ঞতার প্রতি আবেদন এবং মানবীয় জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রকৃতি ও ইতিহাসের দৃষ্টান্তের ওপর নজর দেওয়ার তাকিদ, এ সবই হচ্ছে সেই অবসানবাদের একেক দিক। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে, মরমীয় অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব আজ নেই। এই মরমীয় অভিজ্ঞতা একটা জীবন্ত ব্যাপার। প্রকৃতির দিক দিয়ে নবুয়তের সঙ্গে এর আত্মীয়তা আছে। এই অভিজ্ঞতা গুণগত বিচারে নবীর অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন জাতীয় নয়। বস্তুত কুরআনে 'আনফাস' (আত্মা) এবং 'আফাক' (জগৎ) এই দুইকেই জ্ঞানের উৎস বলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ্ তার নিদর্শনপুঞ্জ প্রকাশ করেন বাহ্যিক এবং আত্মিক এই উভয় প্রকার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই। মানুষের কর্তৃব্য হচ্ছে সবরকম অভিজ্ঞতারই জ্ঞান-প্রদায়ক সম্ভাবনা যাচাই করে দেখা। অতএব এই অবসানবাদের অর্থ এমন মনে করতে হবে না যে, জীবনে শেষ পর্যন্ত হৃদয়াবেগের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করে যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এমন ব্যাপার সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। চিন্তা-জগতে এ অবসানবাদের মূল্য হচ্ছে এইখানে যে, এতে মরমীয় অভিজ্ঞতাকে স্বাধীনভাবে বিচার করে দেখার একটা মনোভাবের সৃষ্টি হয়, আর এই বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় যে, মানুষের ইতিহাসে অতিপ্রাকৃতিক উৎসের দাবীর ওপর প্রতিষ্ঠিত সব ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের দিনই অতীত হয়েছে। এই ধরনের বিশ্বাসের ফলে উক্তরূপ মাহাত্ম্যের প্রসার প্রতিরুদ্ধ হয়। এই মতের প্রতিষ্ঠার ফলে মানুষের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার প্রদেশে জ্ঞানের নতুন নতুন দিক উন্মুক্ত হয়, যেমন ইসলাম করেছে। পূর্বকালের সংস্কৃতি মানুষের বাইরের অভিজ্ঞতাকে দৈব বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু ইসলামের ফর্মুলার প্রথম অংশ এই অভিজ্ঞতাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শিক্ষা দিয়েছে। অতএব মরমীয় অভিজ্ঞতা যতই অসাধারণ আর অস্বাভাবিক হোক না কেন, মুসলমান একে একটা সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা বলেই বিশ্বাস করবে। অবশ্য মানুষের আর সব অভিজ্ঞতার মতো এই অভিজ্ঞতাও বিচার-সাপেক্ষ। ইবনে সাইয়াদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার প্রতি রসূলুল্লাহ্র মনোভাব থেকেই এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। ইসলামে মরমীবাদের কাজ হচ্ছে মরমীয় অভিজ্ঞতাকে প্রণালীবদ্ধ করা, যদিও এটা স্বীকার করতে হবে যে, ইবনে খালদুনই একমাত্র মুসলমান যিনি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে একে বিচার করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হচ্ছে জ্ঞানলাভের মাত্র একটা উপায়। কুরআনে আরো দু'টি উপায়ের নির্দেশ করা হয়েছে : একটা হচ্ছে প্রকৃতি এবং আরেকটা হচ্ছে ইতিহাস। জ্ঞান লাভের এই দু'টি উপক্ষাকে ব্যবহার করার মধ্যে ইসলামের মর্মরূপ সবচেয়ে সুন্দর রূপে প্রকাশ পেয়েছে। কুরআন চরম সত্তার নিদর্শন দেখতে পায় সূর্যের মধ্যে, চন্দ্রের মধ্যে, দীর্ঘায়মান ছায়ার মধ্যে, দিবা-রাত্রির আবর্তনের মধ্যে, মানুষের বর্ণ ও ভাষার বৈচিত্র্যের মধ্যে মানুষের সাফল্য ও বিপর্যয়ের মধ্যে- বস্তুত মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে। মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে এই সব নিদর্শন অনুধাবন

করা, -অন্ধ ও বধিরের মতো এসবকে তাচ্ছিল্য করা নয়, কেননা এই জীবনে এই সব নিদর্শনের প্রতি যে অন্ধ হয়ে থাকবে সে ভাবী জীবনের বাস্তব সত্যগুলোর প্রতিও (to the realities of life to come) অন্ধ হয়ে থাকবে। বস্তুজগতের প্রতি এই অঙ্গুলি নির্দেশ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে প্রারম্ভ থেকে বিশ্ব যে গতিশীল, সসীম ও পরিবর্ধনম- কুরআনের শিক্ষানুযায়ী এই ক্রমিক উপলব্ধি মুসলিম চিন্তাধারা এবং গ্রীক চিন্তাধারার মধ্যে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত করেছিল। মুসলমানরা তাদের মননসাধনার প্রারম্ভে বিশেষ আগ্রহের সাথে গ্রীক চিন্তাধারা অনুশীলন করেছিলেন। কুরআনের তাৎপর্য যে মুখ্যত এই চিন্তাধারার বিপরীত এটা না বুঝে গ্রীক চিন্তানায়কদের ওপর পূর্ণ প্রত্যয় স্থাপন করে মুসলমানদের প্রথম প্রচেষ্টা হয়েছিল গ্রীক দর্শনের আলোকে কুরআনের অর্থ গ্রহণ করা। গ্রীক দর্শন চিন্তাবিলাসী এবং বাস্তব ঘটনাবলীর প্রতি উদাসীন। কুরআনের বাস্তব তাৎপর্য আর গ্রীক দর্শনের এই কাল্পনিক প্রকৃতির কথা চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, মুসলমানদের উক্ত প্রচেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হওয়া অনিবার্য ছিল। তাঁদের বিফলতা থেকেই ইসলামী তমদ্দুনের প্রকৃত তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়েছে এবং ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে আধুনিক তমদ্দুনের কতকগুলো প্রধান বৈশিষ্ট্যের। গ্রীক দর্শনের বিরুদ্ধে মুসলিম চিন্ত াধারার এই বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে মনন-জগতের সব দিকেই। আমার মনে হয় গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা আর চিকিৎসাশাস্ত্রে এই বিদ্রোহ যে রূপ পেয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করার যোগ্যতা আমার নেই। আশা'রীপন্থীদের আধিবিদ্যক চিন্তাধারায় (metaphysial thought of the Asharite) এই বিদ্রোহ সুস্পষ্ট; তবে এ বিদ্রোহ সবচেয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে মুসলমাদের গ্রীক ন্যায়শাস্ত্রের (logic) সমালোচনায়। এটা স্বাভাবিক; কারণ সম্পূর্ণরূপে চিন্তামূলক এই গ্রীক দর্শনে তৃপ্তিলাভ না করার ফলে মুসলমান সত্যান্বেষীরা জ্ঞান লাভের নিশ্চিততর পথ সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। আমার মনে হয়, সংশয়কে সর্বপ্রকার জ্ঞানের প্রারম্ভ হিসেবে গ্রহণ করার নীতি নাজ্জাম প্রথম প্রবর্তন করেন। ইমাম গাযালী তাঁর 'ধর্মবিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন' নামক গ্রন্থে এই নীতির আরো ব্যাখ্যা করেন এবং 'দেকার্তীয় পদ্ধতি'র সূত্রপাত করেন। তবে গাযালী ন্যায়দর্শনে মোটামুটি এরিস্টটলপন্থীই ছিলেন। 'কিসতা' নামক গ্রন্থে তিনি কুরআনের কতকগুলো যুক্তিকে এরিস্টটলীয় আর্যায় ফেলেছেন; কিন্তু তিনি কুরআনের 'শুয়াঁ'রা' নামীয় সূরার কথা ভুলে গেছেন; নবীর বাণী অগ্রাহ্য করার ফলে শাস্তি শুরু হয়, এইমর্মে যে, কথা উক্ত সূরায় আছে সে কথাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে একের পর এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তে র সাদাসিধা বর্ণনা দিয়ে। ইশরাকী এবং ইবন-ই-তাইমিয়াই সুসংবদ্ধভাবে গ্রীক ন্যায়ের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। সম্ভবত আবু বকর রাজীই সর্বপ্রথম এরিস্টটলের প্রথম figure-এর সমালোচনা করেন। সম্পূর্ণরূপে আরোহমান (inductive) দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উপলব্ধ তাঁর আপত্তিগুলো আমাদের যুগে জন স্টুয়ার্ট মিল নতুন করে সূত্রবদ্ধ করেছেন। ইবন-ই-হাজম তাঁর 'ন্যায়শাস্ত্রের সীমা' নামক গ্রন্থে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ওপর জোর দিয়েছেন। ইবন-ই-তাইমিয়া তাঁর 'ন্যায়দর্শনের প্রতিবাদ' নামীয় গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, নির্ভরযোগ্য বিচারের (argument) একমাত্র পন্থা হচ্ছে আরোহমান বিচার (induction)।

এভাবেই নিরীক্ষা আর পরীক্ষার পদ্ধতির আবিষ্কার হয়। এ কেবল সিদ্ধান্তমূলক (theoretical) ব্যাপার ছিল না। মনস্তত্ত্বে এর প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হচ্ছে আলবেরুনীর আবিষ্কার, যাকে আমরা বলি প্রতিক্রিয়া সময় (reaction time) এবং আলকিন্দির এই আবিষ্কার ইন্দ্রিয় সংবেদনা (sensation) প্রণোদক উপাদানের (stimulus) সমপরিমাণ; পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ইউরোপীয়দের আবিষ্কার এ ধারণা ভ্রান্তিমূলক । ডুরিং বলেন যে, রজার বেকনের বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ধারণা তাঁর সমনামীয় খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের ধারণা থেকে অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ আর সুস্পষ্ট। এই রজার বেকন বিজ্ঞান শিখেছিলেন কোথায়? -স্পেনের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। বস্তুত তাঁর 'Opus Majus' গ্রন্থের বীক্ষণ নিয়ে আলোচিত ৫ম খণ্ড কার্যত ইবন-ই-হাইসাম-এর অক্ষিবিজ্ঞানের অনুকৃতি। এবং সমগ্রভাবে এ গ্রন্থে ইবন-ই-হাজমের প্রভাবের নিদর্শনেরও অভাব নেই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ইসলামী গোড়াপত্তনের কথা ইউরোপ বিলম্বে হলেও অবশেষে স্বীকৃতি দান করেছে। ব্রিফল্টের 'মেকিং অব হিউম্যানিটি' নামীয় পুস্তক থেকে আমি এখানে দু-একটা অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি :

> 'মুসলিম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের অক্সফোর্ডস্থ উত্তরাধিকারিগণের নিকটেই রজার বেকন আরবী এবং আরবীয় বিজ্ঞান শিখেছিলেন। তিনি অথবা তাঁর সম-নামীয় বৈজ্ঞানিক কেউই পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রবর্তনের কৃতিত্বের অধিকারী নন। রজার বেকন ইউরোপে মুসলিম বিজ্ঞান ও পদ্ধতির একজন প্রচারক ছাড়া অধিক কিছু ছিলেন না। তিনি এ কথা প্রচার করতে কখনও দ্বিধাবোধ করেননি যে, তাঁর সমসাময়িকদের পক্ষে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে আরবী এবং আরবীয় বিজ্ঞান শিক্ষা। পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রবর্তক কে ছিলেন, এ নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার আদি সম্বন্ধে যে বিরাট ভুল করা হয়, তারই একটা অংশ মাত্র। বেকনের সময়ে আরবদের পরীক্ষামূলক পদ্ধতি সমগ্র ইউরোপ প্রচার লাভ করেছিল এবং আগ্রহের সাথে অনুশীলিত হতো। (২০২ পৃ.)
>
> বিজ্ঞান হচ্ছে আধুনিক পৃথিবীতে আরবীয় সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান, কিন্তু এর ফল পরিপক্ব হয়েছিল বিলম্বে। মূর-সংস্কৃতি অন্ধকারের গর্ভে তলিয়ে যাবার অনেক দিন পর তার গর্ভজাত এই বিজ্ঞান সন্তানটি পূর্ণ শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কেবলমাত্র বিজ্ঞানই ইউরোপের প্রাণসঞ্চার করেনি। ইসলামী সভ্যতার অন্যান্য এবং মহুমুখী প্রভাব আধুনিক ইউরোপীয় জীবনের প্রথম উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল।' (২০২ পৃঃ)
>
> 'যদিও ইউরোপীয় প্রগতির এমন একটা ক্ষেত্র নেই যেখানে ইসলামের তামদ্দুনিক প্রভাবের সুনিশ্চিত নিদর্শন না মিলে, তবু প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের জাগরণের মতো আর কোন কিছুতেই এই প্রভাব এত সুস্পষ্ট আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর এই প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবই হচ্ছে আধুনিক জগতের স্থায়ী ও বিশিষ্ট শক্তি এবং তার জয়ের মূল উৎস।' (১৯০ পৃঃ)
>
> 'আরবীয় বিজ্ঞানের কাছে আধুনিক বিজ্ঞান শুধু যুগান্তকারী মতবাদের আবিষ্কারের

জন্যে ঋণী নয়; আরবীয় তমদ্দুনের নিকট আধুনিক বিজ্ঞান এর চেয়েও বেশি ঋণী : বিজ্ঞানের জন্মই হয়েছে আরব-সংস্কৃতির বুকে। আমরা দেখেছি, প্রাচীন জগত ছিল প্রাক-বৈজ্ঞানিক। গ্রীকদের জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিত ছিল বিদেশ থেকে আমদানী করা বস্তু এবং এগুলোর সাথে কখনই গ্রীক সংস্কৃতির পুরোপুরি সামঞ্জস্য হয়নি। বিধিবদ্ধকরণ (systematization) সামান্যকরণ (Generalization) এবং তত্ত্বীকরণ (Theorization) গ্রীকরা করেছিল, কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে গবেষণা, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আহরণ, বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম পদ্ধতি, নিরীক্ষা ও পরীক্ষামূলক পুংখানুপুংখ ও দীর্ঘায়িত অনুসন্ধান- এসব ছিল গ্রীক প্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রতিকূল। প্রাচীন যুগে বিজ্ঞান-চর্চা এক-আধটু হয়েছিল গ্রীক আমলের আলেকজান্দ্রিয়ায়। যাকে আমরা বিজ্ঞান বলি, ইউরোপে তার বিকাশ হয় একটা নতুন অনুসন্ধিৎসার ফলে; গবেষণার নতুন পদ্ধতি, পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও পরিমাণের পদ্ধতি এবং গণিতের বিকাশের ফলে। এ-সবই ছিল গ্রীকদের অজ্ঞাত। ইউরোপে এ-সবের প্রেরণা এনে দিয়েছিল আর এসব পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিল আরবরাই।' (১৯০ পৃঃ)

অতএব মুসলিম তমদ্দুনের প্রথম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে এ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সসীম বস্তুজগতের ওপর। অধিকন্তু এ-ও সুস্পষ্ট যে, ইসলামের আওতায় পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন গ্রীক চিন্তাধারার সঙ্গে আপোষের ফলে হয়নি, বরং তার সঙ্গে একটা দীর্ঘকালব্যাপী বুদ্ধিগত সংঘর্ষের ফলেই হয়েছিল। বস্তুত ব্রিফল্টের কথায় গ্রীকদের প্রবণতা ছিল প্রধানত মতবাদের দিকে, বাস্তব ঘটনাপুঞ্জের দিকে নয়। তাদের প্রভাব মুসলমানদের কুরআন-উপলব্ধিকে বরং অস্পষ্টই করে তুলেছিল এবং অন্তত দু'শতাব্দী যাবৎ আরবদের বাস্তববাদী প্রকৃতির আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং স্বস্ত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়েছিল। অতএব গ্রীক চিন্তাধারা যে কোন দিক দিয়ে মুসলিম তমদ্দুনের ধারা নির্ধারণে কার্যকরী হয়েছে, এই ভ্রান্ত ধারণার ওপর আমি আলোকপাত করতে চাই। আমার যুক্তির একাংশ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছি, অপরাংশ এখন উপস্থিত করছি।

মূর্ত বস্তু থেকেই জ্ঞানকে যাত্রা শুরু করতে হবে। মূর্ত বস্তুর বুদ্ধিগত উপলব্ধি এবং তার ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভের মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে মূর্ত বস্তুকে অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব হয়। কুরআনে বলা হয়েছে :

'হে জ্বীন ও মানবমণ্ডলী! তোমরা যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে পার তবে কর, কিন্তু কেবলমাত্র ক্ষমতার দ্বারাই তোমরা তা করতে পারবে।' (৫৫ : ৩৩)

কিন্তু সসীম বস্তুপুঞ্জের সমষ্টি হিসেবে এই বিশ্ব অবিমিশ্র শূন্যতার মধ্যে একটা দ্বীপের মতো এবং কাল-প্রবাহকে আমরা পরস্পর বহির্ভূত কতকগুলো মুহূর্ত স্বরূপ মনে করি, তবে এই কাল নিষ্ক্রিয়, অর্থহীন। বিশ্ব সম্বন্ধে এ রকম ধারণা অনুধ্যানী মনকে কোন পথ দেখাতে পারে না। সংবেদনীয় স্থান ও কালের সীমা আছে- এ কথা চিন্তা করতে মন অভিভূত হয়ে পড়ে। এইভাবে কল্পিত সসীম কর্তৃক মনের চিন্তাধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। অন্যথায় এর সীমা অতিক্রম করতে হলে মনকে অতিক্রম করতে হবে আনুক্রমিক কাল

(serial time) এবং সংবেদনীয় স্থানের অবিমিশ্র শূন্যতা। কুরআনে বলা হয়েছে : 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র অভিমুখেই তোমার সীমা নিহিত আছে।' এই আয়াতে প্রকাশ পেয়েছে কুরআনের একটা গভীরতম তত্ত্ব; কারণ এখানে সুস্পষ্টভাবে এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, চরম সীমার অনুসন্ধান করতে হবে নক্ষত্রমণ্ডলীর দেশে নয়, একটা সীমাহীন বিশ্বজীবন এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্যে। এখন, এই চরম সীমার দিকে বুদ্ধিগত অগ্রগতি দীর্ঘায়িত এবং পরিশ্রমসাধ্য; আর এই প্রচেষ্টার মধ্যেও ইসলামী চিন্তাধারার গতি গ্রীকদের চিন্ত াধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। স্পেঙ্গলার বলেছেন, গ্রীকদের আদর্শ ছিল অনুপাত, অসীমতা নয় (proportion, not infinity)। শুধু সুনির্ধারিত সীমাবিশিষ্ট সসীমের বস্তুগত উপস্থিতি নিয়েই গ্রীকদের মন ব্যাপৃত ছিল। পক্ষান্তরে মুসলিম তমদ্দুনের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, অবিমিশ্র বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্মীয় মনস্তত্ত্ব (আমার মতে যার অন্য নাম সূফীবাদ) এই দু'জগতেই যে আদর্শের সাক্ষাৎ মিলে, সে হচ্ছে অসীমকে প্রাপ্ত হওয়া এবং উপভোগ করা। এরূপ মনোভাব বিশিষ্ট তমদ্দুনের পক্ষে স্থান ও কালের সমস্যা জীবন-মরণের সমস্যার মতোই। মুসলিম দার্শনিকদের বিশেষ করে আশারীপন্থীদের কাছে স্থান ও কালের সমস্যা কিভাবে উপস্থিত হয়েছিল তার আভাস আমি ইতোপূর্বে একটি বক্তৃতায় দিয়েছি। ইসলাম জগতে ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদ কোনদিনই জনপ্রিয় না হওয়ার একটা কারণ, ইসলাম অন্য-নিরপেক্ষ (absolute) স্থান-এর ধারণা উপস্থিত করে। অতএব আশা'রী পন্থীগণ বিভিন্ন ধরনের পরমাণুবাদ গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সংবেদনীয় স্থান-এর জটিলতাগুলোকে দূর করার চেষ্টা করেছিলেন এ কালের পরমাণুবাদিগণের মতোই। গণিতের দিক দিয়ে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, টলেমী (৮৭-১৬৫ খৃঃ) থেকে নাসির তুসী (১২০১-৭৪ খৃঃ) পর্যন্ত সংবেদনীয় স্থান-এর ভিত্তিতে ইউক্লিদের অনুরূপ স্বীকার্য প্রতিজ্ঞার (parallel postulate) নিশ্চয়তা প্রতিপাদনের দুঃসাধ্যতা সম্বন্ধে কেউই গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেন নি। তুসীই সর্বপ্রথম গণিত-জগতের সহস্র বর্ষব্যাপী প্রশান্তি ভঙ্গ করেন; স্বীকার্য প্রতিজ্ঞার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি সংবেদনীয় স্থান বর্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এইভাবে যতটুকু হোক তিনি আমাদের যুগের অতিদেশ (hyperspace) আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেন। ক্রিয়ার (function) আধুনিক গাণিতিক ধারণার সমীপবর্তী হয়ে সম্পূর্ণ রকমের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলবেরুনীই বলেছিলেন যে, বিশ্ব সম্বন্ধে স্থিতিশীলতার ধারণা সন্তোষজনক নয়। এ-ও স্পষ্টতই গ্রীকদের ধারণা থেকে স্বতন্ত্র। এই ক্রিয়া-ধারণা (function idea) আমাদের বিশ্বদর্শনে কাল উপাদান সংযোজন করে। এ স্থিতকে পরিবর্তনশীল বলে প্রতীত করে এবং বিশ্বকে বিদ্যমান না দেখে পরিণতি-প্রবণ দেখে (sees the universe not as being but as becoming)। স্পেঙ্গলার মনে করেন যে, ক্রিয়ার গাণিতিক ধারণা প্রতীচ্যের প্রতীক; অন্য কোন সংস্কৃতি এর আভাসও দেয়নি। আলবেরুনী কর্তৃক ত্রিকোণমিতিক ক্রিয়া থেকে অন্য যে-কোনো প্রকার ক্রিয়ার প্রক্ষেপের নিউটনীয় ফর্মুলার সামান্যকরণ (generalization) বিচার করে দেখলে বোঝা যায়, স্পেঙ্গলারের দাবীর

কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। বিশুদ্ধ আয়তন থেকে বিশুদ্ধ সম্বন্ধে (from pure magnitude to pure relation) সংখ্যা সম্বন্ধীয় গ্রীক ধারণার পরিবর্তন বাস্তবিক পক্ষে আরম্ভ হয়েছিল খারেজমীর গণিত থেকে বীজগণিতে উপনীত হওয়া থেকে। স্পেঙ্গলার যাকে সময়ানুক্রমিক সংখ্যা বলেছেন, আলবেরুনী সুনির্দিষ্টভাবে তা আবিষ্কার করেছিলেন। এর অর্থ বিদ্যমানতা থেকে পরিণতি-প্রবণতার ধারণার দিকে চিন্তাধারার গতি পরিবর্তন। বস্তুত সাম্প্রতিক ইউরোপীয় গণিত কালকে তার জীবন্ত ঐতিহাসিক প্রকৃতি থেকে পৃথক করে দেখতে চায় এবং তাকে স্থান-এর নিছক প্রতি রূপে পরিণত করতে চায়। আইনস্টাইনের মতবাদে সময়কে দেখি গতিশীলতাহীন এবং অদ্ভুতভাবে স্থান-সদৃশ; এই কারণেই মুসলিম জ্ঞানার্থীদের কাছে তাঁর আপেক্ষিক মতবাদের চেয়ে হোয়াইটহেডের আপেক্ষিক মতবাদের আবেদন বেশী হবে।

মুসলিম জগতে গাণিতিক চিন্তাধারার প্রগতির পাশাপাশি দেখতে পাই বিবর্তনবাদের ধারাবাহিক পরিণতি। জাহিযই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে, স্থান পরিবর্তনের ফলে পক্ষী-জীবনে পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে আলবেরুনীর সমসাময়িক ইবনে মাস্কাওয়েহ্ এই মতবাদকে আরও স্পষ্ট রূপ দেন এবং আল-ফউজ-উল-আসগার নামক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আমি এখানে তাঁর বিবর্তনবাদের সারমর্ম দিচ্ছি-তার বৈজ্ঞানিক মূল্যের জন্যে নয়, মুসলিম চিন্তাধারা কোনদিকে প্রবাহিত হচ্ছিল তা দেখাবার জন্যে। ইবনে মাস্কাওয়েহ্-এর মতে, বিবর্তনের নিম্নতম স্তরে জন্ম ও পরিবর্ধনের জন্যে উদ্ভিদের কোন বীজের প্রয়োজন হয় না। বীজ থেকেও এর বংশ বিস্তার ঘটে না। খনিজ পদার্থ থেকে এই জাতীয় উদ্ভিদের পার্থক্য শুধু কিঞ্চিত সঞ্চরণ শক্তিতে। উচ্চতর অবস্থায় এই শক্তির আরও বিকাশ হয়। এর পর উদ্ভিদ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এবং বীজের মারফত বংশ বিস্তার শুরু হয়। সঞ্চরণ-শক্তি আরও বর্ধিত হলে আমরা গুঁড়ি, পাতা এবং ফল সমন্বিত উদ্ভিদের সাক্ষাৎ পাই। বিবর্তনের উচ্চতর স্তরে এর পরিবর্ধনের জন্যে শ্রেষ্ঠতর জমি এবং আবহাওয়ার প্রয়োজন হয়। বিকাশের শেষ স্তরে দ্রাক্ষলতা এবং খেজুর গাছের উদ্ভব হয়। এর পরেই প্রাণী জগতের সূত্রপাত। খেজুর গাছে যৌন পার্থক্য সুস্পষ্ট। শিকড় এবং আঁশ ছাড়াও এর এমন একটা অংশ থাকে, যা কতকটা প্রাণীদের মস্তিষ্কের মতো এবং এর অক্ষুণ্ন অবস্থার ওপর খেজুর গাছের জীবন নির্ভর করে। এই হচ্ছে উদ্ভিদ জগতের বিকাশের উচ্চতম স্তর এবং প্রাণী-জগতের পূর্বাভাস। প্রাণী-জগতের প্রথম পদক্ষেপ আরম্ভ হয় মৃত্তিকাস্থ মূলের বন্ধন ছেদনের পর। এই মূল-বন্ধন থেকে মুক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে সজ্ঞান গতিশীলতার অঙ্কুর। এই হচ্ছে প্রাণিত্বের প্রথম স্তর। প্রাণীদের স্পর্শেন্দ্রিয় সর্বপ্রথমে এবং দর্শনেন্দ্রিয় সর্বশেষে বিকশিত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পোকামাকড়, সরীসৃপ, পিঁপিলিকা এবং মৌমাছি ইত্যাদি প্রাণী সঞ্চরণের স্বাধীনতা লাভ করে। প্রাণী-জগতের পূর্ণতা লাভ হয় চতুস্পদ জাতীয় অশ্ব এবং পক্ষী জাতীয় শ্যেনের মধ্যে এবং অবশেষে বানরের মধ্যে মানবত্বের প্রান্তসীমা এসে পৌছে। বিবর্তনের ধারায় বানর মানুষের ঠিক নীচের স্তরে

অবস্থিত। এর পর আদিম অবস্থা থেকে সভ্যতায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত বিবর্তনের ফলে দৈহিক পরিবর্তন এবং বিচার বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হতে থাকে।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইরাকী এবং খাজা মুহম্মদ পারসা প্রমুখ দার্শনিকই ধর্মীয় মনস্তত্ত্বে স্থান ও কাল সমস্যার আলোচনায় অনেকখানি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সমীপবর্তী হয়েছেন। কালের স্তরবিন্যাস সম্বন্ধে ইরাকীর অভিমতের উল্লেখ আমি ইতোপূর্বে করেছি। আমি এখন আপনাদের নিকট স্থান সম্বন্ধে তাঁর অভিমত উপস্থিত করব। ইরাকীর মতে, আল্লাহ্ সম্পর্কিত স্থান-এর অস্তিত্ব কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় :

> 'তুমি কি উপলব্ধি করছ না যে আকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, আল্লাহ্ তার সম্বন্ধে জ্ঞাত? নির্জনে তিন ব্যক্তি বাক্যালাপ করে না, আল্লাহ্ চতুর্থ জন; পাঁচ জনও করে না; তিনি ষষ্ঠ জন; তার বেশি কিংবা কমও করে না, কারণ সর্বত্রই তিনি তাদের সঙ্গী।' (৫৮ : ৮)
>
> তোমরা এমন কোন বিষয়ে ব্যাপৃত থাকবে না, কিংবা কোরআনের এমন কোনো অংশ পাঠ করবে না, কিংবা এমন কোন কাজ করবে না, যার সাক্ষী আমরা হবো না। পৃথিবী অথবা আকাশের একটি পরমাণুর ওজনও আল্লাহর অজ্ঞাত নয়। এর চেয়ে এমন কোন কম অথবা বেশী ওজনও নাই। যা এই প্রাঞ্জল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নয়। (১০ : ৬২)
>
> 'আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার আত্মা তার কানে কানে যা বলে তা আমরা জ্ঞাত আছি; তার কাঁধের শিরা অপেক্ষাও আমরা তার নিকটতর্ী।' (৫০ : ১৫)

কিন্তু ভুললে চলবে না যে, সন্নিকর্ষ, সংস্পর্শ এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা এই শব্দগুলো বস্তুজগতের প্রতি প্রযোজ্য, আল্লাহর প্রতি নয়। আত্মার সাথে দেহের সম্পর্ক যেমন, আল্লাহ্র সাথে সমগ্র বিশ্ব-জগতের সম্পর্ক ও তেমনি। আত্মা দেহের ভিতরেও নেই, বাইরেও নেই; এর সন্নিকটেও নেই এবং এ থেকে বিচ্ছিন্নও নয়। তবু দেহের প্রতিটি পরমাণুর সাথে আত্মার সংস্পর্শ একটি বাস্তব সত্য এবং এর সূক্ষ্মতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোন-না-কোন প্রকার স্থান-এর কল্পনা না করে এই সংস্পর্শ ধারণা করা অসম্ভব। কাজেই আল্লাহ্র সম্পর্কে স্থান-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তবে কি ধরনের স্থান আল্লাহর অন্যনিরপেক্ষতার সাথে সুসামঞ্জস্য হতে পারে, তাই শুধু সতর্ক হয়ে আমাদের নির্ণয় করতে হবে। এখন স্থান হচ্ছে তিন প্রকার-জড় বস্তুর স্থান, অজড় সত্তাসমূহের স্থান এবং আল্লাহ্র স্থান। জড়বস্তুর স্থান তিন প্রকার। প্রথমত, যে সব স্থূল বস্তুর জন্যে স্থানের প্রয়োজন হয়, তাদের সম্পর্কিত স্থান। এ স্থান-এ সঞ্চরণের জন্যে সময়ের প্রয়োজন হয়, বস্তুসমূহ স্থান অধিকার করে থাকে এবং স্থানচ্যুতি প্রতিরোধ করে। দ্বিতীয়ত, সূক্ষ্ম বস্তু- যেমন বায়ু এবং ধ্বনি সম্পর্কিত স্থান। এখানেও বস্তুসমূহ পরস্পরকে প্রতিরোধ করে এবং তাদের সঞ্চরণকাল দিয়ে পরিমাপ করা যায়। স্থূল বস্তুপুঞ্জের কাল থেকে এই কাল স্বতন্ত্র। কোন টিউবের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাতে হলে তার মধ্যকার বায়ুকে স্থানচ্যুত করতে হবে; আর স্থূল বস্তু সম্পর্কিত কালের তুলনায় ধ্বনি-তরঙ্গের কাল তো কিছুই নয়; তৃতীয়ত আলোক-সম্পর্কিতস্থান। সূর্যালোক অবিলম্বে পৃথিবীর দূরতম অংশে বিকীর্ণ হতে পারে। আলোক এবং ধ্বনির এই

গতিবেগের মধ্যে কাল প্রায় শূন্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব এটা স্পষ্ট যে, আলোক-সম্পর্কিত স্থান বায়ু ও ধ্বনি সম্পর্কিত স্থান থেকে স্বতন্ত্র। এর চেয়েও শক্তিশালী যুক্তি কিন্তু আরেকটা আছে। প্রদীপের আলোক ঘরের বায়ুকে স্থানচ্যুত না করে সকল দিকে বিস্তৃত হয়। এতে প্রতীত হয় যে, বায়ু-সম্পর্কিত স্থান-এর চেয়ে আলোক সম্পর্কিত স্থান বেশী সূক্ষ্ম এবং বায়ু-সম্পর্কিত স্থান আলোক-সম্পর্কিত স্থান-এ প্রবেশ লাভ করতে পারে না।

এই দু'রকমের স্থান-এর মধ্যে নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে; এই কারণে বিশুদ্ধ বুদ্ধিগত বিশ্লেষণ এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ছাড়া এদের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা অসম্ভব। অধিকন্তু, গরম পানিতে আগুন এবং পানি পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে বলে মনে হয়; কিন্তু এদের ধর্ম পরস্পরের বিপরীত এই কারণে দু'টি বস্তু কখনো একই স্থানে অবস্থান করতে পারে না। এই দু'টি বস্তু সম্পর্কিত দেশের মধ্যে নিবিড় সাদৃশ্য থাকলেও এরা স্বতন্ত্র, এটা ধরে না নিলে ব্যাপারটার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু দূরত্বের উপাদান (element of distance) সম্পূর্ণ অনুপস্থিত না থাকলেও আলোক-সম্পর্কিত স্থানে পাস্পরিক প্রতিরোধের কোন সম্ভাবনা নেই। প্রদীপের আলোক কোন একটা বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছে মাত্র এবং এক প্রদীপের আলোক অন্য প্রদীপের আলোককে স্থানচ্যুত না করে শত প্রদীপের আলোক একই স্থানে পরস্পর মিশে যায়।

এইরূপে ইন্দিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ের সূক্ষ্মতা-বিশিষ্ট স্থানের বর্ণনা দিয়ে ইরাকী বিভিন্ন শ্রেণীর অশরীরী সত্তাদের (যেমন ফেরেশ্‌তাগণের) প্রধান কয়েক প্রকার স্থানের বর্ণনা দিয়েছেন। দূরত্বের উপাদান এই প্রকার স্থানে পুরোপুরি অনুপস্থিত নেই; কারণ অশরীরী সত্তাগণ অনায়াসে প্রস্তর-প্রাচীর ভেদ করে যেতে পারলেও গতিকে একেবারে বিসর্জন দিতে পারে না। ইরাকীর মতে, গতি আধ্যাত্মিকতার অপূর্ণতার পরিচায়ক। মানবাত্মা দৈহিক স্বাধীনতার চরমে উপনীত হলেও এ স্থিরও থাকে না, গতিসম্পন্নও থাকে না- তখন এর স্বরূপ হয় তুলনা রহিত। এভাবে স্থানের অগণ্য প্রকারভেদ অতিক্রম করে আমরা খোদায়ী স্থানে উপনীত হই। এ স্থান সম্পূর্ণরূপে সকল প্রকার আয়তন-বর্জিত এবং সকল অসীমতার কেন্দ্র বিন্দু।

ইরাকীর মতবাদের এই সংক্ষিপ্তসার থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন যে, যে-যুগে আধুনিক গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞানের মতবাদ ও প্রত্যয়সমূহের কোন ধারণাই লোকের ছিল না, সে যুগে একজন সংস্কৃতিবান মুসলিম সূফী কিভাবে তাঁর স্থান ও কাল সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার বুদ্ধিগত বিশ্লেষণ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ইরাকী গতিশীল স্থানের ধারণায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। স্থানের অবিচ্ছিন্ন নিঃসীমতার ধারণার সাথে তাঁর মন একটা অস্পষ্ট সংগ্রামে লিপ্ত ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন না। কারণ প্রথমত তিনি গণিতজ্ঞ ছিলেন না এবং দ্বিতীয়ত বিবর্তমান বিশ্ব সম্বন্ধে পরম্পরাগত এরিস্টটলীয় ধারণার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক পক্ষপাত ছিল। তারপর চরম সত্তার মধ্যে অতিস্থানি 'এখানে' এবং অতিশাশ্বতিক 'এখন'-এর

পরস্পর অন্তর্প্রবেশ স্থান কি কালের আধুনিক ধারণার নির্দেশ দেয়। অধ্যাপক আলেকজান্ডার তাঁর (Space, Time and Diety) গ্রন্থে বলেছেন যে, এই স্থানিক কাল সকল বস্তুর মূলীভূত। আরেকটু অন্তর্দৃষ্টি থাকলে ইরাকী বুঝতে পারতেন যে, স্থান ও কালের মধ্যে কালই অধিকতর মৌলিক। অধ্যাপক আলেকজান্ডারকে অনুসরণ করে কালকে স্থানের মানস বললে তা নিছক উপমা অলঙ্কার হবে না। বিশ্বের সাথে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধকে ইরাকী দেহের সাথে আত্মার সম্বন্ধের অনুরূপ মনে করেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার মৌলিক এবং জাগতিক দিকগুলোর দার্শনিক আলোচনা করার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হননি, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি একে স্বতঃসিদ্ধের মতো ধরে নিয়েছেন। স্থান ও কালকে একটা বিলীয়মান বিন্দু-মুহূর্তে পরিণত করাই যথেষ্ট নয়। দর্শনের যে-পথ বিশ্বের সর্বব্যাপী মানসরূপী আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছিয়ে দেয়, তা নিহিত রয়েছে জীবন্ত চিন্তনকে স্থানিক কালের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে আবিষ্কার করার মধ্যে। ইরাকীর চিন্তাধারা নিঃসন্দেহে সঠিক পথেরই অভিমুখী হয়েছিল, কিন্তু তাঁর এরিস্টটলীয় সংস্কার এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অভাববশত তাঁর প্রগতি প্রতিরুদ্ধ হয়েছিল। তাঁর মতে, ঐশী কাল সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন-বর্জিত; স্পষ্টতঃই সজ্ঞান অভিজ্ঞতার যথেষ্ট বিশ্লেষণের অভাবেই তাঁর এরূপ ধারণা গড়ে উঠেছিল। এই কারণে ঐশী কাল এবং আনুক্রমিক কালের সম্বন্ধ নির্ণয় তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল এবং এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে অবিচ্ছিন্ন সৃষ্টিধারা, যার অর্থ প্রবর্ধমান বিশ্ব-এই খাঁটি ইসলামী ধারণায় উপনীত হওয়াও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

এইভাবে সকল মুসলিম চিন্তাধারাই বিশ্বের গতিশীলতার ধারণায় এসে মিলিত হয়েছে। কুরআনে প্রাণী-জগতের বিবর্তন সম্বন্ধে ইবনে মাস্কাওয়েহ্-এর মতবাদ এবং ইতিহাস সম্বন্ধে ইবনে খালদুনের অভিমত এই ধারণায় গতিবেগ সঞ্চার করেছে। কুরআনে ইতিহাস (আল্লাহর দীন)-কে জ্ঞানের তৃতীয় উৎস বলে নির্দেশ করা হয়েছে। কুরআনের একটা প্রধান শিক্ষা এই যে, জাতিসমূহকে সমষ্টিগতভাবে বিচারাধীন করা হয় এবং পৃথিবীতেই তাদেরকে দুস্কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। প্রমাণ স্বরূপ কুরআনে সর্বদাই ঐতিহাসিক উদাহরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং মানুষের অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতার প্রতি অবহিত হতে বলা হয়েছে :

> 'অতীতে আমরা আমাদের নিদর্শনসহ মূসাকে প্রেরণ করেছি এবং তাঁকে বলেছি : জনগণকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে এসো এবং আল্লাহর দীন (ইতিহাসের শিক্ষা) সম্বন্ধে তাদেরকে অবহিত করে দাও। নিশ্চয়ই এর মধ্যে সহিষ্ণু এবং কৃতজ্ঞ লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (১৪ : ৫)

> 'এবং সৃষ্ট মানব জাতির মধ্যে এরূপ জনমণ্ডলী আছে যারা অন্যদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করে এবং তদনুযায়ী ন্যায়সঙ্গত কর্মসম্পাদন করেন কিন্তু যারা আমাদের নিদর্শনপুঞ্জকে মিথ্যা মনে করে তাদেরকে আমরা ক্রম ক্রমে এমন উপায়ে অবনতি করি, যা তারা জানে না; এবং তাদের মেয়াদ বর্ধিত করলেও নিশ্চয়ই আমার কৌশল অব্যর্থ।' (৭ : ১৮১)

'তোমাদের আগে অনেক দৃষ্টান্তের সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করে দেখ, যারা আল্লাহর নির্দেশসমূহকে মিথ্যা মনে করেছিল তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (৩ : ১৩১)

'যদি তোমাদের গায়ে কোন জখম হয়ে থাকে, তবে (মনে রেখো) অমন জখম আরও অনেকের ভাগ্যে ঘটেছে। আমরা জাতিসমূহকে পর্যায়ক্রমে সুদিন ও দুর্দিন দিয়ে থাকি।' (৩ : ১৩৪)

'প্রত্যেক জাতিরই নির্দিষ্ট জীবনকাল আছে।' (৭ : ৩২)

শেষ আয়াতটি অল্প কথায় এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের উদাহরণ। এর থেকে মনে হয়, মানব-সমাজের জীবনকে জৈব বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানের পরীক্ষার বিষয়ীভূত করা যেতে পারে। অতএব কুরআনে কোন ঐতিহাসিক মতবাদের অঙ্কুর নেই, এ ধারণা নিতান্ত ভুল। বস্তুত ইবনে খালদুনের ভূমিকার পশ্চাতে কুরআনের প্রেরণাই সবচেয়ে বেশী সক্রিয় ছিল বলে মনে হয়। এমন কি, চরিত্র-বিচারের দিক দিয়েও তিনি কুরআনের কাছে কম ঋণী নন। উদাহরণস্বরূপ জাতি হিসেবে আরবদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নিয়ে লিখিত তাঁর দীর্ঘ অনুচ্ছেদটির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সমগ্র অনুচ্ছেদটি কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতগুলোর বিশদীকরণ মাত্র :

'মরুচারী আরবগণ বিশ্বাসহীনতায় এবং কাপট্যে স্থির-সংকল্প; এবং এটাই অধিক সম্ভব যে, রসূলগণের নিকট প্রেরিত আল্লাহর বাণীর প্রতি তারা উদাসীন হয়ে থাকবে; এবং আল্লাহ জ্ঞাতা ও জ্ঞানী।'

'মরুচারী আরবদের অনেকে আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যয় করে মনে করে যে, তোমার ভাগ্যের পরিবর্তন হবে : পক্ষান্তরে তারাই দুর্দশাগ্রস্ত হবে। আল্লাহ শ্রোতা এবং জ্ঞাতা।' (৯ : ৯৮-৯৯)

যা-ই হোক, জ্ঞানের অন্যতম উৎস হিসেবে ইতিহাসের প্রতি কুরআনের অভিনিবেশ কেবলমাত্র ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নির্দেশেই সীমাবদ্ধ নয়; ঐতিহাসিক সমালোচনার অন্যতম মৌলিক নীতি কুরআন আমাদের দান করেছে। অন্যতম বিজ্ঞান হিসেবে ইতিহাসের অপরিহার্য শর্ত এই যে, এর উপাদানসমূহ যথার্থতার সাথে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং ঘটনাবলী সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান নির্ভর করে শেষ পর্যন্ত ঘটনা বর্ণনাকারীদের ওপর। অতএব ঐতিহাসিক সমালোচনার সর্বপ্রথম মৌলিক নীতি হচ্ছে এই যে, বর্ণনাকারীর সাক্ষ্য বিচারের সময় তার ব্যক্তিগত চরিত্রের কথাও বিবেচ্য। কুরআনে বলা হয়েছে :

'হে বিশ্বাসীগণ, যদি কোন মন্দ-স্বভাব ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন বিবরণ নিয়ে আসে, তবে তৎক্ষণাৎ তাকে নিঃসন্দেহ করে নাও।' (৪৯ : ৬)

রসূলের হাদীস বর্ণনাকারীগণের প্রতি এই আয়াতে বর্ণিত নীতি প্রয়োগের ফলেই ঐতিহাসিক সমালোচনার কানুনগুলো ক্রমে ক্রমে সংগঠিত হয়েছিল। মুসলিম জগতে ঐতিহাসিক অনুভূতির বিকাশ একটা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। অভিজ্ঞতার প্রতি কুরআনের

অঙ্গুলি নির্দেশ, রসূলের যথার্থ বাণী নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা এবং ভাবীকালের জন্যে প্রেরণার স্থায়ী উৎসের সংরক্ষণ- এসবের তাগিদেই ইবনে তাবারী এবং মাসুদীর মতো প্রতিভার জন্ম হয়েছিল। কিন্তু একটা প্রকৃত বিজ্ঞানরূপে গড়ে ওঠার প্রথম স্তরে পাঠকের কল্পনা-উদ্দীপক শিল্প হিসেবেই ইতিহাস গড়ে ওঠে। ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্যে প্রয়োজন বিস্তৃততর অভিজ্ঞতা, বাস্তব বিচার-বুদ্ধির অধিকতর পরিপক্কতা এবং শেষত জীবনকেও কালের প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলো মৌলিক ধারণার পূর্ণতর উপলব্ধি। এই ধারণা প্রধানত দু'টি এবং দু'টিরই সঙ্গে কুরআনের শিক্ষার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য।

১. মানবজাতির আদি উৎসের একত্ব। কুরআনে বলা হয়েছে : 'এবং আমরা তোমাদের সকলকে একই শ্বাসবায়ু থেকে সৃষ্টি করেছি।' কিন্তু জীবনের অখণ্ডতা বিলম্বে উপলব্ধ হয় এবং এর বিকাশ নির্ভর করে পৃথিবীর ঘটনা-প্রবাহের সাথে সংযোগের ওপর। অতি দ্রুত একটা বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এই সুযোগ মুসলমানেরা পেয়েছিল। অবশ্য ইসলামের পূর্বে খৃস্টান ধর্ম মানুষকে সাম্যের বার্তা শুনিয়েছিল, কিন্তু খৃস্টান রোম সাম্রাজ্য সমগ্র মানব সমাজকে একটা জৈব সত্তা রূপে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। ফ্লিন্ট যথার্থই বলেছেন : 'সমগ্র মানব-সমাজের অখণ্ডত্ব সম্বন্ধে সাধারণ এবং অস্পষ্ট ধারণার অতিরিক্ত একটা গভীরতর উপলব্ধির কৃতিত্ব কোন খৃস্টান লেখককেই দেওয়া যেতে পারে না, রোম সাম্রাজ্যের অন্য কাউকে তো দেওয়া যেতেই পারে না।'

'রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরও এই চিন্তাধারা যে ইউরোপে গভীরতর এবং বদ্ধমূল হয়েছে তাও মনে হয় না। পক্ষান্তরে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের জিগিরমুখর আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের বিকাশের ফলে ইউরোপীয় সাহিত্য ও শিল্পকলায় উদার মানবতাবোধের বিনাশের সম্ভাবনাই বরং দেখা গিয়েছে। মুসলিম জগতে এর বিপরীত ব্যাপার ঘটেছে। এখানে এই চিন্তাধারা কোন শুষ্ক দার্শনিক প্রত্যয়ও নয় কিম্বা নিছক কাব্যিক স্বপ্নও নয়। সামাজিক আন্দোলন হিসেবে ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল এই চিন্তাধারাকে মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনের উপাদানে পরিণত করা এবং এইভাবে নিঃশব্দে ও অজ্ঞাতসারে একে পূর্ণতর পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া।

২. কালের বাস্তবতা সম্বন্ধে একটা তীক্ষ্ণ অনুভূতি এবং জীবন যে কালের বুকে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ-এই ধারণা। জীব-জগৎ ও সময়ের এই ধারণা ইবনে খালদুনের ইতিহাস পর্যালোচনার একটি প্রধান লক্ষণীয় বস্তু। এই জন্যই ফ্লিন্ট প্রশংসা করে বলেছেন : 'প্লেটো, এ্যারিস্টটল, অগাস্টাইন, এঁরা তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না এবং অন্যদের নাম তাঁর নামের সঙ্গে উল্লেখ পর্যন্ত করা চলে না।' উপরে আমি যে মন্তব্য করেছি তার উদ্দেশ্য ইবনে খালদুনের মৌলিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করা নয়। আমার মোটামুটি বক্তব্য এই যে, ইসলামী তমদ্দুনের কথা বিবেচনা করলে বলতে হয়, একমাত্র মুসলমানের পক্ষেই ইতিহাসকে কালের বুকে একটা অবিচ্ছিন্ন সমষ্টিগত প্রগতি হিসেবে এবং একটা অনিবার্য বাস্তব বিবর্তন হিসেবে বিচার করা সম্ভব; এই ইতিহাস পর্যালোচনার লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ইবনে খালদুন কিভাবে পরিবর্তন ধারাকে উপলব্ধি

করেছেন। তাঁর এই উপলব্ধির গুরুত্ব অপরিসীম; কেননা এর অর্থ এই যে, কালগত প্রগতি হিসেবে ইতিহাস নিছক সৃষ্টিধর্মী প্রগতি এবং এই প্রগতি পূর্ব নির্ধারিত নয়। ইবনে খালদুন তত্ত্ব-দার্শনিক ছিলেন না, বস্তুত তিনি তত্ত্ব-দর্শনের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন; কিন্তু তাঁর কাল উপলব্ধির কথা বিবেচনা করে তাঁকে অনায়াসে বার্গসঁ'র (Bergson) পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে। ইসলামী তমদ্দুনের ধারায় এর পূর্ববর্তী চিন্তাধারা সম্বন্ধে আমি ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। কুরআনে 'দিবারাত্রির আবর্তন-কে 'প্রত্যেক মুহূর্তে নবতম মহিমায় প্রকাশমান' পরম সত্তার প্রতীক বলা হয়েছে; মুসলিম দর্শনে কালকে বিষয়কেন্দ্রিক-রূপে ধারণা করা হয়েছে; ইবনে মাস্কাওয়েহ্ প্রাণী-জগতের বিবর্তন-ধারা লক্ষ্য করেছেন এবং প্রকৃতির পরিবর্তন ধারা একটা পরিণতির অভিমুখী-আলবিরুনী এই ধারণার নিকটবর্তী হয়েছেন; এসব চিন্তাধারাই ইবনে খালদুন উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি যে তমদ্দুনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান, তার মর্মরূপকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই উপলব্ধিকে ভাষায় সুশৃঙ্খল রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভাদীপ্ত রচনাবলীতে ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার বিরোধী কুরআন গ্রীক চিন্তাধারার ওপর বিজয়ী হয়েছে; কারণ, হয় প্লেটো এবং জেনোর অনুসরণে গ্রীকরা কালকে অবাস্তব মনে করত, নয় হেরাকিটাস ও স্টোয়িকদের (Stoics) অনুসরণে তারা একে চক্রবৎ পরিবর্তনশীল বলে মনে করত। সৃষ্টিধর্মী প্রগতির অগ্রগমন বিচারার্থে যে কোন মানদণ্ডেই কল্পনা করা হোক না কেন এই প্রগতিকে যদি চক্রধর্মী মনে করা হয় তবে এ আর সৃষ্টিধর্মী থাকতে পারে না। চিরন্তন পৌনঃপুনিকতা চিরন্তন সৃষ্টিক্রিয়া নয়; এ হচ্ছে চিরন্তন পুনরাবৃত্তি।

মনন-জগতে গ্রীক দর্শনের বিরুদ্ধে ইসলামের বিদ্রোহের তাৎপর্য আমরা এবার বুঝতে পারব। কেবল ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রেই যে এই বিদ্রোহের পতাকা উড়েছিল, তাতে বোঝা যায় যে, গ্রীক দর্শনের আলোকে ইসলামের ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কুরআনের ক্লাসিক্যাল-বিরোধী প্রকৃতিই জয়ী হয়েছিল।

স্পেঙ্গলারের 'পাশ্চাত্যের অবনতি' (The Decline of the West) নামক বহুলপ্রচারিত গ্রন্থ যে গুরুতর ভ্রান্তধারণার সৃষ্টি করেছে, এবার তা খণ্ডন করা দরকার। তাঁর গ্রন্থে আরব তমদ্দুন নিয়ে আলোচিত দু'টি অধ্যায় এশিয়ার তমদ্দুন আলোচনার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ইসলাম ও মুসলিম তমদ্দুনের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে তিনি অধ্যায় দু'টি লিখেছেন। স্পেঙ্গলারের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় (থিসিস) এই যে, প্রত্যেক তমদ্দুনই একটা বিশেষ জৈবধর্মী সৃষ্টি পূর্বগামী অথবা অনুগামী তমদ্দুনসমূহের সাথে তার কোনোই সংস্পর্শ নেই। বস্তুত তাঁর মতে, প্রত্যেক তমদ্দুনের একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আছে যা অন্য তমদ্দুন-অনুসারীর পক্ষে অর্জন করা একেবারেই অসম্ভব। এই থিসিস প্রমাণের আগ্রহে তিনি অসংখ্য প্রমাণ ও ভাষ্যের আশ্রয় নিয়েছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন যে, ইউরোপীয় তমদ্দুনের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে ক্লাসিক্যালবিরোধী এবং এই ক্লাসিক্যালবিরোধী তমদ্দুন সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় প্রতিভারই বৈশিষ্ট্য। এর

পেছনে ইসলামী তমদ্দুনের কোনোই প্রেরণা নেই এবং স্পেঙ্গলারের মতে, ইসলামী তমদ্দুন সম্পূর্ণরূপে ম্যাজিয়ান-ধর্মী। আমার মতে, আধুনিক তমদ্দুনের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত যথার্থ। কিন্তু আমার বক্তৃতাবলীতে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, আধুনিক জগতে ক্লাসিক্যাল-বিরোধী মনোভাবের মূলে আছে গ্রীক দর্শনের বিরুদ্ধে ইসলামের বিদ্রোহ। স্পষ্টতই এই অভিমত স্পেঙ্গলার গ্রাহ্য করবেন না; কারণ, যদি এটা দেখানো সম্ভব হয় যে, আধুনিক জগতের ক্লাসিক্যাল-বিরোধী মনোভাবের পেছনে এর পূর্বগামী তমদ্দুনের প্রেরণা বর্তমান, তা হলে তমদ্দুনসমূহের স্বাধীন বিকাশের ভিত্তির ওপর স্থাপিত তাঁর সমস্ত যুক্তি সৌধই ভূমিসাৎ হয়ে পড়ে। আমার মনে হয়, এই থিসিস প্রমাণের আগ্রহ স্পেঙ্গলারের দৃষ্টিভঙ্গীকে বিকৃত করে ফেলায় তিনি ইসলামী তমদ্দুনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি। 'ম্যাজিয়ান তমদ্দুন ' বলতে স্পেঙ্গলার ইহুদী, প্রাচীন চ্যালডিয়ান, প্রথম যুগের খৃস্টান জোরোয়াস্ত্রীয়ান এবং ইসলাম-এই ম্যাজিয়ান শ্রেণীর ধর্মগুলোর বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত তমদ্দুনকে বোঝাচ্ছেন। ইসলামের ওপর একটা ম্যাজিয়ান স্ত র যে জমেছে তা আমি অস্বীকার করি না। বস্তুত আমার এই সব বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে সেই ম্যাজিয়ান-প্রভাবমুক্ত ইসলামের মর্মরূপকে পরিস্ফুট করে তোলা। আমার মতে, ইসলামের এই ম্যাজিয়ান-প্রভাবমুক্ত স্বরূপ স্পেঙ্গলারের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কাল সমস্যা নিয়ে যে মুসলিম চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে, সে সম্বন্ধে এবং যেভাবে ইসলামের ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় স্বাধীন অভিজ্ঞতার কেন্দ্র স্বরূপ 'আমি' স্ফূর্তি লাভ করেছে, সে-সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা বিস্ময়কর । মুসলিম চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতার ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে কালের আদি ও অন্ত সম্বন্ধে সাধারণ্যে প্রচলিত সেকেলে বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশের পক্ষপাতী । একবার ভেবে দেখুন যে, তাঁর মত মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ইসলামের তথাকথিত অদৃষ্টবাদের সমর্থনে 'আইয়ামের গরদিশ' ও 'সবকিছুরই সময় আছে' ইত্যাদি প্রাচ্যদেশীয় প্রবচনের উদাহরণ দেন। যা-ই হোক, ইসলামের ইতিহাস কালের ধারণার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট মানবাত্মা নিয়ে আমি যথেষ্ট আলোচনা করেছি। ইসলাম আর এর আশ্রয়ে বর্ধিত তমদ্দুন সম্বন্ধে স্পেঙ্গলারের পূর্ণ সমালোচনা করতে হলে একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইতোপূর্বে যা বলেছি তার পরে সাধারণভাবে আমি এখানে আর একটা কথা বলতে চাই।

স্পেঙ্গলার বলেন :

> 'ভবিষ্যদ্বক্তাগণের বাণী ম্যাজিয়ান-ধর্মী। একজন খোদা আছেন- তিনি জ্যেহোভা হোন, আহুরামজদা হোন অথবা মারদুক-বাল হোন, তিনি মঙ্গলের অধিপতি এবং অন্যান্য দেবতা হয় অকর্মা, না হয় অমঙ্গলকারক। এই বিশ্বাসের সঙ্গে এই আশাও পোষণ করা হতো যে, একজন পরিত্রাতার আবির্ভাব হবে। খৃষ্টধর্মে এটা পরিষ্কার। অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের তাকিদে পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে এরূপ মনোভাব সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছিল। ম্যাজিয়ান ধর্মের এ হচ্ছে গোড়ার কথা, কারণ এর পেছনে

মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে সংগ্রামের ধারণা বর্তমান। মধ্যবর্তী জামানায় অমঙ্গল প্রাধান্য লাভ করবে, কিন্তু অবশেষে বিচারের দিনে মঙ্গল বিজয়ী হবে।'

যদি এই অভিমত ইসলাম সম্বন্ধেও পোষণ করা হয়, তবে স্পষ্টতই এ হবে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা। এখানে লক্ষণীয় এই যে, ম্যাজিয়ানগণ অপদেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে, অবশ্য এরূপ দেবতার উপাসনা তারা করে না। পক্ষান্তরে ইসলাম এরূপ দুষ্ট দেবতার আদৌ কোন অস্তিত্বই স্বীকার করে না। ইসলামে নবুয়তের অবসান-বিষয়ক অভিমতের তমদ্দুনিক তাৎপর্য স্পেঙ্গলার বুঝতে পারেন নি। অবশ্য ম্যাজিয়ান তামদ্দুনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জরথুস্ত্রের অজাত সন্তান, পরিত্রাতা অথবা বাইবেলের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত শান্তিকর্তার জন্যে শাশ্বত প্রতীক্ষা। যাঁরা ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে ইচ্ছুক, তাঁদেরকে কোন্ পথে ইসলামের অবসানবাদের অর্থ খুঁজতে হবে, সে সম্বন্ধে আমি ইতোপূর্বেই দিক-নির্দেশ করেছি। ইসলামের এই অবসানবাদ ম্যাজিয়ান মানসিকতার শাশ্বত প্রতীক্ষা-রোগের প্রতিষেধক ঔষধ বলা যেতে পারে। এরূপ প্রতীক্ষা ইতিহাস সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে। ম্যাজিয়ান চিন্তাধারার প্রভাবে ইসলামে অনুরূপ প্রতীক্ষাবাদের কিঞ্চিৎ ছোঁয়াচ লেগেছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইসলামে যে অমন নতুন কারো আবির্ভাবের কথা নেই, এ কথা ইবনে খালদুন অকুণ্ঠ কণ্ঠে প্রচার করে গেছেন।

ছয়

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় গতিশীলতা

পুরাকালে ধারণা ছিল যে, বিশ্বজগৎ স্থিতিশীল। ইসলাম তার সাংস্কৃতিক প্রগতির ক্ষেত্রে এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বিশ্বজগৎ গতিশীল এই-ই তার সিদ্ধান্ত। ইসলাম তার প্রবুদ্ধ নীতি দ্বারা বিশ্ব মানবকে এক করতে চায়। এই একত্রীকরণ কাজে মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ইসলাম এক মর্যাদাময় আসন দিয়েছে; রক্ত-সম্বন্ধকে সে মানব ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে নি। রক্ত-সম্বন্ধের আকর্ষণ মাটির দিকে। মানব ঐক্যের একটি অবিমিশ্র দার্শনিক ভিত্তির সন্ধান মাত্র তখনই সম্ভব হতে পারে যখন আমরা দৃঢ় প্রতীতির সাথে মনে করতে পারি যে, সকল মানুষের জীবনের মূল উৎস আধ্যাত্মিক। এ প্রতীতিই আমাদের নতুনতর আনুগত্যের জন্ম দেয়, যা কোনরূপ আচার-অনুষ্ঠান ছাড়াই বেঁচে থাকে এবং মানুষকে ধরণীর বন্ধন থেকে মুক্তি পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। খৃস্টধর্মের প্রাথমিক বিকাশ ছিল সন্ন্যাসবাদমূলক ও জীবন-বিমুখ, তবুও সম্রাট কন্‌স্টান্টাইন তাকে জাতীয় একতা গঠনের কাজে নিয়োজিত করতে চেষ্টিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তিনি অকৃতকার্য হন। সম্রাট জুলিয়ান অগত্যা পুরাতন রোমীয় দেব-দেবীদের আশ্রয় নিয়ে তাঁদের মুখে নতুন দার্শনিক মুখোশ পরাবার চেষ্টা করেন। বিশ্ব-মঞ্চে ইসলামের অভ্যুদয়ের সমকালীন সভ্য জগতের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন আধুনিক ঐতিহাসিক বলেছেন :

> 'চার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা সভ্যতা তখন ভাঙনের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হচ্ছিল। আইন ও শৃঙ্খলার অতীত, পরস্পর-শত্রু ভাবাপন্ন আদিম মানবগোষ্ঠীর বর্বর সমাজের প্রত্যাবর্তন যেন ঘনিয়ে এসেছিল। অথচ পুরাতন গোষ্ঠীগত রীতি-নীতির প্রভাবও তখন বিলুপ্ত। পুরাকালীন সম্রাটদের শাসন পদ্ধতিও আর কার্যকরী ছিল না। খৃস্টধর্ম প্রবর্তিত নতুন আইন-কানুন একতা ও শৃঙ্খলার পরিবর্তে পরস্পরের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন নতুন নতুন দল-উপদল সৃষ্টি করে চলেছিল। বিশ্বের ইতিহাসে তা হল এক পরম দুঃসময়। এককালে যে সভ্যতা-বৃক্ষ বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে নিজ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছিল, শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানের সোনার ফসল চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল, তার মূল এখন আর ভক্তি ও অনুরাগের অর্ঘে সঞ্জীবিত হচ্ছিল না। তার কাণ্ড পতনোন্মুখ অবস্থায় কোনোক্রমে দাঁড়িয়েছিল, তার অন্তস্থলে পচন ধরেছিল, যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘূর্ণি তাকে অনবরত ধাক্কা দিচ্ছিল। শুধুমাত্র কতকগুলো মরিচা-পড়া পুরাতন নীতি ও বিধানের শৃঙ্খলে জড়িয়ে এ বিরাট মহীরূহ চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিন গুণছিল। মানব

> জাতিকে আবার একত্বের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে সমবেত করতে এবং এই ভাঙন-মুখর সভ্যতাকে রক্ষা করতে একটা ভাবাবেগমূলক সংস্কৃতির অভ্যুদয়ের তখন একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এ সংস্কৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠতার জন্যে দরকার ছিল নতুন পলিমাটির আস্তরণের; কেননা পুরাতন রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান তখন সম্পূর্ণ মৃত এবং সেই একই ধরনের নতুন আচার-অনুষ্ঠান গড়ে তোলা আবার শতবর্ষের কাজ ছিল।

লেখক তারপর ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, জগৎ তখন এমন একটি নতুন সংস্কৃতির অপেক্ষা করছিল, যা তাকে তখনকার রাজ-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থা এবং রক্ত-সম্বন্ধের ওপর নির্ভরশীল মানব ঐক্যের পদ্ধতি থেকে অব্যাহতি দেবে। তারপর তিনি পরমাশ্চর্য বোধ করেছেন যে, ঠিক এই পরম প্রয়োজনের মুহূর্তেই আরব দেশে একটি সংস্কৃতির অভ্যুদয় হয়। আসলে এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই। জগৎ-জীবন স্বভাব বশেই নিজ প্রয়োজন বুঝতে পারে এবং সঙ্কট মুহূর্তে আপন গতির দিক্ নির্দেশ দেয়। ধর্মীয় পরিভাষায় আমরা যাকে 'প্রত্যাদিষ্ট বাণী' বলি, এ তাই। এটি একান্ত স্বাভাবিক যে, পুরাতন সভ্যতাবলীর সাথে যোগাযোগহীন সরল, প্রকৃতিসম্পন্ন আরববাসীর অন্তরেই এই নবতম বিধান প্রথম সাড়া জাগাবে। ভৌগোলিক দিক থেকেও আরব দেশই এ উন্মেষের প্রশস্ততর ক্ষেত্র ছিল, কেননা তিনটি মহাদেশের মিলন-স্থলে এর অবস্থিতি। এ নতুন সংস্কৃতির বিশ্ব ঐক্যের ভিত্তি হল 'তওহীদ' বা আল্লাহ্র একত্ববাদ। এই নীতিকে মানুষের চিন্তা-জগতে ও ভাব-জগতে জীবন্ত রূপ দেওয়াই কার্যত ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্র বিধানের সবচেয়ে বড় কাজ। ইসলাম দাবী করে একমাত্র আল্লাহ্র আনুগত্য, কোনো সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য নয়। আর যেহেতু আল্লাহ্-ই সমগ্র জীব-জগতের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির মূল নিদান, আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য বস্তুত মানুষের আপন আদর্শ প্রকৃতির প্রতি আনুগত্যেরই নামান্তর। ইসলামের মতে, সর্বপ্রকার জীবনের আসল আধ্যাত্মিক ভিত্তি হচ্ছে অবিনশ্বর; সে আধ্যাত্মিক ভিত্তি আত্ম-প্রকাশ করে বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। অন্য কথায়, জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি পরিবর্তনশীল ও অবিনশ্বর। বাস্তব সত্তার এরূপ ধারণার ওপর যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত, তাকে স্থিতি ও গতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতেই হবে। সামগ্রিক জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্যে এ সমাজের চাই কতকগুলো অপরিবর্তনীয় নীতি সূত্র; কারণ এ চিরপরিবর্তনশীল জগতে একমাত্র অপরিবর্তনীয় নৈতিক ভিত্তিমূলেই আমরা দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে পারি। কিন্তু এইসব চিরন্তন নীতি-সূত্রের মধ্যে বিশ্ব প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতার চির সম্ভাবনার স্থান রাখতে হবে। কুরআনের মতে, আল্লাহ তায়ালার চিহ্নসমূহের একটি মহত্তম প্রকাশ রয়েছে বিশ্ব-জগতের পরিবর্তনশীলতায়। একে অস্বীকার করার অর্থ জীবনকে অস্বীকার করা এবং সাথে সাথে যার প্রকৃতি মূলত গতিশীল, তাতে গতিহীনতা আরোপ করা। চিরন্তন নীতিতে দৃঢ়মূল নয় বলে ইউরোপ রাজনৈতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানে অকৃতকার্যতা বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। চিরন্তনের সাথে

পরিবর্তনের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেনি বলে বিগত পাঁচশত বছর ইসলাম অচলাবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এখন দ্রষ্টব্য : ইসলামী ব্যবস্থায় গতিশীলতার নীতি কি? তা হল 'ইজতিহাদ'।

ইজতিহাদের শাব্দিক অর্থ 'প্রচেষ্টা'। ইসলামী আইনের পরিভাষায় এর পূর্ণ তাৎপর্য হল : কোনো আইনগত প্রশ্ন সম্পর্কে স্বাধীন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যে গভীর উদ্যম ও চেষ্টার প্রয়োগ। আমার বিশ্বাস, ইজতিহাদের ধারণা জন্মলাভ করেছে কুরআনের নিম্নোক্ত প্রখ্যাত বাক্যটি থেকে : "এবং যারা সযত্ন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে তাদের আমরা পথ দেখাই।" রসূলুল্লাহ্‌র একটি হাদীস বাণীতে এ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। মা'আয যখন ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, তখন হযরত তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তাঁর কাছে বিচারার্থে উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর সমাধানে তিনি কি নীতি অবলম্বন করবেন । মা'আয উত্তর করলেন : "আমি আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ অনুসারে তা করব।" হযরত আবার জিজ্ঞেস করলেন : যদি তেমন কোনো নজীর না থাকে? মা'আয বললেন : তা হলে আমি নিজ বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করব।" মুসলিম ইতিহাসের পাঠকেরা অবশ্য এ কথা ভালোভাবেই জানেন যে, ইসলামের রাষ্ট্রীয় সম্প্রসারণের সাথে সাথে মুসলিম আইনের একটি শৃঙ্খলায়িত সমাহারের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হতে থাকে। এ প্রেরণাতেই আমাদের প্রাথমিক আরবীয় ও অনারবীয় আইন বিশেষজ্ঞগণ পরম উদ্যমে তৎকালীন লভ্য জ্ঞানরাজি সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের আজীবন সাধনায় তাঁরা প্রভূত আইনগত তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তারই প্রয়োগের ফলে আমাদের জনমান্য মযহাবগুলোর অভ্যুদয় ঘটে। এই মযহাবগুলোতে তিন পর্যায়ের ইজতিহাদ স্বীকৃত হয়েছে। প্রথম : আইন-প্রণয়ন ক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকার। এটি কার্যত মযহাব প্রতিষ্ঠাতাদের হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় : কোন বিশিষ্ট মযহাবের সীমানার মধ্যে শর্তসাপেক্ষ অধিকার। তৃতীয় : প্রতিষ্ঠাতারা যে ক্ষেত্রে কিছুই বিধিবদ্ধ করে যান নি, সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যাপারে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের সীমাবদ্ধ অধিকার। আজকের বক্তৃতায় আমার বিবেচ্য হল প্রথম পর্যায়ের অধিকার অর্থাৎ আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকার। সুন্নী সম্প্রদায় ইজতিহাদের এ পর্যায়কে অসম্ভব মনে করেন না। কিন্তু পূর্ণ ইজতিহাদকে এমন সব কঠিন শর্ত দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে যে, কার্যত কোনো একজন মানুষের জীবনে সেসব শর্ত পালন সম্ভব নয়। ফলে বিভিন্ন মযহাবের সৃষ্টির পর থেকে এর পথ প্রকৃতপক্ষে রুদ্ধ হয়েই রয়েছে। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনে জগৎ জীবনের মৌলিক গতিধর্মিতা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এটা অত্যন্ত অদ্ভুত যে, কুরআনেরই পটভূমিতে গড়ে ওঠা একটি আইন পদ্ধতিকালে এতখানি আড়ষ্টতা অবলম্বন করবে। অতএব, আর অধিক অগ্রসর হবার আগে, যে যে কারণে ইসলামী আইনকে কার্যক্ষেত্রে এভাবে পঙ্গু করে রাখবার মানসিকতার সৃষ্টি হল, সেসব কারণ অনুসন্ধান করাই আমাদের প্রয়োজন। কোন কোন ইউরোপীয় লেখক মনে করেন যে,

ইসলামী আইনের এ স্থানুভাব তুর্কিদের প্রভাব থেকে এসেছে। এ ধারণাটি নিতান্ত অসার; কেননা মুসলিম ইতিহাসে তুর্কি প্রভাব অনুভূত হবার অনেক আগে থেকেই ইসলামী মযহাবগুলোর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল। আমার মতে প্রকৃত কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. ইতিহাস পাঠকের উত্তম রূপে জানা আছে যে, আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে মুসলিম ধর্ম ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের সকল অভ্যুদয় অনেক তিক্ত বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। উদাহরণত একটি প্রধান বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক্। রক্ষণশীল দল কুরআনের চিরন্তনতাকে অবধারিত মনে করতেন। যুক্তিবাদীরা এটি অস্বীকার করলেন; তাঁরা বললেন, খৃস্টানরা যেমন যীশুখৃস্টের কথাকে শাশ্বত মনে করেন, এ-ও তার প্রকারভেদ মাত্র। পক্ষান্তরে রক্ষণশীলেরা ঘোষণা করলেন যে, কুরআনের অবিনশ্বরতাকে অস্বীকার করার ফলে যুক্তিবাদীদের দ্বারা মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে আঘাত হানা হচ্ছে। আব্বাসীয় শাসকগোষ্ঠী যুক্তিবাদের তাৎপর্য ও দূরপ্রসারী ফলাফলের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে রক্ষণশীলদেরই সমর্থন দিলেন। নায্যাম কার্যত হাদীস-শাস্ত্রকে অস্বীকার করেন এবং আবু হুরায়রাকে প্রকাশ্যেই বিশ্বাসের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেন। ফলত কতকটা যুক্তিবাদের আদর্শ সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝি ও কতকটা যুক্তিবাদী দলের ব্যক্তি-বিশেষের বল্গাহীন চিন্তাধারার ফলে রক্ষণশীল দল একে ইসলামী সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা পর্যুদস্ত করার হাতিয়ার রূপে রাজদ্বারে ও জনসমক্ষে প্রতীয়মান করতে কৃতকার্য হন। অবশ্য তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজ সংগঠনকে বজায় রাখা এবং এর জন্যে তাঁদের একমাত্র পন্থা ছিল শরীয়তের বন্ধনরজ্জুর সাহায্য নেওয়া আর শরীয়তী আইন-কানুনের গঠনকে যতখানি সম্ভব দৃঢ় সংবদ্ধ করে দাঁড় করানো।

২. কৃচ্ছ্র-ধর্মী সূফী মতবাদ মুসলিম-সম্প্রদায়ের মধ্যেই জন্মলাভ করে থাকলেও প্রসারের সাথে সাথে ক্রমশ এ অন্যান্য অনৈসলামিক ধর্ম সম্প্রদায়ের মতবাদ আহরণ করে পরিপুষ্ট হতে থাকে। সূফীদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পুরোপুরি চিন্তামূলক। এই বৈরাগ্যধর্মী সূফীবাদের অভ্যুদয় এবং প্রসার লাভ রক্ষণশীলদের উপরোক্ত মনোভাবের অন্যতম কারণ। কেবলমাত্র ধর্মীয় দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, সূফীবাদ প্রকৃতপক্ষে আমাদের ধর্মাচার্যদের দ্ব্যর্থবোধক বাক্‌বিস্তারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বিশেষ। সুফিয়ান সওরীর দৃষ্টান্ত এ স্থলে প্রণিধানযোগ্য। সে সময়কার প্রখর বুদ্ধি আইনজ্ঞদের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। অক্লান্ত সাধনা ও গবেষণা দ্বারা তিনি একটি নতুন মযহাব প্রবর্তনের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার প্রতি তাঁর গভীর প্রবণতা তখনকার আইনদাতাদের কাষ্ঠ-শুষ্ক বাক্-বিতণ্ডার কাছে প্রতিহত হয়ে তাঁকে বৈরাগ্যধর্মী সূফীবাদের ক্রোড়ে ঠেলে দেয়। চিন্তার দিক থেকে সূফীবাদ ক্রমশ পূর্ণ মুক্তবুদ্ধির পথে এগিয়ে আসতে থাকে এবং যুক্তিবাদের সাথে হাত মিলায়। 'যাহির' ও 'বাতিন' (দৃষ্ট রূপ ও গূঢ় সত্য)-এর পার্থক্যের ওপর সূফীবাদ এত বেশী

জোর দেয় যে, বহির্জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুর প্রতিই সূফী জগতের ঔদাসীন্যতা দেখা দিতে থাকে।

পরবর্তীকালে সূফীবাদে এই পরজগতমুখিতাই বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠল। এতে ইসলামের সামাজিক দিক সম্বন্ধে সূফীরা উদাসীন হয়ে উঠল; অন্যদিকে ভাববিলাসচর্চার সীমাহীন সুযোগ সৃষ্টির ফলে শ্রেষ্ঠতম মুসলিম মনীষীদের এক বিরাট অংশ এ পথে ভিড় জমালেন এবং নিজেদের সর্বসত্তা বিসর্জন দিয়ে বসলেন। পরিণামে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা এসে পড়ল সাধারণ বুদ্ধিওয়ালাদের হাতে আর চিন্তাবিমুখ মুসলিম জনসাধারণ কোনো উন্নততর আদর্শ বা ব্যক্তিত্বের পরিচয় না পেয়েও অগত্যা বাঁধাধরা মযহাবগুলোর কোনো না কোনো একটা অবলম্বন করল।

৩. সর্বোপরি, এই সময়েই আসল আর একটি বৃহৎ বিপর্যয়। ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি বিধ্বস্ত হল মুসলিম চিন্তা-জগতের কেন্দ্রস্থল বাগদাদ নগরী। তাতার অভ্যুত্থানের সমকালীন ঐতিহাসিকরা সকলেই বাগদাদের এই ধ্বংসলীলা বর্ণনা করতে গিয়ে ইসলামের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সম্বন্ধে শঙ্কা প্রকাশ করে গেছেন। অধিকতর ভাঙন রোধ করবার উদ্দেশ্য তখনকার রক্ষণশীল ধর্মনেতারা সর্বপ্রযত্নে একটি বাঁধাধরা সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনে লেগে যান এবং তার জন্যে হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করেন শরীয়তের ইমামগণ কর্তৃক প্রবর্তিত আইনকে। যেসব নতুনতর চিন্তা-ভাবনা এর মানদণ্ডে বেমিল দেখাল, তার সবকিছুই 'বিদআত' বলে তাঁদের বিচারে পরিত্যক্ত হল। বলা বাহুল্য, তখনকার সেই অবস্থার জন্যে এ ধরনের ছাঁটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। তাঁদের প্রধানতম কাম্য ছিল সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এ ব্যাপারে তাঁরা যে অংশত ঠিক পথেই চলেছিলেন তা অস্বীকার করবার উপায় নেই; কেননা, দৃঢ় সংগঠনের দ্বারা ভাঙনের কিছুটা রোধ তো হবেই, অন্তত উপস্থিত ক্ষেত্রে। কিন্তু তাঁরা তখন বুঝতে পারেন নি, এবং আমাদের বর্তমান 'আলিম' সমাজ এখনও বুঝতে পারেন না যে, পরিণামে একটি জাতির ভাগ্য শুধুমাত্র সংগঠন-শৃঙ্খল দিয়েই গড়ে তোলা যায় না; তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন সমাজের মানুষের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও শক্তি। সংগঠনের বাড়াবাড়ির ফলে ব্যক্তিত্বের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এমন অতি সংগঠিত সমাজে ব্যক্তি একদিক দিয়ে শক্তিলাভ করলেও অন্যদিক দিয়ে তার আপন আত্মারই ঘটে অবলুপ্তি। অপরপক্ষে বিগত ইতিহাসের প্রতি অসার ভক্তিভাব কিংবা তার কৃত্রিম পুনরভ্যুত্থানের দ্বারা জাতীয় অবনতির গতিরোধ সম্ভব হয়ে ওঠে না। কোনো আধুনিক লেখক এই সুন্দর উক্তিটি করেছেন : 'ইতিহাসের সুস্পষ্ট রায় এই যে, যে জাতির মধ্যে কতকগুলো নীতি পুরোনো, অকর্মন্য হয়ে গেছে, সে জাতির মধ্যে সেসব নীতির পুনরায় শক্তিলাভ কখনো সম্ভব নয়।'

সমাজের অধঃপতন রোধের একমাত্র কার্যকরী পথ হচ্ছে সেই সমাজে আত্মশক্তি-প্রবুদ্ধ মানুষ গড়ে তোলা। মাত্র তাঁরাই পারেন জীবনের গভীরতার উদ্দেশ্য দিতে। তাঁদের জীবনে যে নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, তারই আলোকে আমাদের বোধগম্য হবে

যে, আমাদের উপস্থিত পারিপার্শ্বিকতা এমন অখণ্ডনীয় কিছু নয় এবং অবস্থা-ভেদে তার সংশোধন আবশ্যক। অতীতের প্রতি একটি মিথ্যা ভক্তিভাব জাগিয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দী ও পরবর্তীকালীন মুসলিম আইনবেত্তারা নিয়মের বাঁধনে সমাজকে কষে বাঁধার ওপরে যে অত্যধিক জোর দেন, তা আসলে ইসলামের অন্তর্নিহিত প্রেরণারই প্রতিকূল এবং তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইবনে তাইমিয়া কঠোর হস্তে লেখনী ধারণ করে গেছেন। এর জন্ম হয় বাগদাদ ধ্বংসের পাঁচ বছর পরে, ১২৬৩ খৃস্টাব্দে। ইসলাম প্রচারে তাঁর সাধনা সমৃদ্ধ লেখনী চালনা ছিল জীবনব্যাপী ও অক্লান্ত।

ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী ময্হাবের ঐতিহ্যে শৈশব অতিবাহিত করেন এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তারপর তিনি নিজেকে স্বাধীন ইজ্তিহাদের অধিকারী বলে দাবী জানিয়ে মযহাবসমূহের অপরিবর্তনীয়তার ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং নতুনভাবে যাত্রা শুরু করার জন্যে পুনরায় কুরআন-হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যাহিরী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ইবনে হায্ম-এর মতো তিনিও সাদৃশ্য ও ইজ্মা (মতৈক্য)-ভিত্তিক হানাফি যুক্তিবাদকে পূর্বেকার নৈয়ায়িকদের পন্থায় গ্রহণ করতে নারাজ হন। এর কারণ স্বরূপ তিনি মনে করেন যে, 'মতৈক্য'ই সর্বপ্রকার কুসংস্কারের মূল ভিত্তি। এটা বলতে হবে যে, তাঁর সময়ের সেই নৈতিক ও মানসিক অধঃপতনের বিবেচনায় তিনি যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন বলে স্বীকার না করে উপায় নেই। ষোড়শ শতকে সুয়ূতী এই একই দাবী জানান। তার সাথে তিনি প্রতি শতাব্দীর আরম্ভে এক একজন 'মুজাদ্দিদ'-এর আবির্ভাববিষয়ক মতবাদটি যোগ করে দেন। কিন্তু ইবনে তাইমিয়ার শিক্ষার মর্ম ব্যাপকভাবে বিকাশলাভ করে অষ্টাদশ শতকে নাজ্দের ঊষর ভূমিতে গড়ে-ওঠা একটি অগ্নিগর্ভ আন্দোলনের মারফত। ম্যাকডোনাল্ড একে বলেছেন : 'ভাঙনরত মুসলিম জগতের মধ্যে একটি আলোকোজ্জ্বল ব্যতিক্রম।' বস্তুত আধুনিক ইসলামের এই-ই প্রথম প্রাণস্পন্দন। মুসলিম এশিয়া ও আফ্রিকায় অভ্যুত্থিত এর পরবর্তী প্রায় সবগুলো প্রসিদ্ধ ধর্মীয় আন্দোলনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। উদাহরণ স্বরূপ সেনৌসি আন্দোলন, প্যান ইসলামী আন্দোলন এবং ইরানের বাবী আন্দোলনের নাম করা যায়। সুপ্রসিদ্ধ অতিনিষ্ঠ (puritan) সংস্কারক মুহম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব ১৭০০ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মদীনায় শিক্ষা সমাপনের পর প্রথমে তিনি ইরান ভ্রমণে বহির্গত হন এবং পরে সমগ্র মুসলিম জগতের দ্বারে দ্বারে ক্রমশ তাঁর অশান্ত আত্মার বহ্নিশিখা ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হন। অন্তরে তিনি গায্যালী-শিষ্য, বারবার সংস্কারক, মুহম্মদ ইব্ন্ তুমরত-এর সহধর্মী ছিলেন। বলা বাহুল্য, তুমরত-এর গভীর ধর্মনিষ্ঠা ও অক্লান্ত সাধনা বলেই মৃয়মান মুসলিম স্পেন আবার নব প্রাণশক্তি লাভ করেছিল। এই আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্মোদ্যম মুহম্মদ আলী পাশার সৈন্যবলের হাতে বিনাশপ্রাপ্ত হন। কিন্তু আমাদের বিবেচ্য তা নয়। আমাদের প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল এ আন্দোলনে অভিব্যক্ত স্বাধীনতা স্পৃহা, যদিও এ আন্দোলনের মধ্যেও একটি অন্তর্নিহিত রক্ষণশীলতা

বিদ্যমান ছিল। এ একদিকে যেমন মযহাবগুলোকে শেষ সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং ব্যক্তিগত বিচার ক্ষমতাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পেয়েছে, অন্যদিকে আবার বিগতকালের প্রতি এর দৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ সমালোচনাহীন। আইনের ব্যাপারেও এর সম্বল প্রধানত রসূলুল্লাহ্‌র ঐতিহ্য।

তুরস্কের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যাবে যে, আধুনিক দর্শনশাস্ত্র থেকে শক্তি ও প্রসারতা আহরণ করে ইজতিহাদের মনোভাব তুর্কি জাতির ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চেতনায় অনেক দিন থেকেই ক্রিয়া করে আসছে। এ স্পষ্ট বোঝা যায়, আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক মতাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হালিম সাবিতের মুসলিম আইন সম্বন্ধে নতুন মতবাদ থেকে। ইসলামের পুনরুজ্জীবন লাভ যদি সত্য হয় এবং আমার বিশ্বাস এ সত্য, তাহলে একদিন আমাদেরও তুর্কিদের মতো আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পুরাতন জ্ঞানের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। তার ফলে মুসলিম জগতের সাধারণ ভাণ্ডারে কোনো মৌলিক দান করার সামর্থ্য যদি আমাদের না-ও হয়, তবু অন্ততঃপক্ষে বিভিন্ন মুসলিম জ্ঞানকেন্দ্রে আজ-কাল অতি উদারপন্থী আন্দোলনের যে দ্রুত প্রসার ঘটেছে, সৌহার্দ্যপূর্ণ রণধর্মী সমালোচনার দ্বারা আমরা নিশ্চয়ই তার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব।

আমি এখন তুরস্কের ধর্ম প্রভাবিত রাজনীতি সম্বন্ধে দু'টি কথা বলব। এর থেকে বোঝা যাবে তুরস্কের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তায় কিভাবে ইজতিহাদ ক্রিয়া করেছে। অল্পকাল আগে তুর্কি চিন্তা-জগতে দু'টি প্রধান ধারা বিদ্যমান ছিল। একটির প্রতিভূ ছিলেন তুর্কি জাতীয়তাবাদী দল, অন্যটি রূপ নিয়েছিল ধর্মীয় সংস্কারের পথে। জাতীয়তাবাদী দলের প্রধান লক্ষ্য হল রাষ্ট্র। ধর্মকে এঁরা রাষ্ট্রের সমস্থানীয় মনে করেন না; ধর্মের কোন স্বাধীন কার্য আছে বলেও এঁরা স্বীকার করেন না। এঁদের মতে, জাতীয় জীবনে রাষ্ট্রই মৌলিক শক্তির আধার এবং অন্য সব শক্তি নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্র। এর থেকে এঁরা রাষ্ট্র ও ধর্মের পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে পূর্বকার মতাবলী নাকচ করেছেন এবং ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানাদির পৃথকীকরণের ওপর অধিকতর জোর দিয়েছেন। ইসলামী ধর্মীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এ সিদ্ধান্তে আসা যে সম্ভব, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে, মসুলিম জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে নিয়ামক এবং অন্যান্য সব কিছুকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের অনুগামী মনে করাটা ভ্রমাত্মক বিবেচনার ফল। মুসলিম জীবনে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক ব্যবস্থাপনাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা চলবে না। যে কোন কাজ বাহ্যত যতই সংসারধর্মী হোক না কেন, তার প্রকৃতি নির্ধারিত হয় কর্মকর্তার মনোবৃত্তি দ্বারা। অন্য কথায়, যে কোনো কাজের অদৃশ্য মানসিক পটভূমিই তার প্রকৃতি নির্ধারিত করে। কোনো কাজকে সাংসারিক বা ধর্ম-সম্পর্কশূন্য বলা হয়, যদি তা সম্পাদিত হয় জগৎ জীবনের সীমাহীন জটিলতা থেকে বিচ্ছিন্ন মন নিয়ে। অন্যথায়, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সাংসারিক মনে হলেও যে কর্মের উৎস অন্তরের গভীরতম প্রদেশে নিহিত, তাকে আধ্যাত্মিক বলে মেনে নিতে হবে। ইসলামে একই মূল সত্য

দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতায় ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে দেখা দেয়। এ ধারণা সত্য নয় যে, ধর্ম রাষ্ট্র একই বস্তুর দুই বিভিন্ন দিক। ইসলাম একটি অবিশ্লেষণীয় সত্য, তার বিভিন্ন রূপ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ফল মাত্র। এ বিষয়টি অত্যন্ত দূরপ্রসারী, এর ব্যাখ্যা করতে গেলে অতিসূক্ষ্ম দার্শনিক আলোচনায় জড়িয়ে পড়তে হবে। সংক্ষেপে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এই পুরাতন ভুলটি জন্মলাভ করেছে মানব চরিত্রকে দ্বিধা-বিভক্ত মনে করার বিভ্রান্তি থেকে। মানব চরিত্রের এ দুটি দিক পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন নয়; তবুও মূলত, এরা ভিন্নগোত্রীয় ও পরস্পরবিরোধী । প্রকৃত সত্য এই যে, স্থান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে জড় চেতনের রূপ লাভ করে। মানুষের মধ্যে জড় ও চেতনের সমাবেশ বিদ্যমান। জগতের কার্যকলাপের মধ্যে মানুষ প্রতিভাত হয় দেহ রূপে; সেই একই কার্যের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিচারে তাকে দেখতে পাওয়া যায় মন বা আত্মা রূপে। তওহীদের কার্যকরী অভিব্যক্তি হল সাম্য, সংহতি ও স্বাধীনতায়। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে রাষ্ট্র হল এই আদর্শ নীতিগুলোকে স্থান-কালীয় শক্তিতে পরিণত করার প্রচেষ্টা বা এসব নীতিকে নির্দিষ্ট মানবীয় অনুষ্ঠানে রূপায়িত করবার আকাঙ্ক্ষা। একমাত্র এই বিশেষ অর্থেই ইসলামী রাষ্ট্রকে 'ধর্মীয়' আখ্যা দেওয়া হয়; এর এই অর্থ নয় যে, 'ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহর প্রতিভূ' বেশে কেউ এ রাষ্ট্রের কর্ণধার থাকবেন এবং নিজের কল্পিত অভ্রান্ত তার সুযোগ নিয়ে তিনি যদৃচ্ছাচরণের অধিকার ভোগ করবেন। ইসলামের সমালোচকেরা এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটির প্রতি দৃষ্টি দেন নি। কুরআন অনুসারে মৌলিক বাস্তব হল আধ্যাত্মিক এবং জীবনে তার প্রকাশ পার্থিব কর্মে। জীবাত্মা আত্মবিকাশের সুযোগ পায় প্রাকৃতির ভৌতিক এবং লৌকিক জগৎকে অবলম্বন করে। যা কিছুই বাহ্যিক বা পার্থিব হোক্ না কেন, তার উন্মেষ অপার্থিব থেকে। ইসলাম তথা সমগ্র ধর্ম-জগতের প্রতি আধুনিক চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠতম অবদান হল তার বস্তু ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন জড়পদার্থকে নিছক বস্তুরূপে দাঁড় করানো চলে না, যে পর্যন্ত না তার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক রূপকে হৃদয়ঙ্গম করা হয়। ঐহিক জগৎ বলে কিছু নেই। বস্তুজগতের এই বিশাল অভিব্যক্তি আত্মার আত্মোপলব্ধিরই একটি পন্থা মাত্র। সব ভূমিই পবিত্র ভূমি। রসূলুল্লাহ বলেছেন : "আমাদের সমগ্র পৃথিবীটাই একটি মসজিদ।" ইসলামী দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হল মানবীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করবার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। এই দিক থেকে বিচার করলে যে কোন রাষ্ট্র, যা কেবলমাত্র ব্যক্তি বা দল-বিশেষের আত্মপ্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত নয়, বরং এসব আদর্শমূলক নীতিকে কার্যে পরিণত করতে ব্যাপৃত-তাকে ধর্মভিত্তিক বলেই স্বীকার করতে হবে।

আসলে তুর্কী জাতীয়তাবাদীরা ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের মনোভাবটি আহরণ করেছিলেন ইউরোপের রাজনৈতিক বিকাশের ইতিহাস থেকে। আদি খৃস্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবার প্রয়াস পেয়েছিল কোন একটি রাজনৈতিক বা ক্ষমতাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, বরং পাপ-তমসাপূর্ণ পৃথিবীতে একটি বৈরাগ্যধর্মী সম্প্রদায় রূপে। মানুষের

সমাজ জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখার স্থান এর শিক্ষা বা কর্মপদ্ধতিতে ছিল না এবং কার্যত সর্বক্ষেত্রে রোমীয় অনুশাসনকে মেনে চলাই এর রীতি ছিল। ফল এই দাঁড়াল যে, রাষ্ট্র যখন খৃস্টীয় মত গ্রহণ করল, তখন রাষ্ট্র এবং ধর্ম দু'টি ভিন্ন শক্তি হিসেবে পরস্পরের কাছে প্রতিভাত হল সংখ্যাতীত সীমানা বিরোধের সমস্যা নিয়ে। ইসলামে তেমন অবস্থার সৃষ্টি কখনো হতে পারে নি। কেননা, ইসলাম তার প্রারম্ভ থেকেই একটি সমাজবদ্ধ প্রতিষ্ঠান রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এর মূলে ছিল কুরআনের কয়েকটি সহজ ব্যবহারিক নীতি। পরবর্তী অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, রোমীয় দ্বাদশ ফলকের মতো এই মূলনীতিগুলোর মধ্যে নতুন নতুন ব্যাখ্যা ও ব্যাপকতর প্রয়োগ সম্ভাবনা নিহিত আছে। ইসলামী বিধানে উপরোক্ত দ্বৈতবাদের স্থান নেই, অতএব রাষ্ট্র ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদীদের এই দ্বৈতবাদ মুসলিম বিচারে ভ্রান্তিসঙ্কুল।

অপরপক্ষে, উযীরে আযম সাইদ হালিম পাশার নেতৃত্বে চালিত ধর্ম সংস্কারপন্থী দল এই আদি সত্যের ওপর জোর দিলেন যে, ইসলাম আদর্শবাদ ও প্রত্যক্ষবাদের সামঞ্জস্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং আমাদের চিরকালীন কাম্য স্বাধীনতা, সাম্য ও সংহতির সমাহার রূপে ইসলামের কোন মাতৃভূমি থাকতে পারে না। সাইদ হালিম বলেন :

> "ইংরেজী অঙ্কশাস্ত্র, জার্মান জ্যোতির্বিদ্যা বা ফরাসী রসায়ন বলে যেমন কিছু নেই, তেমনই ইসলামও তুর্কী, আরবী, ফারসী বা ভারতীয় বলে পরিচিত হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ বিশ্বজনীন; কিন্তু তাদের অবলম্বন করে বিভিন্ন জাতি নিজ নিজ বিশিষ্ট সংস্কৃতি গড়ে তুলছে এবং এসবের সম্মিলিত রূপ বিশ্ব মানবের সাধারণ জ্ঞানভাণ্ডারে পরিণত হচ্ছে। ইসলামের সার্বজনীন সত্যাবলীও প্রায় এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করে বিভিন্ন জাতীয় নৈতিক ও সামাজিক বৈচিত্র্যের সৃষ্ট করেছে।"

এই প্রখর দৃষ্টিমান লেখকের মতে, জাতীয় আত্মম্ভরিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সংস্কৃতি আসলে বর্বরতারই অন্যতম রূপ। এ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে বিত্তশালী সম্প্রদায়ের হাতে শ্রম শিল্পের অতি প্রসারের দ্বারা এবং সেই সূত্রে একে নিয়োজিত করা হয়েছে মানুষের আদিম আসক্তি ও প্রবৃত্তির তুষ্টি বিধানের কাজে। অবশ্য তিনি বেদনার সাথে স্বীকার করেছেন যে, কালে কালে স্থানীয় আচারাদি এবং মুসলিম জাতিসমূহের প্রাক-ইসলামীয় কুসংস্কারাবলীর প্রভাবে মুসলিম নৈতিক ও সামাজিক আদর্শরাজি ক্রমশ অনৈসলামিক রূপ গ্রহণ করেছে। এসব আদর্শ আগে ইরানী, তুর্কী অথবা আরবীয়; পরে ইসলামী। তওহীদের সমুজ্জ্বল ললাট এখন পৌত্তলিকতার টীকায় চিত্রিত; এবং মুসলিম নীতি শাস্ত্রের সার্বজনীন ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ রূপ এখন স্থানিক রঙের তুলিকার পুনঃ পুনঃ প্রলেপে আচ্ছন্ন। অতঃপর উপায় কি? তাঁর মতে, এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় হল, ইসলামের মূলত গতিশীল জীবন দর্শনের ওপর হতে

সমাচ্ছন্নকারী পরগাছার তন্ত্রজাল সমূলে উৎপাটিত করে দেওয়া এবং স্বাধীনতা, সাম্য ও সংহতিমূলক জীবনাদর্শকে তার মৌলিক খাঁটি রূপে পুনরুদ্ঘাটিত করে তার আলোকে আমাদের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা প্রাথমিক যুগের সহজ ও সর্বসাধারণ গ্রাহ্যরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। তুরস্কের উযীরে আযমের এই মতবাদ থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, ইসলামের মর্মবাণী অনুসরণ করে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, কার্যত তা জাতীয়তাবাদী দলের সিদ্ধান্ত থেকে পৃথক নয়। দু দলেরই অবশ্য কাম্য আধুনিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতার আলোকে ইসলামী শরীয়তকে পুনর্গঠিত করবার জন্যে ইজ্‌তিহাদ প্রয়োগের স্বাধীনতা।

এখন দেখা যাক্ তুর্কী জাতীয় মহাসভা বিশ্ববিখ্যাত খিলাফত প্রশ্নে ইজ্‌তিহাদের প্রয়োগ কিভাবে করেছে। সুন্নী আইন অনুসারে ইমাম বা খলীফার নিযুক্তি অবশ্য কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম প্রশ্ন ওঠে, খিলাফত কি কোন ব্যক্তিবিশেষের হাতেই ন্যস্ত রাখতে হবে? তুরস্কের ইজ্‌তিহাদ হল ইসলামের অন্তর্নিহিত নীতি-বিচারে খিলাফত একটি সংসদের হাতে কিংবা একটি নির্বাচিত প্রতিনিধি সংঘের হাতেও ন্যস্ত করা চলে। আমার যতটা জানা আছে, মিসরীয় বা ভারতীয় আলিমগণ এ সম্পর্কে আজতক কোন মতামত প্রকাশ করেন নি। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে, তুর্কীদের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্ভুল। এ নিয়ে যুক্তি-তর্ক করার কোন প্রয়োজন আমি দেখি না। সাধারণতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল, শুধু তা-ই নয়, অধিকন্তু আজকের মুসলিম জগতের উদ্ভূত নব নব সমস্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে এ শাসন ব্যবস্থাই একান্তভাবে প্রযোজ্য।

তুরস্কের মতবাদ যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে ইসলামের প্রথম দর্শনপন্থী ঐতিহাসিক ইব্‌ন খালদুনের সহায়তা নেওয়া যায়। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মুকদ্দমা'য় ইসলামের 'সার্বজনীন খিলাফত' সম্বন্ধে তিনটি বিভিন্ন মত উল্লিখিত হয়েছে :

প্রথম : এই সার্বজনীন খিলাফত একটি আল্লাহ্ প্রত্যাদিষ্ট অনুষ্ঠান, অতএব কোন অবস্থাতেই তা পরিত্যাগ করা চলবে না।

দ্বিতীয় : এ একটি সময়োচিত ব্যবস্থা মাত্র।

তৃতীয় : এ ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নেই।

শেষ মতটি খারিজী সম্প্রদায়ের। সম্ভব তুর্কী জাতি প্রথম মত থেকে সরে এসে দ্বিতীয় মতে উপনীত হয়েছে। এ মতের উদ্‌গাতা হলেন মু'তাযিলা সম্প্রদায়; তাঁরা খিলাফতকে একটি সময়োচিত ব্যবস্থার অধিক কিছু মনে করতেন না। তুর্কীদের যুক্তি এই যে, কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার বেলায় অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতার দিকে আমরা কিছুতেই চোখ বন্ধ করতে পারি না। সে অভিজ্ঞতার অকুণ্ঠিত রায় এই যে, কার্যক্ষেত্রে 'সার্বজনীন ইমামত' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। মুসলিম সাম্রাজ্য যখন একচ্ছত্র ছিল, তখনও এ ধারণা কার্যকরী ছিল। এ সাম্রাজ্য ভেঙে-চুরে ভিন্ন ভিন্ন

নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের জন্ম দিয়েছে। অতএব ইসলামের অধুনাতন ব্যবস্থাপনায় খিলাফতের ধারণা আর নতুন করে কার্যকরী হতে পারে না। জীবন্ত শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করবার ক্ষমতা এর আর নেই। খিলাফতের দ্বারা এখন কোন উপকার হওয়া তো দূরের কথা, বরং এই খিলাফতের ধারণাই বর্তমানে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের একত্রীকরণের পথে বড় বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। খিলাফত সংক্রান্ত মতভেদের দরুন ইরান তুরস্ক থেকে দূরে সরে আছে, মরক্কো এ ব্যাপারে রয়েছে কিছুটা বক্র দৃষ্টিতে চেয়ে আর আরব এ নিয়ে প্রচ্ছন্ন দুরাশা পোষণ করছে। এ এক নিতান্ত হাস্যকর ব্যাপার যে, ক্ষমতার একটি অকিঞ্চিৎকর প্রতীক মাত্র নিয়ে এত কাড়াকাড়ি- যার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেছে অনেককাল আগে। ইতিহাসের যুক্তি তুর্কীদের এ রাজনৈতিক মতবাদকে সমর্থন করে। খলীফাকে কোরায়েশী হতে হবে- এ শর্তকে কাযী আবু বকর বা'কিলানী প্রত্যাখ্যান করেছেন; তাঁরো যুক্তি ঐ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। তাঁর মতে, কোরেশদের রাজনৈতিক অবনতি এবং তজ্জনিত মুসলিম বিশ্ব শাসনে তাদের অসামর্থ্যের দরুন এ শর্ত আর কার্যকরী থাকতে পারে না। কয়েক শতাব্দী পূর্বে ইবনে খালদুন খিলাফতের সাবেক শর্ত ব্যক্তিগতভাবে মেনে নিয়েও, বা'কিল্লানীর মতো প্রায় একই মনোভাব প্রকাশ করে গেছেন এবং সে পথে অনেকদূর এগিয়েও ছিলেন। তাঁর মতে, যেহেতু কোরেশদের শক্তিমত্তা তখন বিগত, অতএব যে দেশে যিনি সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি, তাঁকেই সে দেশের ইমাম বলে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এর থেকে বোঝা যাবে যে, ন্যায়শাস্ত্রে কঠোর সত্যাবলীর বিচারকোণ থেকে ইব্‌ন খালদুন এমন একটি ব্যবস্থার আভাস দিয়ে গেছেন, যাকে বলা যায় : আজকের জগতে যে আন্তর্জাতিক মুসলিম সংঘের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, ইব্‌ন খালদুনের অভিমত তারই প্রথম সমর্থক। বলা বাহুল্য, নব্য তুর্কীদের মনোভাব এই চিন্তাধারার অনুসারী। তারা প্রেরণা গ্রহণ করেছে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। তাদের মতে, প্রাচীন যুগের আইনবিদদের যুক্তি-তর্কমূলক সিদ্ধান্ত তাঁদের জীবনকালে এবং সমঅবস্থায় কার্যকরী থাকলেও তা বর্তমানকালে বাধ্যতামূলক হতে পারে না।

আমার ধারণায়, এই যুক্তিগুলো যথাযথভাবে গ্রহণ করলে, তা থেকে একটি আন্ত র্জাতিক আদর্শ জন্মলাভ করতে পারে। ইসলামের মৌলিক ভিত্তিও তাই; কিন্তু প্রাথমিক কয়েক শতাব্দীর আরবীয় সাম্রাজ্যবাদ একে আজতক সমাচ্ছন্ন বা বলতে গেলে স্থানচ্যুত করে রেখেছে। এই নব্য আদর্শ স্বনামধন্য তুর্কী জাতীয়তাবাদী কবি জিয়ার লেখনীতে সুপ্রকাশ। অগাস্ত কোঁতের দর্শনে অনুপ্রাণিত এই মনীষীর সঙ্গীত-লহরী আধুনিক তুর্কী চিন্তাধারা রূপায়ণে প্রচুর কাজ করেছে। প্রফেসর ফিশারের জার্মান অনুবাদ থেকে আমি এই কবির একটি কবিতার মূল ভাবটি উদ্ধৃত করছি :

> ইসলামে সত্যিকারের রাজনৈতিক একতা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রথমেই মুসলিম দেশগুলোকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, তারপর তাদের উচিত হবে, সর্বসম্মতভাবে একজন খলীফার নেতৃত্বে একত্রিত হওয়া। আজকের দিনে এমন

> একটি ব্যাপার কি সম্ভব? যদি না হয়, অপেক্ষা করতে হবে। সে সুদিন আসবার আগে খলীফার কর্তব্য আপন ঘরের সংস্কার সাধন করা এবং একটি আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার গোড়াপত্তনে মনোনিবেশ করা। আন্তর্জাতিক জগতে দুর্বলের কোনো বন্ধু নেই; একমাত্র শক্তিই এখানে মর্যাদার আসন পেয়ে থাকে।

এ কয়টি লাইন থেকে আধুনিক ইসলামের প্রবণতার একটি নির্দেশ পাওয়া যায়। বর্তমান অবস্থায় প্রত্যেক মুসলিম জাতির জন্যে একান্ত প্রয়োজন তার নিজ অন্তরের গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা; কিছুকালের জন্যে একমাত্র নিজেরই উপর নিজ দৃষ্টি কেন্দ্রিভূত করা। তা হলেই সম্ভব হবে যথোপযুক্ত শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্চয় করে যথাকালে মুসলিম সাধারণতন্ত্রগুলোর সমবায়ে একটি জীবন্ত ইসলামী পরিবার গড়ে তোলার কাজ। জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদদের মতে, এমন একটি সত্যিকার এবং জীবন্ত একতা গড়ে তোলার কাজ এত সহজলভ্য নয় যে, বর্তমান খিলাফতের মতো শুধু একটি প্রতীকগত সার্বভৌম শক্তির সাহায্যে তা সম্ভব হবে। এই বিশাল স্বাধীন ও স্বনির্ভর জাতিপুঞ্জের পরস্পরবিরোধী বংশ ও সম্প্রদায়গত স্বার্থাবলীকে একটি আধ্যাত্মিক আত্মীয়তার আদর্শে নিয়ন্ত্রিত সুশৃঙ্খল করে গড়ে তোলার মধ্যেই রয়েছে এর সত্যিকারের অভিব্যক্তি। আমার মনে হয়, আল্লাহ আমাদের অন্তরে এ সত্য ধীরে ধীরে প্রতিভাত করছেন যে, ইসলামী জাতীয়তাবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ নয়- এ একটি জাতিসংঘ; যা মানবকৃত সীমারেখা ও বংশগত স্বাতন্ত্র্য মেনে নেয় শুধুমাত্র পরিচয় সৌকর্যের জন্যে, এসবের সাহায্য নিয়ে কোন বিশেষ জাতির সামাজিক বিকাশকে খর্ব করবার জন্যে নয়।

এই একই কবির 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' নামক আর একটি কবিতার আংশিক উদ্ধৃতি থেকে আজকের মুসলিম জগতে ধীরে ধীরে যে সাধারণ ধর্মীয় মনোভাব আত্মপ্রকাশ করছে, তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে :

> মানুষের প্রথম আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন কারা? নিঃসন্দেহে পয়গাম্বর ও ধর্মাত্মাগণ। প্রত্যেক যুগে ধর্ম পথ দেখিয়েছে দর্শনকে; একমাত্র ধর্ম থেকেই আলোক লাভ করেছে নৈতিকতা ও চারুশিল্প। কিন্তু তারপর ধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নিজের পূর্বেকার উৎসাহ-প্রেরণা হারাতে থাকে। ধর্মাত্মাগণ তিরোহিত হন, আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব নামে মাত্র পর্যবসিত হয় আইন স্রষ্টাদের উত্তরাধিকারে। এই আইন স্রষ্টাদের ধ্রুব তারকা হল ঐতিহ্য, তারা গায়ের জোরে ধর্মকে টেনে নিয়ে যান নিজেদের পথে। কিন্তু দর্শন বলে : আমার পরিচালক যুক্তির তারকা; তুমি যাও ডাইনে, আমি যাই বাঁয়ে। ধর্ম-দর্শন; উভয়েই চায় মানবাত্মাকে; দু'জনে টানে দু'ধারে।
>
> যখন এই দ্বন্দ্ব চলতে থাকে, অভিজ্ঞতা তখন জন্ম দেয় প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের, এবং এই উদীয়মান চিন্তাবিদ তখন ঘোষণা করেন : ঐতিহ্য হল ইতিহাস, আর যুক্তি

> হল ইতিহাসের রীতি। দু'জনেই ব্যাখ্যা দিতে চায় একই বস্তুকে, উপনীত হতে চায় একই বস্তুতে, যা সংজ্ঞার অতীতে।
>
> কিন্তু এ বস্তু কি?
>
> এ কি আধ্যাত্মিক ভাবাপ্লুত হৃদয়?
>
> তা-ই যদি হয়, তবে আমার শেষ কথা শোন, ধর্মই প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান, যার উদ্দেশ্য হলো মানব হৃদয়ের আধ্যাত্মীকরণ।

কোঁতে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে তিনটি পর্যায় নির্ণয় করেছেন- ধর্মীয়, প্রাজ্ঞিক ও বৈজ্ঞানিক। ওপরের উদ্ধৃতি থেকে পরিষ্কার দেখা যায়, জিয়া কী সুন্দরভাবে কোঁতের এই মতবাদকে আত্মস্থ করে ইসলামের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে খাপ খাইয়েছেন। এই বর্ণনায় ধর্ম সম্বন্ধে যে মনোভাব রয়েছে, তুরস্কের শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবী ভাষার স্থান নির্দেশের প্রশ্নেও কবি তার প্রতিধ্বনি করেছেন :

> যে দেশে উপাসনার আহবান তুর্কী ভাষায় ঘোষিত, যে দেশে উপাসনারত ব্যক্তির কাছে তার ধর্মের অর্থ বোধগম্য, যে দেশে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয় তুর্কী ভাষায়, যে দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি বড় বা ছোট– আল্লাহর নির্দেশ উত্তমরূপে বোঝে; হে তুর্কী সন্তান! সেই দেশ তোমার মাতৃভূমি।

ধর্মের উদ্দেশ্য যদি হয় মানব হৃদয়ের আধ্যাত্মীকরণ, তবে তাব নিশ্চয়ই প্রবেশ লাভ করতে হবে মানবাত্মার গভীর প্রদেশে। কবির মতে তা যথার্থত সম্ভব হতে পারে মাত্র তখনই, যখন এর আদর্শগুলো মানুষ নিজ মাতৃভাষার আবরণে শুনতে পায়। আমাদের দেশে এমন লোকের অভাব নেই যাঁরা তুর্কী ভাষা দিয়ে আরবীর এই স্থানচ্যুতিকে ঘৃণার চোখে দেখে থাকেন। এরপর আমি কতকগুলো যুক্তি উত্থাপিত করব, যা থেকে বোঝা যাবে যে, কবির এ ইজ্‌তিহাদবাদে আপত্তির যথার্থ কারণ রয়েছে। কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, তাঁর মতো প্রচেষ্টা ইসলামের অতীত ইতিহাসে এ-ই প্রথম নয়। আমরা জানি, মুসলিম স্পেনের 'মেহ্‌দী' মুহম্মদ ইবন তুমর্ত ছিলেন বারবার গোষ্ঠী সম্ভূত। যখন তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং 'মুআহিদীন'দের ধর্মীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তিনি নিরক্ষর বার্‌বার্‌দের বুঝবার সুবিধার জন্যে কুরআন বার্‌বার্‌ ভাষায় অনুবাদ ও পঠনের আদেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া আযানের বার্‌বার্‌ রূপদান এবং ধর্ম বিভাগীয় কর্মচারীদের বাধ্যতামূলকভাবে বার্‌বার ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কবি অন্যত্র নারী জাতি সম্বন্ধে তাঁর আদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন। পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার প্রবর্তনের অত্যুৎসাহে তিনি মুসলমানের বর্তমান পারিবারিক আইনকে আমূল পরিবর্তিত রূপে দেখতে চান :

> 'এই নারী জাতি– আমার মাতা, আমার ভগিনী
> আমার কন্যা।

এই নারীই করেছে আমার জীবনের অন্তস্থল থেকে
আমার পবিত্রতম হৃদয়াবেগের উদ্বোধন।
এই নারীই আমার প্রেয়সী– আমার চন্দ্র,
আমার তারকা।
এই নারীই আমাকে জীবনের কবিতা বুঝতে
সাহায্য করেছে।
এ কি সম্ভব যে আল্লার পবিত্র বিধান
তাঁর এই পরম মনোরম সৃষ্টিকে
অবজ্ঞেয় বলতে পারে?
নিশ্চয়ই কুরআন ব্যাখ্যায়
বিজ্ঞদের কোনো ভুল রয়ে গেছে।
জাতি এবং রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল হল পরিবার।
নারীর পূর্ণ মর্যাদা যে পর্যন্ত উপলব্ধি না করা হবে,
সে পর্যন্ত জাতীয় জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।
পরিবার ব্যবস্থায় সুবিচারের আশ্রয় নিতে হবে;
অতএব তিন ব্যাপারে সাম্য প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন :
বিবাহ বিচ্ছেদে, পৃথকীকরণে এবং উত্তরাধিকারে।
যে পর্যন্ত নারীকে উত্তরাধিকারে পুরুষের অর্ধেক
এবং দাম্পত্যে পুরুষের এক-চতুর্থাংশ মনে করা হবে,
সে পর্যন্ত পরিবারও উন্নত হবে না, জাতিও না।
অন্যান্য অধিকার রক্ষাকল্পে আমরা
জাতীয় বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করেছি;
কিন্তু পারিবারিক জীবনকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি
মযহাবগুলির হাতে।
আমি জানি না, কেন যে আমরা নারী জাতিকে
এমন অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি।
নারী কি দেশের জন্য কাজ করে না?
শেষ পর্যন্ত তাদের কি হাতের সূক্ষ্ম সূচিকে
তীক্ষ্ণধার বেয়নেটে পরিবর্তিত করে
বিপ্লবের মাধ্যমে আমাদের হাত থেকে
তাদের অধিকার আদায় করে নিতে হবে?

প্রকৃতপক্ষে, আজকের মুসলিম জাতিসমূহের মধ্যে একমাত্র তুর্কী জাতিই শাস্ত্রবুলির মৌতাত কাটিয়ে উঠে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। একমাত্র তুরস্কই দাবী জানিয়েছে চিন্তাক্ষেত্রের স্বাধীনতার। একমাত্র তুরস্কই এগিয়ে এসেছে আদর্শ থেকে বাস্তবের

পথে। তুর্কী জাতির জীবন গতিশীল ও প্রসারমান। সে জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা নব নব সমস্যার উদ্ভব করবেই আর সে সমস্যা সমাধানের জন্যে তাকে প্রচলিত নীতির নব ব্যাখ্যা ও নবপ্রয়োগ করতেই হবে। আধ্যাত্মিক প্রসারতার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা যাদের অজ্ঞাত, যারা নীতিশাস্ত্রে কেবল বৈঠকী আলোচনা করেই তুষ্ট, তারা তুর্কীদের এসব অভিনব সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টার মর্যাদা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে না। আমার মনে হয়, ইংরেজ দার্শনিক হোব্‌স্-ই বলেছেন যে, পর্যায়ক্রমে একের পর এক যে একই চিন্তা-ভাবনা তা আদতে চিন্তা-ভাবনাই নয়। অথচ প্রায় সব মুসলিম দেশের অবস্থাই আজ তথৈবচ। তারা কলের মতো পুরোনো মূল্যমান নিয়েই সব কিছুর বিচার করে চলেছে। অন্যপক্ষে তুরস্ক আজ নতুন মূল্যমান সৃষ্টির কাজে লেগে গেছে। অনেক নতুনতর এবং মহানতর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তুর্কী জাতি আজ নিজের গভীরত আত্মনের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছে। তাদের অন্তরে জীবন আজ চলিষ্ণু; তা পরিবর্তিত হচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে এবং সাথে সাথে নতুন আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিচ্ছে, কঠিনতর সমস্যার সৃষ্টি করছে এবং নবতর ব্যাখ্যার ইঙ্গিত জাগাচ্ছে। তুর্কীর সামনে আজ প্রশ্ন : 'মুসলিম আইন শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ কি সম্ভব?' এই প্রশ্ন অন্যান্য মুসলিম জাতির সামনেও অদূ ভবিষ্যতে প্রতিভাত হবে এবং এর উত্তর দিতে অশেষ মানসিক প্রয়াস সংবদ্ধ করতে হবে। রসূলুল্লাহর অন্তিমকালে উমর অশেষ সৎসাহসের সাথে এ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা যদি ইসলামের এই বিচারপন্থী ও স্বাধীনচেতা মনীষীর মনোভাব নিয়ে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হই, তাহলে এর উত্তর অস্তিবাচক (affirmative) হবে নিশ্চয়ই। আধুনিক ইসলামের উদারনৈতিক আন্দোলনকে আমরা সাগ্রহ অভ্যর্থনা জানাই। কিন্তু এ-ও অবিসম্বাদিত যে মুসলিম ইতিহাসে উদারনৈতিকতার অভ্যুদয় বরাবরই এক একটি সঙ্কট মুহূর্ত ডেকে এনেছে। উদারনৈতিকতা ভাঙনের অগ্রপথিক; তা ছাড়া এর আওতায় মুসলিম জগতের স্থানে স্থানে যে গোত্রপ্রীতি আত্মপ্রকাশ করছে তা পরিণামে ইসলামের বিশ্ব মানবতার আদর্শকে ক্ষুণ্ন করতে পারে। এমনও হতে পারে যে, আমাদের আধুনিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্কারকেরা যৌবন দৃপ্ত ভাবাবেগের মুখে উদারনৈতিকতার মোহে সংস্কারের সঙ্গতি সীমালঙ্ঘন করে বসবেন। আমরা এখন এসে পড়েছি ইউরোপীয় ইতিহাসের লুথার প্রবর্তিত প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের সমকালীন অবস্থায়। এ আন্দোলনের অভ্যুদয় ও পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের জন্যে লাভজনকই হবে। সাবধানী ইতিহাস পাঠক স্বীকার করেন যে, ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপব্যাপী এই মূখ্যত ধর্ম সংস্কারমূলক আন্দোলন বস্তুত রাজনৈতিক আন্দোলনেই পর্যবসিত হয়েছিল; এবং তার শেষ ফল দাঁড়িয়েছিল, খৃস্টধর্মের বিশ্বজনীন নীতির পরিবর্তে ধীরে ধীরে বিভিন্ন জাতি বৈশিষ্ট্যমূলক নীতিসমূহের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। এ প্রগতির ফল বিগত বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পরিপ্রেক্ষিতে আমরা স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছি। এরপর দু'টি বিরোধী নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য না ঘটে

ইউরোপের পরিস্থিতি আরও অসহনীয় হয়ে উঠেছে। ইউরোপে যা ঘটেছে ও ঘটছে তার প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা আজ মুসলিম জগতের নেতৃবৃন্দের জন্যে বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তারপর প্রচুর আত্মসংযম এবং ইসলামী সমাজ নীতির সূক্ষ্মজ্ঞানসহ কার্যক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে।

আধুনিক ইসলামের পটভূমিকায় ইজতিহাদের ঐতিহাসিক রূপ ও প্রবণতা সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা হল। এখন দেখা যাক, মুসলিম ইতিহাস ও আইন শাস্ত্রের গঠন প্রকৃতিতে এর মৌলিক নীতিসমূহের পুনর্বিবেচনার সম্ভাবনা দেখা যায় কি-না। অন্য কথায়, আমাদের সোজা প্রশ্ন হল : ইসলামী আইনে ক্রমবিকাশ নীতির প্রয়োগ সম্ভব কি? বন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিতীয় ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক হর্টেন মুসলিম দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব বিচারে এই একই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কেবল ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুসলিম চিন্ত াবিদরা যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন, তা যথাযথ বিশ্লেষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ইসলামের ইতিহাসে দুটি শক্তির মধ্যে ক্রমাগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং বোঝাপড়া হয়েছে। এই দু'টি শক্তির একটি হচ্ছে আর্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা; অন্যটি হচ্ছে একটি সেমিতীয় ধর্ম। মুসলমান বরাবরই তার পরিপার্শ্বের সংস্কৃতি আত্মস্থ করেছে এবং সেই সংস্কৃতির সঙ্গে তার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সামঞ্জস্য সাধন করে নিয়েছে। হর্টেন আরও বলেন, ৮০০ থেকে ১১০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইসলামে অন্যূন একশতটি ধর্ম সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। এ থেকে একাধারে মুসলিম ভাবধারার প্রসারশীলতা ও সাথে সাথে আমাদের সেকালের চিন্তানায়কদের বিরামহীন কর্মপ্রাণতার নিঃসন্দেহে নজীর মেলে। মুসলিম সাহিত্য ও চিন্তাক্ষেত্রে গভীর অভিনিবেশের ফলে উপরিউক্ত প্রাণবান ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছেন :

> ইসলামের আত্মাকে উদারতায় অসীম বললে অত্যুক্তি হয় না। একমাত্র নাস্তি ক্যবাদ ছাড়া ইসলাম তার চতুষ্পার্শ্বের সমস্ত ঐতিহ্যকেই যথাসম্ভব আত্মস্থ করেছে এবং নিজস্ব বিকাশ পথে নির্দেশ দিয়েছে।

ইসলামের আত্মস্থকরণ ক্ষমতা এর চেয়েও অধিক আত্মপ্রকাশ করেছে আইন শাস্ত্রের ক্ষেত্রে। ওলন্দাজ সমালোচক হুরগ্রঞ্জ (Hurgronje) বলেছেন :

> ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পড়লে দেখতে পাওয়া যাবে যে, একদিকে সামান্যতম উত্তেজনা উপলক্ষ করে পণ্ডিতেরা পরস্পরকে কাফির বলতে উদ্যত; আবার অন্যদিকে ইসলামী ঐক্যনীতির নিবিড় প্রভাবে সেই তাঁরাই পূর্বতন ব্যাখ্যাদাতাদের অনুরূপ মতভেদাবলীর সামঞ্জস্য বিধানে তৎপর।

ইসলামের আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকদের মতামত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আমাদের ধর্মীয় নেতাদের কঠোর রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও ইসলামের মর্মাশ্রয়ী ঔদার্য, নতুন জীবন বারি সিঞ্চনের সাথে সাথে আপনিই কার্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করবে।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ইসলামের বিপুল আইন সাহিত্য যথাযথভাবে পর্যালোচনা করলে, যেসব পল্লবগ্রাহী সমালোচকেরা মনে করেন যে, ইসলামের আইনে আর কোন বিকাশ সম্ভব নয়, তাঁরা তাঁদের মত বদলাতে বাধ্য হবেন। দুর্ভাগ্যবশত এ দেশের গোঁড়া মুসলিম জনসাধারণ এখন পর্যন্ত ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিচারমূলক আলোচনার জন্যে প্রস্তুত হয় নি। এ করতে গেলে অনেকে অসন্তুষ্ট হবে এবং অনেক বাদানুবাদের সৃষ্টি হবে। তবুও আমরা যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি তার পর্যালোচনায় এ প্রসঙ্গকে এড়িয়ে যাওয়া চলে না। অতএব আমার বক্তব্য আমি কিছুটা ব্যক্ত করতে চাই।

১. প্রথমত, এ মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে বলতে গেলে, আব্বাসীয় যুগের অভ্যুদয়কাল পর্যন্ত কুরআন ব্যতীত ইসলামের কোন লিখিত আইন গ্রন্থ ছিল না।

২. দ্বিতীয়ত, ইসলামের প্রথম শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি থেকে আরম্ভ করে চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত কমপক্ষে উনিশটি আইন সংক্রান্ত মযহাব ও মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল। এর থেকে নিঃসন্দেহ রকমে বোঝা যায় যে, আমাদের প্রাথমিক যুগের আইনবেত্তারা একটি প্রসারধর্মী সভ্যতার প্রয়োজন মেটাতে কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সাথে সাথে মুসলিমদের দৃষ্টিসীমার ব্যাপ্তির ফলে এই প্রাথমিক কালের আইন স্রষ্টাদের পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল পারিপার্শ্বিকতাকে উদারতর দৃষ্টি দিয়ে দেখবার এবং ইসলামে নবাগত জাতিসমূহের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্যাদি অনুধাবনের। তখনকার বিভিন্ন আইন সংক্রান্ত মতাবলী, সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোকে একটু মনোযোগ দিয়ে যাচাই করলে দেখা যাবে যে, তাঁরা নতুন ব্যাখ্যাদান প্রচেষ্টায় ক্রমশ নিগমীয় (deductive) পন্থা ছেড়ে আগমীয় (inductive) পন্থার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন।

৩. তৃতীয়ত, ইসলামী আইনের চারটি স্বীকৃত ভিত্তি এবং তা নিয়ে যে বাক্-বিতণ্ডা ঘটে গেছে সে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমাদের মযহাবগুলির অপরিবর্তনীয়তা সম্পর্কে পোষিত ধারণা স্বতঃই উবে যায় এবং এক্ষেত্রে নতুনতর বিকাশ সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখন এই ভিত্তি চতুষ্টয়ের আলোচনায় আসা যাক।

ক. প্রথম ভিত্তি : কুরআন। কুরআনকে মূলত একটি আইন সংহিতা মনে করলে ভুল করা হবে। আমি পূর্বেই বলেছি যে, কুরআনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ ও বিশ্বজগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণে উন্নততর চেতনাবোধ জাগ্রত করা। অবশ্য কুরআনে কতকগুলি আইনগত নীতি ও কানুন সাধারণ ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে- বিশেষ করে মানুষের সামাজিক জীবনের কেন্দ্রস্থল ও পারিবারিক ব্যবস্থার বেলায়। প্রশ্ন আসে, যে ঐশী বাণীর চরম উদ্দেশ্য হল মানুষের মহত্তর জীবনানুভূতির উন্মেষ সাধন, তাতে এসব সাংসারিক কানুনাদির স্থান কেন? এর উত্তর মিলবে, খৃস্টধর্মের ইতিহাস থেকে। খৃস্টধর্ম অভ্যুদিত হয় বিশেষ করে ইহুদী ধর্মের আইনবাদী মনোবৃত্তির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ। পরজগতমুখিতার একটি সুষ্ঠু আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে এ মানুষকে

আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করতে কৃতকার্য হয়েছিল। কিন্তু একে অবলম্বন করে যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ গড়ে উঠল, তার জন্যে মানব সমাজের অশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিকতার মূল্যবোধ সম্ভব ছিল না। নউমান (Naumann) তাঁর 'Briefe uber Religion' গ্রন্থে বলেছেন :

> 'আদিম খৃস্টধর্ম রাষ্ট্র আইন সংস্থা বা উৎপাদনকে কোন মূল্য দেয়নি। মানুষের সামাজিক অবস্থার কোন আলোকপাত এর মধ্যে নেই।' তাঁর সিদ্ধান্ত 'অতএব হয় আমাদের সাহস করে রাষ্ট্রহীন হয়ে বেঁচে থাকবার, অর্থাৎ সজ্ঞানে অরাজকতার ক্রোড়ে ঝম্পদানের সিদ্ধান্ত করতে হবে, আর না হয় ধর্মীয় বিশ্বাসের সমান্তরালভাবে আর একটি রাষ্ট্রীয় বিশ্বাসও আমাদের পোষণ করে চলতে হবে।'

বলা চলে যে, এর জন্যই কুরআন ধর্ম ও রাষ্ট্রের এবং নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতির একতার প্রয়োজন অনুভব করেছে এবং ঐশীবাণীতে দুয়ের স্বীকৃতি দান করেছে। প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রন্থেও এই একই সমাধান পাওয়া যাবে।

যা হোক, এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল কুরআনের প্রগতিধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি। এর উৎপত্তি ও ইতিহাসের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। স্পষ্টতই এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআনের ক্রমবিকাশবাদের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন হতে পারে না। শুধু এইটুকু মাত্র ভুললে চলবে না যে, জীবন গতিশীল বটে, কিন্তু নিছক পরিবর্তনমাত্র নয়। এর মধ্যে রক্ষণশীলতার উপাদানও আছে। এ কথা সত্য যে, মানুষ আনন্দের সঙ্গে তার সৃষ্টিমূলক কাজ করে যায়, জীবনের নব নব পথ উদ্ঘাটন করতে তার চেষ্টার অন্ত নেই, তবু সে নিজের বিকাশ দেখে যেন খানিকটা আনন্দবোধ করে। এগিয়ে যেতে যেতেও সে পেছন ফিরে তাকায় এবং নিজের ভেতরের প্রখরতাকে খানিকটা ভয়ের চোখে দেখে। মানুষের আত্মা তার অগ্রগমন পথে খানিকটা বাধা পায় এমন শক্তি দ্বারা, যাকে বিরোধী শক্তি বলেই মনে হয়। অন্য কথায় বলা যায় যে, জীবন চলে অতীতের বোঝা পিঠে নিয়ে, অতএব সমাজের পরিবর্তন আনতে হলে রক্ষণশীলতার শক্তি ও মূল্যের দিকে যথাযথ দৃষ্টি না রাখলে চলবে না। কোরআনের মূল শিক্ষাকে এহেন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেই আধুনিক যুক্তিবাদের উচিত আমাদের সামাজিক সংস্থাসমূহের বিচার করা। কোন জাতিই তার অতীতকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। কারণ সে জাতির বৈশিষ্ট্য তো অতীতের সৃষ্টি। বিশেষত ইসলামী সামাজিক কাঠামোতে পুরোনো অনুষ্ঠানাদির পুনর্গঠন অনেকখানি নৈপুণ্য-সাপেক্ষ। এ কাজে যাঁরা হাত দেবেন তাঁদের দায়িত্বও সেই অনুপাতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে দেশভেদ নেই। এর উদ্দেশ্য হল সমগ্র মানবমণ্ডলীকে নিয়ে এক মহাজাতি গঠন করা। পরস্পরবিরোধী জাতিসমূহকে এ একত্র করবে, তারপর সেই ছোট ছোট জাতির সমন্বয়ে পরিণামে যে মহাজাতি গড়ে উঠবে, সে মহাজাতিতে ছোট ছোট জাতিরও আত্মচেতনা অবলুপ্ত হয়ে যাবে না, জেগে থাকবে। এ কর্তব্য সম্পাদন সহজ ছিল না। তবুও ইসলাম যে সুচিন্তিত অনুষ্ঠানাদির মারফত অশেষ বিরোধ-বৈচিত্র্যের মধ্য থেকে একটি সামগ্রিক আদর্শ

ও চেতনা গড়ে তুলতে অনেকখানি কৃতকার্যতা অর্জন করেছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এ রকম একটি সমাজ গড়ে তুলবার বেলায় খাদ্য-পানীয় বা পবিত্রতা-অপবিত্রতা সংক্রান্ত যে সব বিধি-বিধানকে পরিবর্তনের যোগ্য বলে মনে হয়, তারও একটা মূল্য আছে। কেননা, এতে সে সমাজের মধ্যে একটি বিশিষ্ট অন্তরমুখিতার ভাব দেখা দেয়। একটি মিশ্র সমাজের মধ্যে স্বভাবতই নানা রকম বিরোধী ভাব দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেই সম্ভাবনার বিপদ থেকে সামাজিক আচারের ঐক্য ও দৃঢ়তা সমাজকে অনেকখানি রক্ষা করে। এই সব আচার-অনুষ্ঠানের সমালোচকদের জন্যে প্রয়োজন, ইসলামের এইসব পরীক্ষামূলক সামাজিক ব্যবস্থার নিগূঢ় মর্ম কি, তা সম্যক রূপে উপলব্ধি করা। এসব প্রতিষ্ঠানের গঠন-প্রকৃতি বিচারে কোন দেশ বা স্থানবিশেষের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা না করে দেখতে হবে সে মহত্ত্বর উদ্দেশ্যের দিক থেকে যা সমগ্র মানব জাতির জীবনে ক্রমে রূপায়িত হচ্ছে।

এখন ইসলামী আইনের কুরআনীয় মূলনীতি ও উপাদানের আলোচনায় আসা যাক। এ কথা নির্বিবাদে বলা চলে যে, কুরআনের গভীর ও ব্যাপক নীতি মানুষের চিন্তা-চর্চা বা আইন প্রণয়নকার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, বরং এসবের উৎকর্ষ সাধনেই সহায়তা করেছে। আমাদের প্রাথমিক বিধানদাতারা কুরআনের এই অন্তর্নিহিত প্রেরণার ইঙ্গিত গ্রহণ করেই বিভিন্ন আইন-পদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন। মুসলিম ইতিহাসের ছাত্ররা উত্তম রূপে জানেন যে, ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক বহুমুখী বিজয়ের অনেকখানি কৃতিত্ব এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চিন্তানায়কদের প্রাপ্য। ফন্ ক্রেমার বলেন : 'রোমানদের পরে একমাত্র আরব জাতিই কৃতকার্য হয়েছে একটি সুচিন্তিত ও সুঠাম আইন পদ্ধতি গড়ে তুলতে।' কিন্তু আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, অভাবিতপূর্ব ব্যাপকতা সত্ত্বেও এসব পদ্ধতি ব্যক্তি বিশেষের ব্যাখ্যা-প্রয়াসমাত্র এবং একে চরম সিদ্ধান্ত বলে কিছুতেই মেনে নেওয়া চলে না। আমি জানি, আমাদের উলামা সমাজ ইজতিহাদের সম্ভাব্যতা কখনও অস্বীকার করতে পারেন নি, অথচ তাঁরা চলিত মযহাবগুলিকে চরম ও অলঙ্ঘনীয় বলে দাবী করে থাকেন । এঁদের এ মনোভাবের মূল কারণ আমি আমার বিশ্বাস অনুযায়ী ব্যক্ত করেছি। কিন্তু পৃথিবীর এ পরিবর্তিত অবস্থায় এবং সর্বক্ষেত্রে মানব চিন্তার অনন্যসাধারণ বিকাশের ফলে ইসলাম আজ যেসব অগণিত সমস্যা ও সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছে, তাতে তাঁদের এ অভিমত আর মেনে চলা সম্ভব বলে মনে করি না। আমাদের মযহাব প্রতিষ্ঠাতারা কি নিজেরাই তাঁদের যুক্তি বা ব্যাখ্যার চরমতা দাবী করে গেছেন? কখনো না। আমার মতে, আধুনিককালের উদারনৈতিক মুসলিম চিন্তাবিদেরা যে নিজ অভিজ্ঞতা ও পৃথিবীর পরিবর্তিত অবস্থার পরিপেক্ষিতে ইসলামী আইনের মূলনীতিসমূহের পুনর্ব্যাখ্যা দাবী করেছেন। তাতে অযৌক্তিক কিছুই নেই। কুরআনের শিক্ষা এই যে, ক্রমবিকাশশীল সৃষ্টি-প্রচেষ্টাতেই হল জীবনের অভিব্যক্তি। প্রত্যেক যুগে মানুষের নিজ নিজ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা এ থেকেই প্রতিপন্ন হচ্ছে। পূর্ব পুরুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তার

পথে আলোকপাত করতে পারে, কিন্তু বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না।

তুর্কী কবি জিয়া তালাক, পৃথক বসবাস ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে নর-নারীর সমঅধিকার দাবী করেছেন। মুসলিম আইন অনুসারে তা সম্ভব হতে পারে কি-না আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন। অবশ্য তুরস্কে নারী জাগরণের ফলে যেসব দাবী উত্থাপিত হয়েছে, তার মুকাবিলা করতে ইসলামী আইনের নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে কি-না, আমি জানি না। পাঞ্জাবে অবাঞ্ছিত স্বামীর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে অনেক মুসলিম নারী ধর্ম ত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। একটি প্রচারমূলক ধর্মের আদর্শ থেকে এর অধিক বিচ্যুতি কল্পনাও করা যায় না। বিখ্যাত স্পেনীয় আইনবিশারদ ইমাম শাতিবী তাঁর 'আল মুয়াফিক্কাত' গ্রন্থে' বলেছেন যে, ইসলামী বিধান 'দ্বীন', 'নফ্‌স্‌' 'আকল্‌' 'মাল' 'ন্‌স্‌ল' এই পঞ্চ সম্পদের হিফাজতকারী। এই নীতি স্মরণ করে আমি সবিনয়ে প্রশ্ন করতে চাই, 'হিদায়া'য় বর্ণিত ধর্মত্যাগ সংক্রান্ত কানুন কার্যকরী করতে গেলে এ দেশে ধর্মবিশ্বাস রক্ষার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হবে কি?

ভারতীয় মুসলমানদের কঠোর রক্ষণশীতার দরুন আমাদের বিচারকদের এসব নামকরা আইন পুস্তকের স্মরণ না নিয়ে উপায়ান্তর থাকে না। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, মানুষ এগিয়ে চলেছে, কিন্তু তার বিচার ব্যবস্থা পড়ে আছে অনেক পেছনে।

কবি জিয়ার দাবী সম্পর্কে আমার ধারণা এই যে, সম্ভবত তিনি ইসলামী পরিবার সম্পর্কিত আইন সম্যক অধ্যয়ন করেন নি। কুরআনের উত্তরাধিকার ব্যবস্থার অর্থনৈতিক তাৎপর্যও মনে হয়, তাঁর কাছে যথাযথ রূপে সুপ্রকাশ নয়। ইসলামী বিধানে বিবাহ একটি দেওয়ানি চুক্তি। বিবাহের সময় স্ত্রী ইচ্ছা করলেই শর্তসাপেক্ষে স্বামীর তালাক দেবার অধিকার নিজের জন্যে অর্জন করে নিতে পারে। উত্তরাধিকারের বেলায়ও জিয়ার প্রস্তাবিত সংশোধন ভুল ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আইনসম্মত অংশের অসমতার জন্যেই যে পুরুষ নারীর ওপর আইনগত আধিপত্যের অধিকার পেয়ে যায়, এ কথা মনে করা উচিত নয়। তাঁ হলে এ ব্যবস্থা ইসলামের মূলনীতির বিরোধী হয়ে দাঁড়াত। কুর্‌আনে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে :

নারীর ওপর পুরুষের যেমন অধিকার, পুরুষের ওপর নারীরও তেমনি অধিকার।

কন্যার সম্পত্তির অংশ নির্ধারিত হয় তাকে জন্মসূত্রে নিকৃষ্ট মনে করে নয়, বরং সমাজ সংস্থায় তার নির্বিঘ্ন স্থান ও সুযোগাদির বিবেচনায়। অধিকন্তু কবির নিজ সিদ্ধান্ত অনুসারেও উত্তরাধিকার ব্যবস্থাকে সম্পত্তি বিভাগ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে বিচার করলে চলবে না, বরং অন্যান্য আইন-কানুন এবং ব্যবস্থাপনার সাথে একযোগে বিচার করতে হবে। ইসলামী আইন অনুসারে, নারী বিবাহকালে পিতা ও স্বামীর কাছে যা পায় তাতে তার নিরঙ্কুশ অধিকার বর্তায়। যৌতুক সম্পদের সে পূর্ণ অধিকারিণী হয়; তা নগদ বা পরে আদায় করা তারই ইচ্ছাধীন; এবং তা আদায়সাপেক্ষে সে স্বামীর সমগ্র সম্পত্তি আটক রাখতে পারে। এসব সত্ত্বেও নারীর সমগ্র জীবনব্যাপী

ভরণ-পোষণের পূর্ণ দায়িত্ব স্বামীর ওপর ন্যস্ত রয়েছে। এসব কথা স্মরণে রেখে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের বিচার করলে স্বতঃই প্রতীত হবে যে, এতে পুত্র ও কন্যার আর্থিক সমতা সাধনের যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং কবি জিয়া যা চেয়েছেন তা সরাসরি স্বীকৃত না হয়ে থাকলেও অন্যভাবে স্থির নিশ্চিত করা হয়েছে। ফন্ ক্রেমার কুরআনীয় আইনের উত্তরাধিকার প্রথাকে একটি বিশিষ্ট মৌলিক অবদান বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আসলে মুসলিম আইনজ্ঞরাই আজ পর্যন্ত এর প্রতি যথোপযুক্ত মনোযোগ দেন নি। বর্তমানে তিক্ত শ্রেণী-সংগ্রাম-সংকুল সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখা উচিত। পৃথিবীর অর্থনৈতিক জীবনের সম্মুখে বিপ্লব-সঙ্কেত আজ আর অস্পষ্ট নয়। এই সঙ্কটাকীর্ণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী আইনের ভিত্তি- ভূমিতে নতুনভাবে অনুসন্ধান চালালে এমন অনেক রত্ন মিলতে পারে, যার স্থায়িত্ব ও দীপ্তি ভবিষ্যতের সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ার কাজে আমাদের অশেষ শক্তি, সাহস ও বিশ্বাস যোগাবে।

খ. দ্বিতীয় ভিত্তি : হাদীস। ইসলামী আইনের দ্বিতীয় সুসমৃদ্ধ উপাদান হল হাদীস বা হযরত রসূলুল্লাহ্‌র ঐতিহ্য। আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে অধ্যাপক গোল্ড জিহার ঐতিহাসিক সমালোচনার একাল গ্রাহ্য সূত্রাবলীর সাহায্যে হাদীস শাস্ত্রের অন্তর্ভেদি পর্যালোচনা করেছেন। তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এই শাস্ত্রসম্ভার মোটের ওপর বিশ্বাসেব অযোগ্য। অন্য একজন ইউরোপীয় লেখক হাদীস বাক্য নির্বাচন মুসলিমদের অনুসৃত পদ্ধতি আলোচনা করে এবং তাতে ভুল-ক্রটির তর্কমূলক সম্ভাব্যতা উল্লেখ করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :

> উপসংহারে এ কথা বলতেই হবে যে, পুর্বোক্ত আলোচনা মাত্র কাল্পনিক সম্ভাবনা নির্দেশই দেওয়া হয়েছে; এ সম্ভাবনা কতখানি কার্যকরী হয়ে থাকবে তা বিশেষভাবে নির্ভর করে তৎকালীন অবস্থা সেসব সম্ভাবনাকে কার্যে পরিণত করার পক্ষে কতখানি ইন্ধন যুগিয়েছে তার উপর। নিশ্চয়ই তুলনামূলকভাবে এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা কমই ছিল, অর্থাৎ এসবের দ্বারা সমগ্র সুন্নাহ্‌র সামান্য অংশই প্রভাবিত হয়ে থাকবে। অতএব এ কথা বলা চলে যে, মুসলিম জ্ঞানাচার্যরা সুন্নাহ্ সংগ্রহের যে অংশকে প্রামাণ্য রূপে গ্রহণ করেছেন তাকে মোটামুটি ইসলামের প্রাথমিক বিকাশ ও প্রসারের খাঁটি দলিল বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। (মোহামেডান থিয়োরীজ অব ফিন্যান্স)

যা হোক, বক্ষমাণ বিবেচনায়, নিছক আইন সংক্রান্ত হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ক হাদীসগুলোকে পৃথক করে দেখা প্রয়োজন। প্রথমগুলো সম্বন্ধে একটি বিশেষ লক্ষণীয় প্রশ্ন হলো, এসব কি পরিমাণ প্রাক্-ইসলামীয় আচার-ব্যবহার দ্বারা প্রভাবিত? আপনারা জানেন যে, রসূলুল্লাহ্ কোন কোন ইসলাম-পূর্ব ব্যাপারে আদতেই হস্তক্ষেপ করেন নি। কোন কোনটি তিনি সংশোধিত আকারে গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

কষ্টসাধ্য, কেননা আমাদের প্রাথমিক যুগের লেখকরা পূর্ববর্তী রীতি-নীতির বিষয় যথাযথ উল্লেখ করে যান নি। আবার যেসব রীতি-নীতি রসূলুল্লাহ্‌র নির্দেশে বা জ্ঞাতসারে তখনকার দিনের ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় স্থান পেয়ে গেছে, সেগুলো সর্বত্র গ্রহণযোগ্য বলে তিনি মনে করতেন কি-না, তা-ও নির্ধারণের উপায় আজ নেই। শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্‌র বক্তব্য এ ব্যাপারে অনেকখানি আলোকপাত করে। আমি এখানে তাঁর অভিমতের সারমর্ম তুলে দিচ্ছি। তাঁর মতে, সাধারণত নবী-রসূলদের শিক্ষার ধারা এমন হয় যে, যে নবী যে সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হয়েছেন, সেই সম্প্রদায়ের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্য তাঁর শিক্ষায় বিশেষভাবে স্থান পায়। যে নবী সর্বজনগ্রাহী নীতি প্রবর্তন করবেন, তিনি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে আলাদা আলাদা কানুন প্রণয়ন করতে পারেন না বা প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার নিজস্ব কানুন তৈরি করে নেবার দায়িত্ব দিতে পারেন না। তাঁকে করতে হয় প্রথমত কোন একটি বিশেষ জাতিকে অবলম্বন করে তাঁর শিক্ষা-দিক্ষার গোড়াপত্তন, তারপর এই বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত কেন্দ্র থেকে ক্রমশ সম্প্রসারণ এবং পরিণতির দ্বারা একটি বিশ্বজনীন শরীয়তের প্রবর্তন। এ করবার বেলায়, সর্বমানবের সামাজিক জীবনের মূলনীতিসমূহের ওপর তিনি অধিকতর জোর দেন এবং তাঁর সম্মুখস্থ জাতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করেন। এ নীতি অনুসারে প্রযুক্ত শরীয়তের মূল্যমান (আহ্‌কাম'- যেমন অপরাধবিশেষ শাস্তির পরিমাপ ইত্যাদি) কতকটা সেই বিশেষ জাতির ক্ষেত্রেই যথাযথ বলে মনে করা যায়। তা ছাড়া যেহেতু আইন প্রয়োগই আইনের সার্থকতা নয়, অতএব ভবিষ্যৎ বংশধরদের বেলায় তার নিরঙ্কুশ প্রয়োগ চলতে পারে না। সম্ভবত এই মনোভাব থেকেই ইসলামের বিশ্বজনীন রূপের প্রখর দৃষ্টিমান সাধক ইমাম আবু হানীফা এসব হাদীস বাণীতে কার্যত বাদ দিয়ে গেছেন অধিকন্তু; 'ইস্‌তিহ্‌সান' অর্থাৎ আইনভিত্তিক অগ্রাধিকার নীতির তিনিই প্রবর্তক। এ নীতিতে আইনগত যুক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর থেকেই বোঝা যায়, মুসলিম আইনের উৎস হিসাবে হাদীসের প্রতি তাঁর মনোভাব কেমন ছিল।

বলা হয় যে, আবু হানীফার সময়ে হাদীস শাস্ত্র সংগৃহীত হয়নি বলেই তিনি তার ব্যবহার করেন নি। কিন্তু প্রথমত তাঁর সময়ে হাদীস বাণী সংগৃহীত হয়নি বলা ঠিক নয়; আবদুল মালিক ও যুহরীর সংগ্রহাবলী তাঁর মৃত্যুর অন্তত ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়। এ সত্ত্বেও যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এসব সংগ্রহ আবু হানীফার দৃষ্টিগোচর হয়নি বা এসবের মধ্যে আইন সংক্রান্ত হাদীসের স্থান লাভ ঘটে নি, তবুও বলা যায় যে, তিনি প্রয়োজন বোধ করলে তাঁর পরবর্তী মালিক বা আহ্‌মদ ইব্‌নে হাম্বলের মতো নিজেই নিজের প্রয়োজন অনুসারে হাদীস সংগ্রহ করে নিতে পারতেন। মোটের উপর আমার ধারণায় নিছক আইনবিষয়ক হাদীস বাণীর প্রতি আবু হানীফার মনোভাব সম্পূর্ণ বিজ্ঞজনোচিত। অতএব বলা যায় যে, আধুনিককালের উদারনীতিকগণ যদি হাদীস শাস্ত্রকে ইসলামী আইনের উপাদান হিসেবে বিনা বিচারে

গ্রহণ না করেই অধিকতর নিরাপদ মনে করেন, তবে তাঁরা সুন্নী ইসলামের একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যাতার অনুসরণই করেছেন। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, হাদীসবাদীরা ইসলামী আইন ক্ষেত্রে কাল্পনিক সম্ভাবনার চেয়ে বাস্তব ব্যাপারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করে গেছেন। যথাযথ মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে এবং হযরত রসূলুল্লাহ যে অনুপ্রেরণা নিয়ে ঐশী বাণীর ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন তার আলোকে দেখলে কুরআন বর্ণিত আইন শাস্ত্রের মূলনীতিসমূহের গভীরতর অর্থ উপলব্ধি করা যাবে। ইসলামী মূলনীতিসমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রচেষ্টায় হাত দিতে হলে প্রয়োজন আগে সে নীতিসমূহের জীবনগত মূল্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ।

গ. তৃতীয় ভিত্তি : ইজমা। ইসলামী আইনের তৃতীয় উপাদান হচ্ছে ইজ্মা। সম্ভবত ইজ্মা-ই ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইজ্মাকে উপলক্ষ করে কত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে, অথচ ইজ্মা ধারণা মাত্রই রয়ে গেছে, কোন মুসলিম দেশেই একে অবলম্বন করে কোনরূপ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি। সম্ভবত প্রথম চার খলীফার অব্যবহিত পর থেকে ইসলামে যে ধরনের যথেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ইজ্মা সহযোগে স্থায়ী আইন প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা তার স্বার্থের পক্ষে অনুকূল ছিল না। আমার মনে হয়, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাদের জন্যে এ পন্থার চেয়ে ইজতিহাদের দায়িত্ব ব্যক্তিবিশেষের হাতে ন্যস্ত রাখাই অধিক নিরাপদ ছিল। কেননা, ইজ্মার নীতি মোতাবিক গঠিত আইন-সভার শক্তি তাঁদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। অবশ্য আমরা এই ভেবে সন্তোষ লাভ করতে পারি যে, আজকের নতুন জাগতিক শক্তিপরম্পরা, বিশেষ করে ইউরোপীয় জাতিসমূহের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আঘাত, যেভাবে আধুনিক ইসলাম-মানসের উপর আপতিত হচ্ছে, তাতে ইজ্মার যোগ্য মূল্য ও সম্ভাবনা প্রতিভাত না হয়ে যাবে না। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে আজকাল সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রতিনিধি মারফত বিধান পরিষদ গড়ে তোলার যে স্পৃহা দেখা দিয়েছে, তাকে অগ্রগতির দিকে একটি বিরাট পদক্ষেপ বলে মেনে নিতে হবে। বর্তমানকালে ইসলামে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী ধর্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে। সাধারণ ইসলামী কানুনে এদের সকলেরই স্থান থাকতে হবে। এমতাবস্থায় ইজ্তিহাদ ক্ষমতা কোন বিশিষ্ট মযহাবের প্রতিনিধি ব্যক্তি বিশেষের বা তেমন কয়েক ব্যক্তির হাত থেকে তুলে নিয়ে একটি যথাযথভাবে গঠিত মুসলিম বিধান সভার উপর ন্যস্ত করা ছাড়া গত্যন্তর কি? এতে আরও একটি উপকার এই হবে যে, বিশেষজ্ঞ দল ব্যতীত লৌকিক ব্যাপারে যোগ্যতা ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন অবিশেষজ্ঞদের মতামতও কাজে লাগাবার সুযোগ পাওয়া যাবে। আমাদের আইন পদ্ধতির প্রচ্ছন্ন প্রাণশক্তির যথার্থ বিকাশ মাত্র এই পথেই সম্ভব; এ থেকেই আরও ক্রমবিকাশমান পথে তার নতুনতর অভিযান চলবে।

কিন্তু ইজ্মা সংক্রান্ত দু-একটি প্রশ্ন এখানে প্রসঙ্গত আসবে এবং তার উত্তরও দিতে

হবে। ইজমা কি কুরআনকে নাকচ করতে পারে? মুসলিম শ্রোতামণ্ডলীর কাছে এ প্রশ্ন অবান্তর, কিন্তু বিশেষ কারণবশত এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে হল। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত জনৈক ইউরোপীয় সমালোচকের লেখা 'মোহামেডান থিয়োরীজ অব ফিন্যান্স' নামক পুস্তকে এ সম্পর্কে কতকগুলো ভ্রান্তিমূলক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। লেখক কোন প্রমাণ উপস্থিত না করেই বলেছেন যে, কোন কোন হানাফী ও মুতাযিলা শাস্ত্রবিদের মতে ইজ্‌মা দ্বারা কুরআনকে নাকচ করতে বাধা নেই। ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্রীয় পুস্তকাবলীতে এমন কোন তথ্য নেই যার দ্বারা এ মত সমর্থিত হতে পারে। এমনকি, রসূলুল্লাহ্‌র কোন হাদীস বাণী দ্বারাও যে এ হতে পারে না, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। ইমাম শাতিবী তাঁর 'আল্‌ মুয়াফিক্বাত' গ্রন্থে'র ৩য় খণ্ড, ৬৫ পৃষ্ঠায় আমাদের প্রাথমিক বিধানাচার্যদের ব্যবহৃত 'নস্‌খ্‌' প্রয়োগের উল্লেখ করেছেন। হযরতের সাহাবীদের অবলম্বিত ইজ্‌মা সম্পর্কে এ শব্দের অর্থ হল– কুরআনীয় আইন প্রয়োগ ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচন, কিন্তু অন্য কোন আইন দিয়ে কুরআনীয় আইন উল্লংঘন নয়। শাফিয়ী মযহাবভুক্ত বিখ্যাত জ্ঞানাচার্য আমিদীর (মৃত্যু : সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি) গ্রন্থ মিসরে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি উক্ত পুস্তকে বলেছেন যে, এই ক্ষমতা প্রয়োগের বেলায় আইনসম্মত নীতি হল এই যে, প্রথমত সাহাবীদের হাতে এর জন্যে যথাযথ শরীয়ত প্রদত্ত যোগ্যতা (হুক্‌ম্‌) থাকা চাই। উপরোক্ত সমালোচক সম্ভবত এ নস্‌খ্‌ বিধান নিয়েই ভ্রমে পতিত হয়েছেন।

কিন্তু সাহাবীরা যদি কোন ব্যাপারে একমত হয়েও থাকেন, অতঃপর প্রশ্ন হল : তাঁদের সে সিদ্ধান্ত পরবর্তীদের জন্যে বাধ্যতামূলক হবে কিনা। শাওকানী এ নিয়ে বিভিন্ন মতবাদী লেখকদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমার মনে হয়, এ সম্পর্কে ঘটনাগত এ আইনগত প্রশ্নকে আলাদাভাবে বিচার করা প্রয়োজন। প্রথম ক্ষেত্রে, উদাহরণত, 'মুয়াওয়াযাতাইন' নামে পরিচিত ক্ষুদ্র 'সূরা' দু'টি সম্পর্কিত ঘটনাটির উল্লেখ করা যায়। এই 'সূরা' দু'টি সত্যিই কুরআনের অঙ্গবিশেষ কি না– এ প্রশ্নের সমাধানে সাহাবীরা একযোগে 'হ্যাঁ' সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আমরা বাধ্য; কেননা, এ সম্পর্কে সাক্ষ্যদানের তাঁদেরই ছিল একচেটিয়া অধিকার। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে ব্যাখ্যা দান সম্পর্কে। এ ক্ষেত্রে কারখী'র মতো আমিও মনে করি যে, পরবর্তীরা সাহাবীদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে বাধ্য নন। কারখী বলেন : 'ক্বিয়াস দ্বারা যা প্রতিপাদন সম্ভব নয়, তাতে সাহাবীদের সুন্নাহ্‌ বাধ্যতামূলক হবে, কিন্তু যে বিষয় ক্বিয়াসের সাহায্যে সমাধান করা সম্ভব, পরবর্তীদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।'

বর্তমানকালে মুসলিম সভ্যদের নিয়ে গঠিত আইন সভায় বেশীর ভাগ সভ্যই হবেন ইসলামী আইনের গূঢ়ার্থ ইত্যাদি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তাঁদের নিয়ে আর একটি প্রশ্ন ওঠে। এ ধরনের আইন সভার পক্ষে আইন ব্যাখ্যাকালে গুরুতর ভুল করে বসা বিচিত্র নয়। ভুল ব্যাখ্যা দানের এ সম্ভাবনা কিভাবে তিরোহিত বা অন্ততপক্ষে সীমাবদ্ধ করা

যায়? ইরানের ১৯০৬ সালের শাসন সংবিধানে পার্থিব অবস্থার সাথে পরিচিত একটি আলাদা উলামা কমিটিকে দিয়ে 'মজলিস'-এর আইন প্রণয়ন কার্য তত্ত্বাবধান করবার ব্যবস্থা রয়েছে। আমার ধারণা, এই বিপজ্জনক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছে ইরানের বিশিষ্ট গঠনতান্ত্রিক মতবাদের জন্যে। এ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রকৃত মালিক হলেন অনুপস্থিত ইমাম; রাজা তার পক্ষে তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। ইমামের প্রতিভূ-স্বরূপ উলামা সমাজ জাতীয় জীবনের সর্বত্র নিজেদের কর্তৃত্বে বিশ্বাসী। অথচ ইমাম থেকে কোন কোন উত্তরাধিকারপরম্পরা ছাড়া কি করে তাঁরা এ দাবী প্রতিষ্ঠা করেন, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। অবশ্য ইরানের মতবাদ অনেকখানি তাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমি সাধারণ দৃষ্টিতে আগেই বলেছি যে, এ ব্যবস্থা বিপদসংকুল। কোন সুন্নী রাষ্ট্রের এর প্রয়োজন অবস্থাবিশেষে অনুভূত হলেও স্থায়ীভাবে কখনও স্বীকার করা চলে না। উলামা সমাজ মুসলিম আইন সভায় হবেন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ; অন্য সদস্যদের সাথে তাঁরাও আইন প্রণয়ন কার্যক্রমের সর্বপর্যায়ে সহায়তা করবেন– তাঁদের জ্ঞান-গরিমা দিয়ে, কোন বিশেষ অধিকার বলে নয়। আজকের পৃথিবীতে ইসলামী আইনকে ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যার হাত থেকে মুক্ত রাখবার প্রকৃষ্ট পন্থা হল মুসলিম দেশসমূহে আইন শিক্ষার যথাযথ সংস্কার সাধন ও ব্যাপকতা বিধান এবং আধুনিককালের গবেষণা পদ্ধতির সাথে এর সহযোগ প্রতিষ্ঠা।

ঘ. চতুর্থ ভিত্তি ক্বিয়াস। ফিক্বাহ্‌র চতুর্থ উপাদান হল ক্বিয়াস, অর্থাৎ আইন প্রণয়নে সাদৃশ্যসূচক যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ। তৎকালীন মুসলিম অধিকৃত দেশগুলোর বিভিন্ন সামাজিক ও কৃষিভিত্তিক অবস্থায়, পূর্বতন হাদীস সংগ্রহ থেকে আবু হানীফার মযহাব বিশেষ কোন নজীর সংগ্রহ করতে পারেনি বলেই মনে হয়। অগত্যা উপায়ান্তর ছিল ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে অনুমানমূলক যুক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ। ইরাকের নবতর অবস্থায় এরিস্টটলীয় তর্কশাস্ত্রের নীতি প্রয়োগের উপযোগিতা আছে বলেই প্রতিভাত হচ্ছিল; অথচ ইসলামী আইনের সেই প্রাথমিক বিকাশকালে এ মতবাদের প্রভাব বিশেষ অনিষ্টকর হবারই সম্ভাবনা ছিল। জীবনের গতি ও বিকাশ বিচিত্র এবং জটিল। কতকগুলো সাধারণ ধারণা থেকে তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে যেসব সিদ্ধান্ত করা সম্ভব, সে সিদ্ধান্তের কঠোর ও অনমনীয় বাধা-নিষেধ দ্বারা জীবনের সে বিচিত্র বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করা চলে না। এরিস্টটলীয় যুক্তিবাদের চশমায় জীবনকে একটি নিছক গতি-প্রেরণাহীন সাধারণ যন্ত্রবিশেষ বলে মনে হবে। এর আওতায় আবু হানীফার মযহাব ক্রমশ জীবনের সৃষ্টিশীল স্বাধীনতা ও ইচ্ছাশক্তিকে অস্বীকার করে একটি কঠোর যুক্তিসর্বস্ব আইন পদ্ধতি গড়ে তুলতে প্রয়াস পেলো। কিন্তু হিজাযের বিধানাচার্যদের দৃষ্টি ছিল বিশেষভাবে বাস্তবভিত্তিক। তাঁরা রুখে দাঁড়ালেন ইরাকীয় পাণ্ডিত্যপন্থী সূক্ষ্ম বিচার কৌশলের বিরুদ্ধে। তাঁরা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, ইরাকীদের এসব কল্পনাপ্রসূত ঘটনা প্রণয়নের ফলে ইসলামী আইনশাস্ত্র একটি প্রাণহীন যন্ত্র পর্যায়ে পরিণত হবে। এ প্রতিবাদ সত্যানুসারী ছিল বলেই আমার বিশ্বাস । এ থেকে সেকালের মুসলিম

আইনবেত্তাদের মধ্যে অত্যন্ত তীব্র ও দীর্ঘকালব্যাপী বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। ফলে ক্বিয়াস প্রয়োগের বিধানের উপর বহুবিধ সীমা নির্দেশ, শর্ত প্রয়োগ ও সংশোধনাত্মক ব্যবস্থা আরোপিত হয়। এসব ব্যবস্থা প্রথমত মুজ্‌তাহিদদের ব্যক্তিগত মতামতের ছদ্মবেশে প্রবেশ লাভ করেছিল বটে, কিন্তু শেষতক ইসলামী আইন শাস্ত্রের নিয়ন্ত্রণে এসবই আত্মপ্রকাশ করে প্রচুর শক্তিমত্তা ও গতিবেগ নিয়ে। আবু হানীফার হাতে ইসলামী আইনের উৎস স্বরূপ ক্বিয়াস যে রূপ লাভ করেছিল তার প্রতিবাদে মালিক ও শাফিয়ীর সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের অবতারণার ফলে আর্যসুলভ কল্পনা-প্রবণতার উপর সেমিতীয়সুলভ বাস্তব প্রবণতার কার্যকরী প্রভাব বিস্তৃত হয়। এতে হানাফীপন্থীরা অনেকখানি সংযত হয়। আর্য জাতির চিরকালীন প্রবণতা হল বাস্তবকে এড়িয়ে কল্পনার আশ্রয় নেওয়া, ঘটনার চেয়ে ধারণাকে অধিক করে আঁকড়ে ধরা। সেমিতীয় পন্থা হল তার ঠিক উল্টো। প্রকৃতপক্ষে এ বাদানুবাদের উদ্ভব নিগমপন্থী (deductive) ও আগমপন্থী (inductive) দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্বেরই ফল। ইরাকী পণ্ডিতেরা গোড়ায় জোর দেন ধারণার চিরন্তনতার ওপর : অন্যপক্ষে হিজাযীরা জোর দেন ধারণার সাময়িকতার উপর। অবশ্য হিজাযীরা তাঁদের মতবাদের সম্পূর্ণ মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। তদুপরি হিজাযীয় আইনগত হাদীসের প্রতি স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্বের দরুনও তাদের দৃষ্টিসীমা অনেকখানি ব্যাহত হয়েছিল। এমতাবস্থায় তারা নজীর স্বরূপ হযরত রসূলুল্লাহ্ ও তাঁর সাহাবীদের আওতার বাইরে যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল এ কথা সত্য যে, তারা বাস্তবের মূল্য স্বীকার করতো, কিন্তু তারা তাদের জ্ঞাত বাস্তবকেই চিরন্তন করে তুললো, বাস্তবকে বিশ্লেষণ করতে ক্বিয়াসের প্রয়োগ করলো না বললেই চলে। যা হোক, আবু হানীফাপন্থীদের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদের ফলে 'বাস্তব মুক্তিলাভ করলো বলা যায়। সাথে সাথে, আইন ব্যাখ্যাকালে জীবনের স্বাভবিক গতি-ধর্মিতা ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সজাগ থাকার প্রয়োজনও বিশেষভাবে অনুভূত হল। এই বাক-বিতণ্ডার ফল অবশ্য আবু হানীফাপন্থীরাই পূর্ণভাবে আত্মস্থ করে। পরিণামে তারাই অর্জন করে মূলনীতিভিত্তিক পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ইসলামের অন্যান্য মযহাব-অবলম্বীদের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে অধিকতর সৃজনশক্তি ও আহরণ ক্ষমতা । দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমানকালের হানাফী আইনবেত্তারা নিজ মযহাবের মর্মবাণী উপেক্ষা করে আবু হানীফা ও তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী ব্যাখ্যাদাতাদের মতামতকে চিরন্তনতার মর্যাদা দান করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা আবু হানীফা বিরোধীদের সাথে হাত মিলিয়েছেন বললে অন্যায় হবে না। প্রকৃতপক্ষে, হানাফী মযহাবের অন্যতম মৌলিক নীতি 'ক্বিয়াস' কার্যত ইজতিহাদেরই নামান্তর। ইমাম শাফিয়ী এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। আর এ নীতি সর্ববাদী স্বীকৃত যে, ইজতিহাদ কুরআনের নির্দেশ সাপেক্ষে স্বাধীনতার অধিকারী। নীতি হিসেবে এর গুরুত্ব বিচারে ক্বাযী শওকানী বলেন, প্রায় সব বিধানাচার্যের মতেই এ প্রথা হযরত রসূলুল্লাহ্‌র জীবনকালে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ইজতিহাদের দ্বার রোধ করা হয়েছে সম্পূর্ণ কাল্পনিক অনুশাসনের সহায়তায়। এর

জন্যে দায়ী কতকটা ইসলামী আইনক্ষেত্রে বুদ্ধির আড়ষ্টতা আর কতকটা সাধারণ চিন্তাবিমুখতা, যা বিশেষ করে জাতির আধ্যাত্মিক অধোগতির দিনে পূর্বতন চিন্তাবিদদেরকে দেব-বিগ্রহে রূপান্তরিত করে। পরবর্তী বিধানদাতাদের কেউ কেউ এই কাল্পনিক বাধা-নিষেধ সমর্থন করে গেলেও, আধুনিক ইসলাম তাঁদের স্বেচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণের কাছে নিজ চিন্তা-স্বাধীনতা বলি দিতে বাধ্য নয়। হিজরী দশম শতকের লেখক সারকাশী যথার্থই বলেছেন যে, 'এই কল্প-কাহিনীর সমর্থকেরা যদি মনে করেন যে, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় পূর্ববর্তী লেখকদের সুযোগ-সুবিধা অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী ছিল এবং পরবর্তী লেখকদের নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তবে এক কথায় এ ধরনের যুক্তিকে প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। কারণ এ কথা বুঝতে এমন কিছু জ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজন নেই যে, ইজতিহাদ পূর্ববর্তী পণ্ডিতদের চেয়ে পরবর্তী পণ্ডিতদের জন্যেই অধিকতর সহজসাধ্য। প্রকৃত পক্ষে কুরআন-হাদীসের টীকা, ভাষ্যাবলী আধুনিককালে এত অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে যে, আজকের মুজতাহিদদের জন্যে সঞ্চিত উপাদান প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়ে পড়েছে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আশা করি, আপনাদের বুঝতে কষ্ট হবে না যে, বর্তমানে আমরা ইসলামী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যে মনোভাব পোষণ করে চলেছি, ভিত্তিগত মৌলিক নীতির দিক দিয়েই বলুন বা আমাদের বিভিন্ন মযহাবের গঠন-প্রকৃতির বিচারেই বলুন, কোনক্রমেই সে মনোভাব সমর্থনযোগ্য নয়। মুসলিম জাহানের আজ প্রয়োজন প্রখরতর দৃষ্টিশক্তি ও নবতর অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভূতি নিয়ে সামাজিক পুনর্গঠনের কাজে এগিয়ে আসা। সর্বপ্রথমে চাই যথার্থ সৎসাহস। এ কাজ শুধুমাত্র বর্তমান জাগতিক অবস্থার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেয়ে অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ । একদিকে বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) ধাক্কায় তুরস্কের নবজাগরণ, অন্যদিকে মুসলিম এশিয়ার প্রতিবেশী দেশসমূহে যে অভিনব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলবার প্রয়াস চলছে, সেসবের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের গূঢ় মর্মার্থ ও নিয়তির প্রতি সজাগ হওয়া আমাদের জন্যে আজ একান্ত প্রয়োজন। আজ বিশ্ব মানবের জন্যে তিনটি জিনিস চাই :

১. বিশ্ব-জগতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা,

২. ব্যক্তির আধ্যাত্মিক মুক্তি এবং

৩. মানব-সমাজের অধ্যাত্মপন্থী ক্রমবিকাশের জন্যে কতিপয় বিশ্বজনীন মূলনীতি।

অবশ্য বর্তমান ইউরোপ এই পথে নিজ আদর্শসম্মত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, নিছক যুক্তির মারফত যে সত্য লাভ ঘটে, তা জীবন্ত বিশ্বাসের সে শিখা জ্বালাতে পারে না, যা একমাত্র ব্যক্তিগত উপলব্ধি দ্বারা সম্ভব। এই কারণেই শুধুমাত্র চিন্তাবৃত্তির সাহায্যে আজ পর্যন্ত মানুষকে সামান্যই প্রভাবিত করা গেছে আর ধর্ম ব্যক্তির উন্নয়ন ও সমাজের চেহারা বদলে দিতে

অনেকখানি সফল হয়েছে। ইউরোপের আদর্শবাদ কখনো তার ব্যক্তি বা সমাজ জীবনে প্রাণবন্ত শক্তিরূপে ক্রিয়া করে নি। এর ফল দেখা দিয়েছে কতকগুলো পরস্পর অসহিষ্ণু গণতন্ত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে, দরিদ্র শোষণে ধনপতিদের সুযোগ সৃষ্টির রূপে। মানুষের নৈতিক অগ্রগতির পথে ইউরোপ আজ দাঁড়িয়েছে প্রবলতম প্রতিবন্ধক স্বরূপ। পক্ষান্তরে মুসলিম জাতিপুঞ্জ ঐশীবাণীর সহায়তায় এমন একটি চূড়ান্ত আদর্শের অধিকারী, যার বাণী উদ্গাত হয় জীবনের নিগূঢ়তম গভীরতা থেকে এবং যা মুসলিম জীবনের আপাত বহির্মুখী প্রকাশকে অন্তর্মুখী গতি দান করে। সাধারণ মুসলিমের কাছেও জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি এমন একটি দৃঢ় বিশ্বাসের ব্যাপারে যে তার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে সে দ্বিধাবোধ করবে না। জগতে আর কখনো প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হবে না। ইসলামের এই যে এক মৌলিক বিশ্বাস, এর থেকে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আমাদের উন্নততম জাতিদের সঙ্গে আসন পাওয়া উচিত। এই মৌলিক সত্য ইসলাম-পূর্ব এশিয়ার আধ্যাত্মিক দাসত্ব-বন্ধন থেকে সদ্য-মুক্ত প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ধারণার অতীত ছিল। আজকের মুসলমানদের জন্যে একান্তভাবে কাম্য পারিপার্শ্বিক বিশ্বের পটভূমিতে নিজ অবস্থা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা, ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহের আলোকে সমাজ জীবনকে পুনর্গঠিত করা এবং মুসলিম জীবনের যা চরমতম উদ্দেশ্য- আজ পর্যন্ত যার আংশিক বিকাশমাত্র হয়েছে- সেই আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ সাধনে এগিয়ে আসা।

সাত

ধর্ম কি সম্ভব?

স্থূল দৃষ্টিতে ধর্মীয় জীবনকে তিন পর্যায়ে ভাগ করে দেখা যায়, যেমন- বিশ্বাস, মনন ও আবিস্কৃত। প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তির তথা সমগ্র জাতির পক্ষে নিয়মের বাঁধাবাঁধিকে মেনে নেওয়া অপরিহার্য। এ বাঁধাবাঁধি স্বেচ্ছাকৃত হলেও এর কোন অর্থ উদ্ধার বা এর শেষ তাৎপর্য আবিষ্কারের চেষ্টা অবান্তর। জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এ-পর্যায়ের গুরুত্ব প্রচুর; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের মনোবিকাশ বা মনোস্ফূর্তির দিক থেকে বিচার করতে গেলে, একে বেশী মূল্য দেওয়া চলে না। এরপর আসবে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা এবং আলোকের দিশা । পরিপূর্ণ নিয়মানুবর্তিতার অর্থ এখন থেকে হৃদয়ঙ্গম হতে থাকবে এবং নিয়মের পেছনে বিরাজমান মূল তত্ত্বের সাথে অন্তরের যোগ সাধিত হবে। এ পর্যায়ে ধর্মজীবন চায় একটি পরম তত্ত্বমূলক ভিত্তি। এ জীবন নিখুঁত যুক্তির কাঠামোর মধ্যে আল্লাহ্‌কেসহ সমস্ত বিশ্বকে ফেলে দেখতে চায়। তৃতীয় পর্যায়ে পরম তত্ত্বের অন্বেষণের স্থানে হয় মনস্তত্ত্বের উদয়। ধর্মীয় জীবন আর নিরেট তত্ত্বজ্ঞানের খোলসে আচ্ছন্ন থাকবে না। এখন তার লক্ষ্য পরম সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়। এ-পর্যায়ে ধর্ম হয়ে পড়ে ব্যক্তিগতভাবে জীবন ও শক্তিকে আত্মস্থ করার ব্যাপার। ব্যক্তি এখন মুক্ত সত্তার অধিকারী হয়। অবশ্য এ মুক্তি নীতির বাঁধন থেকে তার মুক্তি নয়; বরং সে তার গভীর চেতনার অন্তঃস্থলে ঐ নীতির মূল সূত্র আবিষ্কার করে। এ তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে জনৈক মুসলিম সুফী ঘোষণা করেছেন যে, 'পবিত্র কুরআনকে সে-ই সত্যিকার রূপে বুঝতে পারবে, যার কাছে তা রসূলুল্লাহ্‌র কাছে যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল ঠিক সেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে; নচেৎ অসম্ভব।' ধর্মীয় জ্ঞান ও অনুভূতির এই যে তৃতীয় পর্যায়, ধর্মের এই অর্থেই আমি ধর্মকে আজ বিচার করতে চেষ্টা করব। দুর্ভাগ্যবশত ধর্মের এ-রূপকে বলা হয়েছে দুর্জ্ঞেয় 'মরমীবাদ'- যা জীবনের প্রতি বিমুখ, তথ্যের প্রতি উদাসীন এবং আমাদের আজকের অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিকূল। তবুও একথা আশ্চর্য ঠেকলেও সত্য যে, ধর্মের উন্নততর স্তরে প্রশস্ততর জীবনেরই অভিজ্ঞতার অনুসন্ধান করা হয়। বিজ্ঞান অভিজ্ঞতার গুরুত্ব বুঝতে পারবার অনেক আগে থেকেই ধর্ম-জীবনের ভিত্তি স্বরূপ এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। ধর্মের যে পর্যায়ের কথা আমি বলছি, তাকে বলা যায় মানুষের মনোচেতনাকে পরিচ্ছন্ন ও সুসমঞ্জস্য রূপ দেবার আন্তরিক প্রচেষ্টা, যাতে প্রকৃতিবাদের মতোই অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা করে গ্রহণ বা বর্জন করা হয়। অধিবিদ্যা (metaphysics) কি সম্ভব? এ প্রশ্ন উত্থাপন করে তার নেতিবাচক উত্তর দিতে গিয়ে কান্ট যে সব যুক্তির অবতারণা করেছিলেন, ধর্মীয় তথ্যবিচারেও সে

সব যুক্তি সমানভাবেই খাটানো যায়। তাঁর মতে, অনুভূতিকে সরাসরি জ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা চলে না। অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি-সমষ্টিকে জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে, তাকে কতকগুলো শর্ত পূরণ করতে হয়। বস্তু একটি সীমাবদ্ধকারী আইডিয়া মাত্র। এর কাজ কেবল নিয়ন্ত্রণ। কোন বস্তু সম্বন্ধে আমাদের যা ধারণা তার মূলে খাঁটি কিছু যদি থেকে থাকে তবে তা আছে অনুভূতির সীমানার বাইরে; কাজেই তাকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ কর সম্ভব নয়। কান্টের এ নির্দেশ অবশ্য বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা চলে না। বিজ্ঞান ইতোমধ্যে আমাদের অনেক নতুন কথা শুনিয়েছে। 'বস্তুকে' আজ আমরা ভাবতে শিখেছি 'বোতলেপোরা আলোক তরঙ্গ' বলে, বিশ্বজগতকে জানতে পারছি একটি চিন্তার রূপায়ণ হিসেবে, স্থান-কাল এ আজ সীমাবদ্ধতা আরোপিত হয়েছে, প্রকৃতির রীতিনীতি জ্যামিতির ফাঁদে আর ধরা দিচ্ছে না। এমতাবস্থায় অনুভূতিমূলক ধর্ম তত্ত্বকে একটি জ্ঞানগ্রাহ্য সূত্র ও ব্যবস্থার আওতায় এনে দাঁড় করানো কান্ট এর কাছে যতটা বিসদৃশ মনে হয়েছে ততটা না হতেও পারে। আপাতত আমাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাবার প্রয়োজন নেই; এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তাঁর মত বস্তুর প্রকৃত রূপ অনুভূতি সীমানার বহির্ভূত, সুতরাং তা নিরেট যুক্তিরও অতীত-এ মেনে নিতে হলে পূর্বাহ্নেই স্বীকার করতে হবে যে, মানুষের সাধারণ স্তরের অনুভূতির অতীত আর কোন প্রকারের অনুভূতি অসম্ভব। অতএব প্রশ্নটি এইভাবে দাঁড়ায় : আমাদের সাধারণ স্তরের অনুভূতিই কি একমাত্র জ্ঞানপ্রসূ অনুভূতি? প্রজ্ঞান তত্ত্বের সম্ভাবনা বিচারে কান্টের প্রশ্নটি বিশেষ রূপ লাভ করেছে তাঁর বস্তুর প্রকৃত রূপ এবং বাহ্যিক রূপ সংক্রান্ত ধারণা থেকে। কিন্তু তিনি ব্যাপারটিকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন, তার উল্টো দিক থেকে আরম্ভ করলে কেমন হয়? যশস্বী মুসলিম সূফী দার্শনিক স্পেনের মুহিয়ুদ্দীন ইবনুল আরাবী মন্ত ব্য করেছেন যে, আল্লাহ্ই অনুভূতি স্বরূপ এবং দৃশ্যমান জগৎ একটি প্রত্যয়মাত্র। আর একজন মুসলিম সূফী ও সাধক কশ্বি ইরাকীর মতে, স্থান-কাল যোগও বহু এবং বিচিত্র। 'ঐশীকাল' এরও অস্তিত্ব আছে। এমনো হতে পারে যে আমরা যে বাহ্যিক জগৎ বলি, তা আমাদের বুদ্ধির সৃষ্টিমাত্র। মানবীয় অনুভূতির এমন আরও অনেক স্তর আছে যা সম্পূর্ণ আলাদা স্থান-কাল যোগের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে। এসবের বিচার-বিশ্লেষণের কাজ সাধারণ মানবীয় অনুভূতির কাজের মত নয়। এখানে অবশ্য বলতে পারেন, মানবানভূতির যে স্তর সাধারণ প্রত্যয়ের অতীত, তা থেকে সার্বজনীন জ্ঞান আহরণ সম্ভব হবে কি করে? একমাত্র প্রত্যয়-বোধ থেকেই সামাজিক সমঝোতা আসতে পারে। এখানে স্পষ্ট ভাষায় বলা আবশ্যক যে, ধর্মীয় অনুভূতির মাধ্যমে যাঁরা সত্য আবিষ্কারে আগ্রহী হবেন, তাঁদেরকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ওপরই নির্ভর করতে হবে এবং তা অন্যকে জানানো সম্ভব হবে না। উপরোক্ত আপত্তিটিকে বেশ কিছুখানি শক্তিশালী বলে মানতে হবে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, মরমীবাদী কেবল তার নিজস্ব সাধনা-পথ, চিন্তা-ধারা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। রক্ষণশীলতা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন অবাঞ্ছনীয়, ধর্মের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি।

এতে মানবসত্তার সৃষ্টিধর্মী স্বাধীনতা লোপ পায় এবং নবতর আধ্যাত্মিক স্ফূরণের পথ রুদ্ধ হয়। এই কারণেই মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিক সাধনা-পদ্ধতি সেই পুরাতন মহাসত্যের আবিষ্কার পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়। যা হোক ধর্মীয় অনুভূতি পরস্পর আদান-প্রদান যোগ্য নয়- এ কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তার সন্ধান নিরর্থক নয়। বস্তুত এর থেকেই আমরা মানব-সত্তার আসল প্রকৃতির পরিচয় পেতে পারি। দৈনন্দিন সামাজিক মেলামেশার ব্যাপারে আমরা যেন এক প্রকার অবরোধের মধ্যেই কাল যাপন করি। এ ব্যাপারে মানুষের ভিতরকার ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচয়ের চেষ্টা আমরা করি না। সামাজিক মানুষকে আমরা বুঝি বাইরে তার সাথে আমাদের যা সম্পর্ক বা আমাদের অন্তরে তার ব্যক্তিত্বের যে ছাপ পড়েছে তা থেকে। কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির চরম লক্ষ্য হল ব্যক্তিসত্তাকে তার স্বকীয় রূপে আবিষ্কার করা। এর জন্যে বাহ্যিক ও নৈমিত্তিক রূপের খোলসকে ভেদ করে অনেক দূরে গভীরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। একে সম্ভব করবার জন্যে চাই পরম সত্যের সংস্পর্শ। ব্যক্তিসত্তা পরম সত্তার সান্নিধ্যে এসেই আবিষ্কার করতে পারে নিজের অনন্যসাধারণতা, নিজের প্রজ্ঞানিক মর্যাদা এবং সেই মর্যাদার উন্নয়ন সম্ভাবনা। প্রকৃতপক্ষে যে অনুভূতি থেকে এই আত্মদর্শন আসে, তাকে বুদ্ধির জোরে অনুধাবন করা যায় না। যুক্তিবাদের সূক্ষ্ম জাল বিস্তারে এর নাগাল পাওয়া যায় না। এ সত্যানুভূতি জীবন্ত; অন্তরের জৈবিক রূপায়ণ থেকে এর অভ্যুদয়। এই কালাতীত অনুভূতি বিশ্বজগৎকে গড়তে পারে, ভাঙতে পারে এবং কেবল এই আকারেই এর মর্মার্থ কালগতির সাথে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে সাময়িক ইতিহাসের চোখে কার্যকরীভাবে প্রতিভাত হয়। বাহ্যিক প্রত্যয়ের কষ্টিপাথরে সত্যকে যাচাই করার প্রয়াস অনেকখানি ছেলেখেলারই মতো। ইলেকট্রন বা বিদ্যুৎকণা আসলে কোন বস্তু কি-না, বিজ্ঞান তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। ইলেকট্রন কেবল একটি প্রতীক বা একটি প্রথাসিদ্ধ ধারণা মাত্রও হতে পারে। পক্ষান্তরে জীবনধারার সাথে সত্যিকারভাবে জড়িত ধর্মই একমাত্র যোগ্য হাতিয়ার যাকে দিয়ে পরম-সত্যের রূপ উদঘাটনের কার্যকরী প্রচেষ্টা চলতে পারে। তা ছাড়া ধর্মাশ্রয়ী উন্নততর অনুভূতির সাহায্যে আমাদের দর্শনসম্মত ধর্মতত্ত্বের সূত্রাদি এবং ধারণাবলীর সংস্কারও সম্ভব। অন্ততঃপক্ষে নিছক যুক্তিসিদ্ধ ধারণাবলীর দুর্বলতা সম্পর্কে আমাদের অন্তরকে সজাগ রাখবার কাজে একে অনায়াসে নিয়োজিত করা চলে। ল্যাঞ্জ প্রজ্ঞানকে 'কবিতার যুক্তিযুক্ত ধরন' বলে অভিহিত করেছেন। নীটশে আরও তীব্র ভাষায় একে বলেছেন 'বয়ঃপ্রাপ্তদের একটি বিধিসম্মত খেলা।' বস্তুত বিজ্ঞানীরা অধিবিদ্যাকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করে চলতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞান যতই কেন বলুক না যে 'এ একটি মারাত্মক মিথ্যার বেসাতি' বা 'মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও চাল-চলনকে আয়ত্তে রাখবার একটি যেন-তেন কৌশল', তবুও ধর্মবিশেষজ্ঞরা বিজ্ঞানীর এ কথায় তুষ্ট থাকতে পারে না। ধর্ম বিশেষজ্ঞরা জানতে চায়, এ বিশ্বব্যবস্থায় তাদের যথাযথ স্থান কোথায়। সত্যের চরম প্রকৃতি বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নয়; কাজেই বিজ্ঞানের অনুসন্ধান অভিযানে সত্যের চরম প্রকৃতির বিকৃত অর্থ হওয়ার আশংকা নেই। কিন্তু ধর্মের কথা আলাদা।

সত্যের চরম প্রকৃতিই তার অনুসন্ধানের বিষয়। সুতরাং ধর্মের অনুসন্ধান ভুল পথে চালিত হলে মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিপদ হতে পারে, কারণ ব্যক্তিসত্তাই তার জীবনের মূল কেন্দ্র স্বরূপ। কর্মকর্তার ভাগ্য নির্ভর করে তার কর্মের উপর। প্রান্তির ভিত্তির উপর এ কর্ম প্রতিষ্ঠিত হলে চলে না। ভ্রান্ত প্রত্যয় বিচারবুদ্ধিকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করে। মন্দ কাজ সমগ্র মানুষটির অবনতি ঘটায় এবং তার ব্যক্তি-সত্তার ধ্বংসের কারণ হতে পারে। শুধু প্রত্যয় জীবনকে সামান্য প্রভাবিত করে, কিন্তু পরম-সত্যের সঙ্গে কর্মের সম্বন্ধ সক্রিয়। পরম সত্তার প্রতি সমগ্র মানুষের যে মনোভাব, তা-ই হলো কর্মের উৎস। এই মনোভাব মোটামুটি একই রকম থাকে। ভিতরে ও বাইরে কর্মের একটা ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র রূপ আছে। তবু কর্মের একটা সামাজিক রূপও গড়ে উঠতে পারে, যখন অন্যেরাও এরূপ কর্মের মারফত পরম-সত্তার সান্নিধ্য কামনা করে। সর্বদেশের এবং সর্বযুগের ধর্ম-বিশেষজ্ঞরা এই সাক্ষ্যই দিয়ে এসেছেন যে, আমাদের সাধারণ চেতনাস্তরের সন্নিকটে আরও একটি চেতনাস্তরের উৎস প্রচ্ছন্ন আছে। এইসব প্রচ্ছন্ন চেতনার উন্মেষে আমরা যদি নবতর জীবনপ্রসূ এবং জ্ঞানপ্রসূ অনুভূতির সম্ভাবনা দেখতে পাই, তবে উন্নততর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির রূপায়ণ হিসেবে ধর্মের অস্তিত্বকে যথার্থ বলে মেনে নিতে আমরা ন্যায়ত বাধ্য এবং তার বিচারে আমাদের গভীর মনোনিবেশ করা দরকার।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, 'ধর্মের ভবিষ্যৎ কি' প্রশ্নটি অবান্তর নয়। তা ছাড়া আধুনিক সংস্কৃতির ইতিহাসে, বিশেষ করে আজকের পরিপেক্ষিতে এ প্রশ্ন উত্থাপনের আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। প্রথমেই আসে এর বৈজ্ঞানিক বিচারের প্রসঙ্গ। পদার্থ বিজ্ঞান তার উন্নতি পথে চলতে চলতে আগের অনেক প্রিয় মতবাদকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। যে বিজ্ঞান আজ প্রশ্ন করেছে : কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ রূপই কি প্রকৃতির একমাত্র এবং সমগ্র রূপ? পরম সত্য কি আমাদের চেতনায় অন্যান্য দিক থেকেও সাড়া জাগাচ্ছে না? প্রকৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যে আমাদের বুদ্ধি পথই কি একমাত্র পথ? অধ্যাপক এডিংটনের ন্যায় জগৎমান্য বিজ্ঞানীও স্বীকার করেছেন যে, 'পদার্থবিদ্যার সূত্রাদি স্বভাবতই সত্যের মাত্র অংশবিশেষের উপর আলোকপাত করতে পারে। বাকী অংশ নিয়ে কি করা যাবে? অন্য অংশ সম্পর্কে অবশ্য একথা বলা চলে না যে, যা পদার্থবিদ্যার আয়ত্তের বাইরে তা আমাদের জীবনে নিষ্প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনভূতি আমাদের চেতনার যতখানি মনোবৃত্তি, আদর্শ ও মূল্যবোধ, এ সবও তার চেয়ে কম নয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনুসরণ করে আমরা বিজ্ঞানীর বাহ্যিক জগতে উপনীত হই; আমাদের প্রকৃতির অন্য উপকরণ অনুসরণ করেও আমরা স্থান-কালের অতীত এক জগতে গিয়ে হাজির হই।

দ্বিতীয়ত, প্রশ্নটির অপরিসীম ব্যবহারিক গুরুত্বের দিকেও আমাদের নজর দিতে হয়। এ যুগের মানুষ একদিকে সমালোচনা দর্শনের শাণিত অস্ত্রে এবং অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যবাদের লৌহ-বর্মে নিজকে যতই সজ্জিত করছে, ততই জীবন সমস্যা তার কাছে

উত্তরোত্তর জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রকৃতিবাদ তাকে এক হাতে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের অভূতপূর্ব ক্ষমতার অধিকারী করেছে, অন্য হাতে ভবিষ্যতের প্রতি তার আস্থা ও প্রত্যাশাকে ধূলি লুণ্ঠিত করে দিয়েছে। একই ধারণা দুইটি বিভিন্ন সংস্কৃতিতে কতখানি ভিন্নমখী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, তার একটি উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য। মুসলিম জগতে যখন বিবর্তনবাদের অভ্যুদয় ঘটলো; তখন মানব গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ বিকাশের উজ্জ্বল স্বপ্নে রূমী উল্লাসিত হয়ে উঠেছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি লাইন পড়লে যে কোন কৃষ্টিবান মুসলিমের অন্তরে আনন্দ শিহরণ জাগতে বাধ্য :

ভূ-গর্ভের গভীর প্রদেশে
খনি এবং পাথরের রাজ্যে কতকাল বিরাজ করেছি,
তারপর, হেসেছি আমি ফুলের বিচিত্র রঙে;
কালের দুরন্ত-উদ্দাম প্রবাহের সাথে
অন্তরীক্ষে, মৃত্তিকায় এবং সমুদ্রে বিচরণ করে
নবতর জীবনে
গভীর জলে আমি সন্তরণ করেছি,
অসীম আকাশে আমি ডানা মেলেছি,
কঠিন মৃত্তিকায় আমি হামা টেনেছি, ছুটেছি;
আমার মর্মের সর্ব রহস্য কেন্দ্রীভূত হয়ে
দেখা দিল মানুষ রূপে।
তারপর, আমার গন্তব্য-
মেঘমালার উর্ধ্বে, তারকারাজির সীমা পেরিয়ে,
যেখানে নেই পরিবর্তন, নেই মৃত্যু-
ফেরেশ্‌তার রূপে-তারপর আরও অসীমে
রাত্রি-দিবার সীমা পেরিয়ে
জীবন-মৃত্যুর সীমা পেরিয়ে
দৃশ্য-অদৃশ্যের সীমা পেরিয়ে
যেখানে যা আছে, অনন্ত কাল ধরে আছে
-একক-সম্পূর্ণ!...

(জালালুদ্দীন রূমী)

অন্যদিকে এই একই বিবর্তনবাদ ইউরোপে আরও সুসংবদ্ধভাবে ব্যাখ্যাত হয়ে এই বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে যে, মানুষের যে এত সমৃদ্ধ জীবন, মৃত্যুর সঙ্গেই এর শেষ। আধুনিক মানুষের নৈরাশ্য এমনিভাবে বৈজ্ঞানিক কথার মারপ্যাঁচের ভিতর লুকিয়ে আছে। নীট্‌শে অবশ্য বলেছেন যে, বিবর্তনবাদ মানুষের পরজীবনকে অসম্ভব মনে করে না, কিন্তু তাঁর একথাও নৈরাশ্যবাদেরই নামান্তর। কারণ, তিনি মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদিতার অতিআগ্রহেও এর বেশী বলতে পারেন নি যে, মানুষ অনন্তকাল পর্যন্ত পুনর্জন্ম গ্রহণ করবে। এ চিরন্তন পৌনঃপুনিকতাবাদ হতাশার বাণী, সৃষ্টিধর্মী অমরত্বের বাণী নয়।

আধুনিক মানুষ তার বুদ্ধির আবিষ্কার ও উপলব্ধি দ্বারা এতদূর সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে, আধ্যাত্মিকতার আবেদন তার জীবনে আর নেই বললেই চলে। নিজ অন্তরের সাথেই তার যোগ নেই। চিন্তা-জগতে যেমন তার নিজের সাথে দ্বন্দ্ব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জবিনেও তেমনি অপরের সাথে তার দ্বন্দ্ব। বিকট আত্মসর্বস্বতা, অফুরন্ত ঐশ্বর্য-পিপাসা তাকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে; অপরপক্ষে তার লাভ হয়েছে জীবনব্যাপী অবসাদ। বাহ্যত যা সত্য, তা-ই তার কাছে চরম সত্য, তা-ই আজ তার প্রেরণার একমাত্র উৎস। জীবনের অনাবিস্কৃত গভীরে লালিত সত্যের আমন্ত্রণ তার কাছে একান্ত ব্যর্থ। বস্তুবাদের পরিণতি যে জীবনে অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা ও অবসাদ ডেকে আনবে, হাক্সলি পরম বেদনার্ত চিত্তে এই আশংকাই করেছিলেন। আধ্যাত্মধর্মী প্রাচ্যের অবস্থাও আজ পাশ্চাত্যেরই মতো। এককালে যে মধ্যযুগীয় মরমী সাধনার ধারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্ম-জীবনে একই ভাবে সহায়তা করেছিল, আজ তার অবনতি উভয় ক্ষেত্রেই প্রকট। অধিকন্তু এই মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মবাদের অপকারিতা মুসলিম অধ্যুষিত প্রাচ্যেই বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। সাধারণ মানুষের আত্মিক জীবনকে কালের গতিধর্মের সাথে সুসামঞ্জস্য করে না তুলে এ বরং আমাদের জীবনে এনেছে এক অসার বৈরাগ্যভাব। এ আমাদের শিক্ষা দিয়েছে অজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক দাসত্বের নিগড়ে তৃপ্তিলাভের মনোবৃত্তি। এই অব্যবস্থিত চিত্ততা থেকে মুক্তি খুঁজতে গিয়ে মুসলিম তুর্ক, মিসর ও ইরান দেশপ্রেম ও জাতীয়তার আপাতঃমনোরম বন্ধনকে বরণ করেছে যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাকে নীট্‌শে মনের রোগ, যুক্তিহীনতা ও কৃষ্টির শত্রু বলে বর্ণনা করেছেন। একমাত্র ধর্মীয় পন্থাতেই সত্যিকারের আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন সম্ভব হতে পারে এবং এই ধর্মীয় পন্থাই মানুষকে অনন্ত জীবন ও অপরিসীম ক্ষমতার সান্নিধ্যে আনতে পারে। আজকের মুসলমান আমরা এ বিশ্বাস ও দৃষ্টিভফঙ্গ হারিয়েছি বলেই চিন্তা ও মনোভাবের বিস্তৃতির পরিবর্তে আমরা মনোবৃত্তি সংকোচ সাধন করে শক্তিমান হবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছি। আধুনিক নাস্তিক্যপুষ্ট সমাজবাদে একটি নবধর্মের উদ্যম আছে এবং এ-ব্যাপারে তা উদারতর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু উগ্র হেগেলবাদের আদর্শে যেভাবে এর দার্শনিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, তাতে যে মানসিকতা শক্তি ও উদ্দেশ্য-মাহাত্ম্য একে সমুন্নত করে তুলতে পারত তারই বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সকলেই স্বীকার

করবেন যে ঘৃণা, সন্দিগ্ধতা, ক্রোধ ইত্যাদি মানবাত্মাকে কলুষিত করে এবং তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশপথ রুদ্ধ করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ ও নাস্তিক্যপুষ্ট সমাজবাদের যতই প্রশংসা করুন না কেন, একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, এ সব 'গুণাগুণ'ই ঐ শ্রেণীর মতবাদের মূল উপজীব্য। মানুষ আজ সর্বতোভাবে হতাশার সম্মুখীন। মধ্যযুগীয় আধ্যাত্ম রীতি যেমন আজ তাকে কোন আশার বাণী শোনাতে পারছে না, তেমনি আধুনিক জাতীয়তাবাদ বা নাস্তিক্যপুষ্ট সমাজবাদও তার অন্তরে নবতর প্রেরণা যোগাতে অক্ষম হয়েছে। আধুনিক সংস্কৃতির ইতিহাসে আজকের দিন বাস্তবিকই একটি সংকটের দিন। জীব-জগৎ এখন এমন এক অচলাবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, নবতর বিকাশ ছাড়া তার আর এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। বিজ্ঞানের অগ্রগতি আনুষ্ঠানিক ধর্মের ভিত্তি ভেঙে দিয়েছে। তার সাথে ভেঙে পড়েছে সমাজ বাঁধনের নৈতিক ভিত্তি। এখন নতুন ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কঠিন দায়িত্ব বর্তমান মানুষের উপর পড়েছে। এর জন্যে যে বলীয়ান নৈতিক চরিত্র চাই, তা সে পেতে পারে একমাত্র ধর্মেরই কাছে; কারণ ধর্ম তার সুবিকশিত স্তরে অন্ধবিশ্বাসের বন্ধন, পুরোহিতানুগত্য বা গতানুগতিক ক্রিয়া-কলাপে নিবদ্ধ নয়। মানব চিত্তের এরূপ একটি বিশ্বাসপুষ্ট প্রকাশই তার ব্যক্তিত্বকে বর্তমান জীবনে অগ্রগতির সহায়ক ও ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠার বাহন রূপে গড়ে তুলতে পারে। মানুষ আজ নিজের আদিকারণ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিচারে যদি উন্নততর দৃষ্টি অর্জন না করতে পারে তবে আজকের অমানুষিক প্রতিযোগিতাপ্রবণ সমাজব্যবস্থা এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব জর্জরিত আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শ ও সভ্যতার নিম্নগতি রোধ করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

আগেই বলা হয়েছে যে, জগত-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের নীতি সন্ধানে এবং তার সহায়তার ব্যক্তি-জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জের বিকাশ সাধনে মানব সভ্যতায় ধর্ম পরম আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে এসেছে। অবশ্য আজকের মনস্তাত্ত্বিকের কাছে সেকালের ধর্ম বিশেষজ্ঞের পরিভাষা অনেকখানি অপাংক্তেয়। তা সত্ত্বেও দুনিয়ার সমস্ত ধর্ম সাহিত্য ও ধর্ম সাধকদের ব্যক্তিগত অনুভূতিলব্ধ তথ্যাবলী এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ধর্মীয় অনুভূতিও আমাদের সাধারণ অনুভূতির মতোই স্বাভাবিক ব্যাপার। এসব অনুভূতিলব্ধ তথ্য সাক্ষ্য দেয় যে, ধর্মসাধক তাঁর সাধনা থেকে একটি অতীন্দ্রিয় জ্ঞানাত্মক দৃষ্টি লাভ করেন এবং এই দৃষ্টির ফলে সত্তার প্রচ্ছন্ন শক্তিপুঞ্জের উন্মেষ ও কেন্দ্রায়ন সম্ভব হয়। এই প্রক্রিয়া সাধককে একটি নবতর ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তোলে। মানব-ব্যক্তিত্বের এই সচেতন রূপান্তরকে স্নায়বিকরোগসম্ভূত বা বাস্তবজ্ঞান-বহির্ভূত বললেই এর প্রকৃত ও চরম মূল্য সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হল না। পদার্থ বিজ্ঞানের সীমার বাইরে কোন জ্ঞানমার্গের যদি সম্ভাবনা থাকে, তবে সাহসের সাথে সে সম্ভাবনার সম্মুখীন হতে হবে। এর ফলে আমাদের সাধারণ জীবন ও চিন্তাধারাকে কিছুটা ব্যতিক্রম বা সংশোধনেরও যদি প্রয়োজন হয়, তাতে পরোয়া করলে চলবে না। সত্যের খাতিরে আমাদের বর্তমান মনোভাব ত্যাগ করতেই হবে। মানুষের ধর্মীয় মনোভাব যদি

মূলত কোন শরীরগত বিপর্যয় থেকেও উদ্ভূত হয়ে থাকে তাতে কিছু আসে যায় না। জর্জ ফক্স স্নায়বিক রোগগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু সমসাময়িক ইংল্যান্ডের ধর্মজীবনের তাঁর শুদ্ধিমূলক প্রভাব অনস্বীকার্য। মোহাম্মদকেও একজন মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই বিরাট ব্যক্তিত্ববান পুরুষ মানবসভ্যতার গতি পরিবর্তন করে দিয়েছেন; একটি দাস সম্প্রদায়কে মানুষের নেতৃত্বে সমাসীন করেছেন; এমন কি সমগ্র মানব জাতির জীবনধারা ও সমাজ-পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তনের প্রেরণা যুগিয়েছেন। মনোবিকারের কোন বিশিষ্ট প্রকাশ থেকে যদি পৃথিবীর ইতিহাস এতখানি বিপর্যয় সম্ভব হয়, তবে মনস্তাত্ত্বিকের বিচারেও এহেন মনোবিকারের মূল প্রেরণা সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন অত্যধিক। তাছাড়া হযরত মুহাম্মদের কর্মপ্রচেষ্টা মানব জীবনে যেভাবে কার্যকরী হয়েছে তাতে তাঁকে মস্তিষ্কের ভ্রান্তি আশ্রিত আধ্যাত্মিকতার রূপায়ণ বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তাঁর জীবন সাধনাকে বুঝতে হলে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর সাধনা কোন আকস্মিক বিচ্ছিন্ন ব্যাপার ছিল না; এ ছিল কোন সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির প্রয়োজনে উদ্ভূত প্রেরণার উৎস, নবসৃষ্টির যাত্রা পথের উদ্বোধন। নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হবে যে, মানবজাতির সংবিধানের সৌকর্যের জন্যে অমন মনোবিকারগ্রস্তের প্রয়োজন আছে। তথ্য বিশ্লেষণ ও তার কারণ খুঁজে বের করা তাঁর কাজ নয়; তাঁর কারবার জীবন নিয়ে, জীবনের গতি নিয়ে এবং তারই মারফত মানব জাতির কর্মজীবনের জন্যে নতুন পথনির্দেশ নিয়ে। অবশ্য পদস্খলন বা ভ্রান্তি তাঁরও হতে পারে, যেমন হতে পারে বাহ্যেন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল বিজ্ঞানীর। কিন্তু তাঁর কর্যক্রম অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, নিজ অভিজ্ঞতাকে ভ্রান্তি মুক্ত করে দাঁড় করাতে তাঁর সাধনা বিজ্ঞানীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

আমাদের মত বাইরের লোকের কর্তব্য হচ্ছে এই অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপারটির প্রকৃতি ও তাৎপর্য অনুধাবন করার কোন কার্যকরী প্রণালী খুঁজে বের করা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইতিহাস পদ্ধতির প্রবর্তক ইব্‌ন খাল্‌দুনই প্রথম মানব মনস্তত্ত্বের এই বিশেষ অধ্যায়ে বিস্ত ারিত গবেষণা করে গেছেন। মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় আজ-কাল আমরা 'অব্যক্ত অহং বলতে যা বুঝি, তার সূত্র তিনিই প্রথম দিয়ে গেছেন। তারপরে ইংল্যান্ডের স্যার উইলিয়াম হ্যামিল্টন এবং জার্মানীর লাইবনিজ মনোরাজ্যের আরও অজ্ঞাততর অনুভূতিসমূহের কিছু কিছু নিয়ে অনুসন্ধান চালনা করেছেন। জাঙ্গ বোধ হয় সত্য সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে, ধর্মের মৌলিক প্রকৃতি বিশ্লেষণমূলক মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিসীমার বাইরে। বিশ্লেষণমূলক মনস্তত্ত্বের সাথে কাব্যকলার সম্পর্ক বিচারে তিনি বলেছেন যে, মাত্র আর্টের রূপ বিকাশের ক্ষেত্রেই মনস্তত্ত্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতে বাধ্য। তাঁর মতে :

"মনস্তত্ত্বের মাধ্যমে আর্ট-এর মৌলিক রূপ উদঘাটন সম্ভব নয়। ধর্মের ব্যাপারেও এই সিদ্ধান্ত পুরাপুরি খাটে। সে ক্ষেত্রেও হৃদয়াবেগ এবং প্রতীক বিচারে মাত্র মনস্ত

াত্ত্বিক বিবেচনা চলতে পারে; তার সাথে ধর্মের নিগূঢ় অভিব্যক্তির কোন সম্বন্ধ নেই, থাকতে পারে না। যদি থাকত, তা হলে শুধু ধর্ম নয়, আর্টও মনস্তত্ত্বের মাত্র একটি অংশবিশেষের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত।"

জাঙ্গ অবশ্য তাঁর লেখায় নিজের নীতি নিজেই একাধিকবার ভঙ্গ করেছেন। ফলে আধুনিককালের মনস্তাত্ত্বিকদের কাছ থেকে ধর্মের নিজস্ব রূপে এবং মানবব্যক্তিত্বের উপর তাঁর প্রভাব সম্পর্কে আমরা কোন হদিস পাই না। বরঞ্চ ধর্মের উন্নততর অভিব্যক্তির বিচারে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা শত-সহস্র অবান্তর থিয়োরীর জন্মদান করে গেছেন এবং তার ফলে সত্য সন্ধানীকে একান্ত নৈরাশ্যজনকভাবে বিপথগামী করেছেন। এ সব তত্ত্বালোচনা থেকে পাঠকের মোটের উপর যে ধারণা জন্মাবে তার মর্ম হল এই :

মানবসত্তাকে তার নিজ পরিধির বাইরে কোন বাস্তব সত্যের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন সহায়তাকল্পে ধর্মকে নিয়োজনে কোন ফায়দা নেই। ধর্ম মানব মনের সীমাহীন উদ্দামতার আঘাত থেকে সমাজের নীতি-শৃঙ্খলাকে রক্ষা করবার একটি সুবিবেচিত জৈবিক কৌশলমাত্র। এই কারণেই অধুনাতন কালের মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে খৃষ্টধর্ম ইতোমধ্যেই তার জৈবিক প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলেছে। আজকের মানুষের কাছে খৃস্ট ধর্মের আদি কারণপরম্পরা বুঝতে পারা অসম্ভব। জাঙ্গের কথায় :

খৃস্টধর্মের আদি মর্ম আমরা আজও কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম, যদি আমাদের রীতি-নীতিতে প্রাচীন সিজারীয় রোমের বল্গাহীন ইন্দ্রিয়াসক্তি ও ক্রূর পাশবিকতার একটি স্ফুলিঙ্গও অবশিষ্ট থাকত। আজকের সভ্য মানুষ সমাজের সে স্তর ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে এসেছে। যে যুগ প্রয়োজনে খৃস্টধর্মের অভ্যুদয় ঘটেছিল তার অস্তিত্ব আর নেই, তাই আজকে আমরা তার মর্ম বুঝতে অক্ষম। আমরা বুঝতে পারি না, কিসের বিরুদ্ধে খৃস্টধর্ম আমাদের রক্ষা করতে চায়। আজকের আলোকপ্রাপ্ত মানুষের কাছে তথাকথিত 'ধার্মিকতা' স্নায়বিক বিকারের অত্যন্ত কাছাকাছি ব্যাপার। খৃস্টধর্ম বিগত দু' হাজার বছর ধরে আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে যেসব নিরোধ-প্রাচীর গড়ে তুলেছে, তার আড়ালে আমাদের পাপপ্রবণতার চেহারা ঢাকা পড়েছে।'

এ বিশ্লেষণে ধর্মের উন্নততর অভিব্যক্তির কথা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছে। ব্যক্তিসত্তার বিকাশে যৌনবোধ নিয়ন্ত্রণ একটি প্রারম্ভিক পর্যায় মাত্র। সমাজজীবনে প্রত্যক্ষ পারিপার্শ্বিকতায় নৈতিক স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য; কিন্তু সত্তার ধর্মীয় বিকাশের সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার কাছে এ প্রয়োজন নগণ্য। ব্যক্তিসত্তার ঐক্য দুর্বল, ভঙ্গপ্রবণ বা পুনর্গঠনক্ষম, ব্যক্তিসত্তা অধিকতর স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে এবং জানা ও অজানা পরিবেশে নব নব পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সক্ষম- এই উপলব্ধিতেই ধর্ম তার পথে এগিয়ে যায়। এই মৌলিক সত্য উপলব্ধি করার জন্যে উন্নততর ধর্মজীবন সেই সব অভিজ্ঞতার অনুসন্ধান করে, যে অভিজ্ঞতা পরম সত্যের গতিবিধির প্রতীক এবং যে

গতিবিধি ব্যক্তিসত্তার ভাগ্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই ব্যক্তিসত্তা পরমসত্তার সংগঠনের একটি স্থায়ী উপাদান কি-না কে জানে? এদিক থেকে বিচার করলে বুঝতে পারা যাবে যে, আধুনিক মনোবিজ্ঞান ধর্মীয় জীবনের ধারেই পৌঁছুতে পারেনি, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য হতে মনোবিজ্ঞান আজো অনেক দূরে। প্রসঙ্গত সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতীয় সাধক শায়খ আহ্মদ সারহিন্দীর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। তৎকালীন সুফীবাদ তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণমূলক সমালোচনার পরশে নবতর দীপ্তিতে প্রতিভাত হয় এবং তা থেকে একটি নবতর সাধনারীতি জন্মলাভ করে। সূফী সাধনার অন্য সব পদ্ধতি মধ্য এশিয়া ও আরব ভূমি থেকে ভারতে এসেছে। একমাত্র এর পদ্ধতিই ভারত থেকে বহির্মুখীন হয়ে এখনও পাঞ্জাব, আফ্গানিস্তান ও এশীয় রাশিয়ায় জীবন্ত রয়েছে। এ মন্তব্যের পূর্ণ মর্মোদ্ধার আধুনিক মনস্তত্ত্বের ভাষায় সম্ভব বলে আমি মনে করি না, কেননা তেমন ভাষা এখনও সৃষ্ট হয়নি। যা হোক, উপস্থিত আমার উদ্দেশ্য হল, পরমসত্তার সন্ধানরত ব্যক্তিসত্তার অনুভূতিপুঞ্জের বিশালতার আংশিক পরিচয় দেবার চেষ্টা করা। ভাষার কিছুটা বিসদৃশ্যতা লক্ষণীয়; কিন্তু এ ভাষা উদ্ভূত হয়েছে ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে লালিত ধর্মীয় প্রেরণা থেকে । আবদুল মুমিন নামক এক ব্যক্তি শায়খ আহ্মদের নিকট নিজ অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন :

> আকাশ, পৃথিবী, আল্লাহ্র আর্শ্, দোযখ, বেহেশ্ত্, এদের অস্তিত্ব আমার দৃষ্টিতে লোপ পেয়ে গেছে। আমার চতুস্পার্শ্বে কোথাও এদের আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কারুর সামনাসামনি দাঁড়িয়েও আমি তাকে আর দেখতে পাই না। এমন কি আমার নিজ অস্তিত্বও আমার কাছে লুপ্ত। আল্লাহ্ অসীম, অনন্ত। কেউ তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার এই-ই শেষতম সীমারেখা। কোন সাধক এ সীমা অতিক্রম করতে পারেননি।

শায়খ আহমদ-এর মন্তব্য :

যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা করা হল, তার মূলে রয়েছে 'ক্বলবে'র চিরপরিবর্তনশীল জীবনরূপ। দেখা যাচ্ছে যে, সাধক এখনও 'ক্বল্ব্-এর গণনাতীত 'মোক্বাম'-সমূহের এক-চতুর্থাংশও অতিক্রম করেন নি। আধ্যাত্মিক জীবনের এই প্রথম 'মোক্বাম'-এর অভিজ্ঞতাবলী পরিসমাপ্ত করতে তাঁকে বাকী তিন-চতুর্থাংশ অতিক্রম করতে হবে। এই 'মোক্বাম'-এর পরে যে সব মোক্বাম রয়েছে-সেগুলো হচ্ছে 'রূহ', 'সির্রি-খাফী', 'সির্রি-আখ্ফা'। সূফী পরিভাষায় এদের সমষ্টিগত নাম 'আলম-ই আমর।' এ-সব 'মোক্বাম'-এর প্রত্যেকটিরই নিজ বিশিষ্ট অবস্থা ও অভিজ্ঞতাসমূহ রয়েছে। সত্যসন্ধান প্রয়াসী সাধক এসব 'মোক্বাম' অতিক্রম করবার পরে লাভ করতে থাকবেন 'ঐশী নামাবলী' ও 'ঐশী গুণাবলী'র আলোক-দীপ্তি; এবং অবশেষে লাভ করবেন পরম সত্তার আলোক-দীপ্তি। সূফী সাধনার যেসব স্তরের কথা উল্লেখ করা হল, মনস্তত্ত্বের ভাষায় এসবের যে অর্থ বা তাৎপর্যই হোক্ না কেন, এসব বর্ণনা থেকে মুসলিম সূফীবাদের একজন যুগ-প্রবর্তকারী

সংস্কারকের দৃষ্টিতে গূঢ়তম অভিজ্ঞতাবলীর এক সমগ্র বিশ্বের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মতে, বাস্তব সত্যের অনুপম অভিজ্ঞতায় পৌঁছবার আগেই 'আলম্-ই আমর্' বা অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্দীপন ও গতিনির্দেশকারী জগতের সীমা অতিক্রম করে আসতে হবে। এই কারণেই আমি বলেছি যে, আধুনিক মনোবিজ্ঞান এখনও এ অভিজ্ঞতার বহিরাঙ্গনেরও বহু দূরে। ব্যক্তিগতভাবে জীব-বিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থাকে আমি মোটেই আশাপ্রদ মনে করি না। ধর্মীয় জীবনের অভিব্যক্তি কখনও কখনও যে ধারার রূপকে আত্মপ্রকাশ করে, আংশিক জ্ঞান নিয়ে তার বিশ্লেষণমূলক সমালোচনার দ্বারা মানব ব্যক্তিত্বের জীবন্ত উৎসে পৌঁছানোর সম্ভাবনা খুবই কম। ধর্মের ইতিহাসে যৌন-প্রতীক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকতে পারে; অথবা জীবনের কোন কোন গ্লানিময় বাস্তবতা থেকে পলায়নে বা তার সাথে সম্মানজনক আপোষ-সাধনে ধর্মের কাছে আমরা কোন কল্পনাশ্রয়ী সমাধান পেয়ে থাকতে পারি; কিন্তু ধর্মীয় জীবনের মূল উদ্দেশ্য এতে প্রতিভাত নয়। আজকের সমাজ জীবনের শ্বাসরোধকর পরিবেশে এর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে আমরা সক্ষম না হতে পারলেও ধর্মের মূল উদ্দেশ্য অবিচলভাবে একই রয়ে গেছে; এবং সে হল সীমাহীন জীবনপ্রবাহের সঙ্গে সীমাবদ্ধ ব্যক্তিসত্তার যোগসাধন এবং এইভাবে তাঁকে প্রজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা দান। কাজেই মনোবিজ্ঞান যদি মানব-জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে চায় তবে তার কাজ হবে বর্তমান কালের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে জীবনাভিব্যক্তির পরিমাপে নতুন দৃষ্টি-সঞ্জাত কোন স্বাধীন পদ্ধতির উদ্ভাবন। সম্ভবত একজন অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত 'মনোবিকারগ্রস্ত' ব্যক্তির দ্বারাই এ-কাজ সাধিত হতে পারে। এহেন চারিত্রিক সংযোগ আমি অসম্ভব বলে মনে করি না। আধুনিক ইউরোপ এর নিদর্শন নীট্শে। অন্ততপক্ষে প্রাচ্যবাসীর চোখে তাঁর জীবন ও কর্মাবলী ধর্মীয় মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে এক বিশেষ কৌতুকাবহ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তাঁর মতে, মানসিক গঠনের ব্যক্তি থেকে এ কাজ সম্পন্ন হবার সম্ভাবনা ছিল; এবং প্রাচ্যের সূফীবাদের অতীত ইতিহাসেও এ-ধরনের মনোবিকাশসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের পরিচয় যে মেলে না, তা নয়। মানুষের মধ্যে আদেশাত্মক স্বর্গীয় ভাবের অস্তিত্ব যে তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এ অন্তর্দৃষ্টিকে আমি আদেশাত্মক বলছি, কেননা, আমার মনে হয়, এর থেকে তিনি এমন একটি প্রেরণাধর্মী মনোভাব লাভ করেছিলেন যা অনুভূতিকে চিরস্থায়ী জীবনশক্তিতে রূপান্তরিত করবার ক্ষমতা রাখে। তবুও নীট্শের জীবন-সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এর কারণ, শোপেনহাওয়ার, ডারউইন, ল্যাঞ্জ প্রমুখ পূর্বসূরীর প্রভাব তাঁকে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির মর্ম সম্বন্ধে অন্ধ করে তুলেছিল। দুনিয়ায় এমন আধ্যাত্মিক বিধান প্রবর্তিত হোক যার ফলে গণজীবনেও স্বর্গীয় সত্তার স্ফুরণ হয়ে তার সামনে অনন্ত ভবিষ্যতের দুয়ার খুলে দেবে-এর জন্যে প্রত্যাশা না করে নীট্শে চেয়েছেন যে, অভিজাত সমাজের পরিপূর্ণ সংস্কারের ভিতর দিয়ে তাঁর আশার উপলব্ধি ঘটবে। অন্যত্র আমি তাঁর সম্বন্ধে বলেছি :

যে 'অহমের' তিনি ছিলেন সন্ধানী-

দর্শনের তা' অতীত, জ্ঞানের সে অতীত।
মানব-হৃদয়ের একান্ত অগোচর ভূমি হতে
বেড়ে ওঠে যে বৃক্ষ শিশু,
শুধু একতাল কাদায় তার অঙ্কুরণ অসম্ভব।

একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির সাধনা এমনভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল এই জন্যে যে, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি কেবল তাঁর অন্তরের শক্তি দিয়েই পুষ্ট ছিল, তাঁর আধ্যাত্ম জীবন বাইরের কোন নির্দেশ পায়নি। অদৃষ্টের পরিহাস এমনই যে, যে-ব্যক্তি তাঁর বন্ধুদের বিবেচনায় 'এমন এক দেশ থেকে এসেছেন যেখানে কোন মানুষ বাস করেনি', তিনি নিজে নিজ আধ্যাত্মিক অভাববোধের প্রতি ছিলেন সম্পূর্ণ সজাগ। তিনি বলেছেন :

> একটি বিশাল সমস্যার সম্মুখে আমি একক দাঁড়িয়ে; মনে হচ্ছে যেন একটি দিগন্ত বিস্তৃত আদিম অরণ্যে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমি চাই সহায়তা, আমি চাই শিষ, আমি চাই উস্তাদ। আদেশ পালনে যে কি প্রশান্তিই পেতে পারতাম!

আবার তিনি বলেছেন :

> আমার চেয়ে বেশী দেখতে পেয়েছেন, এবং নিচের দিকে চেয়ে তবে আমাকে দেখতে হয়,-এমন কাউকে কেন জীবিত মানব-সমাজে দেখতে পাচ্ছিনে? আমার কি আজও ভাল করে খুঁজে দেখা হয়নি বলে? অথচ কত অসীম আগ্রহে আমি অমন একজনকে খুঁজে ফিরছি।

প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমের পন্থা আলাদা হলেও শেষ উদ্দেশ্য অভিন্ন। দুয়েরই প্রচেষ্টা পরমতম সত্যের আবিষ্কারে নিয়োজিত। বস্তুত, বিশিষ্ট কারণে যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে- পরম সত্যের আবিষ্কারে বিজ্ঞানের চেয়ে ধর্ম অনেক বেশী আগ্রহশীল হতে বাধ্য। দুয়েরই অভীষ্টাসিদ্ধির পথ অভিজ্ঞতার পবিত্রতা সাধনের ভিতর দিয়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার দু'টি বিশিষ্ট রূপ আমাদের অনুধাবন করতে হবে। সত্য সাধারণ মানুষের কাছে যেভাবে প্রকাশ পায় তাকে অভিজ্ঞতার প্রাকৃতিক রূপ বলা চলে। সত্যের অন্তর্নিহিত রূপ প্রতিভাত হয় অভিজ্ঞতার গভীরতম প্রদেশে। প্রাকৃতিক রূপের ব্যাখ্যা করতে হবে মনস্তাত্ত্বিক বা শরীরতাত্ত্বিক পূর্ব ইতিহাসের আলোকে; কিন্তু অন্তর্নিহিত রূপের ব্যাখ্যায় চাই সম্পূর্ণ আলাদা মাপকাঠি। বিজ্ঞান-জগতে সত্যের বাহ্যিক আচরণই প্রধান; ধর্ম-জগতে ঘটনাকে দেখতে হবে কোন সত্যের প্রতিভূ রূপে এবং এর অর্থ আবিষ্কার করতে হবে সেই সত্যের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। এ আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে, বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মীয় কার্যক্রম পরস্পর সমান্তরাল। আসলে এ-দুই একই জগৎ বর্ণনায় দু'টি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ। পার্থক্য এইমাত্র যে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সত্তাকে নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতে হয়; কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিতে সত্তা নিজ প্রতিযোগী বৃত্তিদের সমতা সাধন করে এমন একটি সাধারণ ক্ষেত্র

রচনা করে যাতে তার অভিজ্ঞতাবলী একটি সামগ্রিকরূপে প্রতিভাত হয়। এই দু'টি সম্পূরক ধারার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বিষয়ে একটু অনুধাবন করলেই বুঝতে পারা যাবে যে এরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভ্রান্তি মোচনে আন্তরিকভাবে নিয়োজিত। একটি উদাহরণ নিলে বক্তব্যটি পরিষ্কার হবে। নিমিত্ত সম্বন্ধে আমাদের ধারণার সমালোচনায় হিউম যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা দর্শন শাস্ত্রের চেয়ে বিজ্ঞান ইতিহাসেরই একটি অধ্যায়রূপে স্বীকৃতি লাভে বাধ্য। তাঁর বিচার-পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের প্রাধান্য এত বেশী যে, বস্তুর বিষয়গত প্রকৃতির ধারণা তাতে সম্পূর্ণরূপে বিবর্জিত। তাঁর মতে, যেহেতু 'শক্তিবাদের' কোন ইন্দ্রিয়ানুভূত ভিত্তি নেই, সেহেতু পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানকে তার আওতা মুক্ত করতে হবে। স্পষ্টত, বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমকে ভ্রান্তিমুক্ত করে দাঁড় করাবার এ একটি আধুনিক মনোসুলভ প্রচেষ্টা-এবং এই-ই প্রথম প্রচেষ্টা।

আইনস্টাইন প্রবর্তিত বিশ্ব প্রকৃতির গাণিতিক রূপায়ণে হিউমের ভ্রান্তিমোচন প্রচেষ্টা শেষ পরিণতি লাভ করেছে, এবং তাতে হিউমীয় সিদ্ধান্তের পূর্ণ সমর্থন প্রকট হয়েছে-শক্তিবাদকে একেবারে বাদ দিয়ে। সারহিন্দীর যে মন্তব্য উপরে উদ্ধৃত হয়েছে, তা থেকে দেখা যাবে যে, ধর্মীয় মনস্তত্ত্বের বাস্তব গবেষণার ক্ষেত্রেও অনুভূতিকে বাহ্যিক প্রভাব থেকে মুক্ত করবার প্রচেষ্টা একইভাবে করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞানী আপন ক্ষেত্রে যেমন, ধর্মপন্থীও ঠিক তেমনই তাঁর নিজের ক্ষেত্রে বাস্তবদৃষ্টির প্রতি সমভাবে সজাগ। অভিজ্ঞতা-পরম্পরায় এগিয়ে যাবার বেলায় তাঁর ভূমিকা শুধুমাত্র দর্শকের নয়, অবস্থিতির বিশিষ্ট ক্ষেত্রোপযোগী রীতি অনুসারে অভিজ্ঞতাকে যাচাই করে চলাও তাঁর সাধনার অঙ্গীভূত। পূর্ণ বাস্তবের পথে এভাবেই তাঁকে এগিয়ে চলতে হয় এবং এগিয়ে চলার পথে ক্রমশ মনস্তাত্ত্বিক ও শরীরতাত্ত্বিক প্রভাবাবলী থেকে আত্মশুদ্ধিই তাঁর প্রধানতম কাজ। এর পূর্ণ পরিণতির লাভ হয় একটি চিরন্তন, মৌলিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত জীবনী শক্তির সাথে নিকট পরিচয়। সত্তার চিরকালীন রহস্য এই যে, এই চরমতম সত্যদৃষ্টি লাভের সাথে সাথেই সে পরম সত্তাকে তার নিজ অস্তিত্বের মূলে বিরাজমান দেখতে পায়। অবশ্য এ অনুভূতি কোনরকম রহস্যাবৃত নয়। এমন কি, এর মধ্যে ভাবাবেগেরও কিছু নেই। অন্ত তপক্ষে মুসলিম সূফীবাদের রীতি-নীতি সম্বন্ধে একথা বিশেষ করে বলা যায় যে, এ অভিজ্ঞতাকে পূর্ণভাবে ভাবাবেগ মুক্ত রাখবার জন্যে আরাধনা-অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্রের সহায়তা গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং নির্জন ধ্যান-ধারণার কোনরূপ সামাজিক প্রতিক্রিয়া যাতে না আসতে পারে-সেই উদ্দেশ্যে দৈনিক সমষ্টিগত উপাসনার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এভাবে লব্ধ অভিজ্ঞতায় অপ্রাকৃতিক কিছু থাকতে পারে না। মানব সত্তা এভাবে তার প্রতিফলিত রূপের বন্ধন ছড়িয়ে এবং তার ক্ষণস্থায়িত্বকে অতিক্রম করে চিরন্তনে উপনীত হয়। এ পথের একমাত্র আশংকা এই যে, শেষ লক্ষ্যে পৌঁছবার আগে লব্ধ অভিজ্ঞতাবলীর দ্বারা মোহিত হয়ে কেউ কেউ সাধনায় শৈথিল্য অবলম্বন করতে পারেন। প্রাচ্যের সূফীতত্ত্বের ইতিহাসে এ রকম

বিপাকে নজীর অনেক রয়েছে। সারহিন্দীর সংস্কার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল এই আশংকার অপসারণ। তার আভাস পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। এর কারণ সুস্পষ্ট। ব্যক্তিসত্তার মূল উদ্দেশ্য কিছু 'দেখা' নয়, কিছু 'হওয়া'। সত্তা নিজ 'সম্ভাবনার' পথেই বাস্তবদৃষ্টিকে প্রখর করে তুলবার সুযোগ আবিষ্কার করে এবং এতেই তার মৌলিকতর 'অহং'-এর সাথে মিলন ঘটে। যার প্রমাণ কার্টেজীয় 'আমি ভাবি'-তে নয় কান্টীয় 'আমি পারি'তে পাওয়া যাবে। ব্যক্তিসত্তার চরমতম উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্ব বন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন নয়; ব্যক্তিত্ব বন্ধনের মূল প্রকৃতির স্বচ্ছতর সংজ্ঞা উদ্ভাবন। এর শেষ কথা একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ বা জীবনের ব্যবস্থাপনা মাত্র নয়, এ একটি জীবন্ত ও প্রেরণাধর্মী অনুভূতি-যা সত্তাকে আত্মদৃষ্টিতে গভীরতর প্রত্যয় দান করে এবং তার ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল করে তোলে। তার কাছে জগৎ শুধুমাত্র ধারণার মাধ্যমে দেখবার বা জানার বস্তু নয়, অবিরাম প্রচেষ্টায় গড়া, ভাঙা এবং পুনর্বার গড়ে তুলবার বিশাল ক্ষেত্র। অসীম প্রশান্তি আছে এতে এবং তার সাথে এর মধ্যে লুকিয়ে আছে ব্যক্তিসত্তার শ্রেষ্ঠতম পরীক্ষা মুহূর্ত–

তুমি কোন্ স্তরে আছ? জীবিত, মৃত, না জীবন্মৃত?
তিনজন সাক্ষীকে ডাকো তোমার স্থান-নির্দেশে।
প্রথম সাক্ষী তোমার নিজের চেতনা–
নিজেরই আলোকে নিজেকে নিরীক্ষণ করো।
দ্বিতীয় সাক্ষী অপর সত্তার চেতনা–
প্রথমে নিজ সত্তায় তোমাকে দেখ, তারপর
যে সত্তা তোমা হতে ভিন্ন
তার আলোকে বিচার করো নিজেকে।
তৃতীয় সাক্ষী আল্লাহর চেতনা–
আগে নিজ সত্তায় নিজেকে দেখ, তারপর
আল্লাহর আলোকে নিজেকে বিচার করো।
এই আলোকের সম্মুখে যদি পারো
অকম্পিত দাঁড়িয়ে থাকতে,
মনে করো নিজেকে জীবন্ত
এবং চিরন্তন তাঁরই মতো।
একমাত্র সেই ব্যক্তিই খাঁটি, যে সাহসী হয়–
সাহসী হয় আল্লাহকে সামনাসামনি দেখতে।

মি'রাজ কি? আসলে তা একজন সাক্ষীর সন্ধান মাত্র,
যে সাক্ষী জানাবে তোমার সত্তার অলংঘ্য সমর্থন–
কেবল যে সাক্ষীর সমর্থনই তোমাকে চিরন্তন স্থান দেবে।
আল্লাহর সম্মুখে অকম্প থাকতে পারে না কেউ;
–কিন্তু যে পারে সে খাঁটি সোনা।
তুমি কি একটি ধূলিকণা মাত্র?
তোমার সত্তার গ্রন্থি শক্ত করে কষো;
তোমার ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে দৃঢ় হস্তে ধরো।
কী গৌরবের–সত্তার আবর্জনা দূর করে
সূর্যরশ্মিতে তার দীপ্তি পরীক্ষা করা।
তোমার পুরোনো কাঠামোকে নতুন করে রং দাও,
নতুন অস্তিত্ব গড়ে তোলো–
সেই-ই খাঁটি অস্তিত্ব,
নয় তো তোমার সত্তা একটি ধূম্রজাল মাত্র! [জাবিদ নামা]

পরিভাষা

Absolue-স্বয়ম্ভূ, পরম সত্তা, অন্যনিরপেক্ষ।
Abstract-ভাবাত্মক।
Abyss-রসাতল।
Actuality-বাস্তবতা।
Aesthetic-সৌন্দর্যগত।
Affirmation-প্রতিষ্ঠা।
Analogy-সম্বন্ধগত সাদৃশ্য।
Analytic-বিশ্লেষণী।
Antecedent-পূর্ববর্তী।
Anthropology-নৃতত্ত্ব।
Anthropomorphic-নরত্ববাদী।
Apostolic-বাণীবাহকের মতো, নবীসুলভ।
Appreciative-অনুভাবক, কদরদানী।
Apprehension-ধারণা।
Aspect-রূপ।
Assimlative spirit-আত্মস্থকরণ ক্ষমতা।
Assumption-অনুমান।
Atheistic Socialism-নাস্তিক্যপুষ্ট সমাজবাদ।
Auto Suggestion-আত্মনির্দেশন।
Axiom-প্রত্যয়, স্বতঃসিদ্ধ।
Becoming-পরিণতিপ্রবণ, বিবর্তন।
Behaviour-চালচরিত, চলন।
Being-সত্তা।
Category-বিভাগ।
Causality-কার্যকারণ সম্বন্ধ।
Causnility-bound-কার্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ।
Cause-কারণ।

Characteristic-লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য।

Civil Contract-দেওয়ানী চুক্তি।

Cognitive-জ্ঞানাত্মক।

Compactness-ঘনত্ব।

Concept-ধারণা, প্রত্যয়।

Concept of force-শক্তিবাদ।

Concret-মূর্তবস্তু।

Congregation-জামাত।

Conjecture-অনুমান।

Consciousness-চেতনা, চৈতন্য।

Content-উপাদান, ভিত্তি।

Continuity-ধারাবাহিকতা।

Convention-প্রথাসিদ্ধ ধারণা, রেওয়াজ।

Cosmic-বিশ্বময়।

Cosmological-বিশ্ববাদী, শৃঙ্খলাবাদী।

Critical faculty-বিচার-বৃত্তি।

Cryptic-নিগূঢ়।

Data-তথ্য।

Deeper Self-গভীর আত্মন।

Deflection-বিক্ষেপ।

Dialectios-দ্বন্দ্ব সমন্বয়বাদ।

Directive energy-নির্দেশমূলক শক্তি।

Divine-ঐশী, খোদায়ী।

Divine knowledge-ঐশীজ্ঞান, দিব্যজ্ঞান।

Doctors of Law-বিধানাচার্যগণ, আইনবেত্তাগণ।

Doctrine of Eternal Recurrence-চিরন্তন পৌনঃপুনিকতাবাদ।

Doctrinal-মতবাদমূলক।

Dogmatic Slumber-শাস্ত্রবুলির মৌতাত।

Dual Character-দ্বৈতধর্মিতা।

Dualism-দ্বৈতবাদ।

Dualistic-দ্বৈতরূপী

Duration-অবস্থিতি, অবস্থিতির মেয়াদ।
Dynamic-গতিশীল।
Ego-খুদী, অহং।
Emblematic-নিদর্শনাত্মক।
Emergent Evolution-অভাবিত-পূর্ব বিবর্তন।
Emotional-আবেগময়।
Empirical-প্রত্যক্ষবাদী, অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক, ব্যবহারিক।
Empirical Science-ফলিত বিজ্ঞান।
Energy-শক্তি।
Entity-সত্তা।
Eternal-অবিনশ্বর, চিরন্তন, শাশ্বত।
Eghics-নীতিশাস্ত্র।
Extensive-প্রসারধর্মী।
Faith-ঈমান, বিশ্বাস।
Fallacy-অপসিদ্ধান্ত।
Fatalism-অদৃষ্টবাদ।
Ifnality-অবসান, চরমতা, চূড়ান্ততা।
Finite-সসীম।
Finite Centre of experience-অনুভূতির সীমিত কেন্দ্রস্থল।
Finitude-সসীমতা।
Fixity-স্থিরতা।
Focal-কেন্দ্রিক।
Free Personality-মুক্ত ব্যক্তিত্ব, মুক্ত সত্তা।
Generalization-সামান্যীকরণ।
Hyper-space-অতি দেশ।
Hypothesis-প্রকল্প, অনুমান।
Idea-ভাব, চিন্তা।
Ideal-আদর্শ।
Idealistic-আদর্শবাদী, ভাববাদী।
Illumination-দীপন।
Immanent-সর্বব্যাপী, প্রতিভাত।

Immortality-অমরত্ব।
Import-তাৎপর্য।
Impulse-তাড়না।
Individuality-ব্যক্তিত্ব।
Inferencial-অনুমানাত্মক।
Infinite-অসীম।
Infinitesimal-অবিভাজ্য সূক্ষ্ম মাত্রা।
Instinct-সহজাতবৃত্তি।
Intellect-বুদ্ধিবৃত্তি।
Intellectual-বুদ্ধিগত।
Interaction-প্রতিক্রিয়া।
Intuition-স্বজ্ঞা।
Islamic Theory of Salvation-ইসলামী মুক্তিতত্ত্ব।
Judgement-রায়, সিদ্ধান্ত।
Legal code-আইন-কানুন।
Legend-উপাখ্যান।
Legist-আইনবেত্তা।
Life-value-জীবনগত মূল্য।
Logic-যুক্তি, ন্যায়।
Logical-যুক্তিগত।
Magnitude-আয়তন।
Materialism-জড়বাদ, বস্তুবাদ।
Materiality-জড়ত্ব।
Meliorism-উন্নতিবাদ।
Metaphysical-প্রজ্ঞামুখী, প্রাজ্ঞানিক।
Metaphysics-তত্ত্বদর্শন, অধিবিদ্যা।
Molecular-আণবিক।
Monadistic Idealism-নিরবয়ববাদ।
Multiplicity-বহুত্ব।
Mystic-মরমী, সূফী।
Mysticism-মরমীবাদ, সূফীবাদ।

Naturalism-প্রকৃতিবাদ।
Negative-নেতিবাচক।
Niche-প্রতিমাধার, কুলুঙ্গী।
Numerical-সংখ্যাগত।
Object-বিষয়।
Objective-বাস্তব, বিষয়গত।
Observation-নিরীক্ষা।
Occult-গূঢ়।
Ontological- তত্ত্ববাদী।
Optics-অক্ষি বিজ্ঞান।
Optimism-আশাবাদ।
Organic-জৈবিক।
Organic whole-জৈবিক সমগ্র।
Organism-জীবদেহ, জীব।
Pantheism-অদ্বৈতবাদ।
Paradox-স্ববিরোধী কল্পনা।
Parallelism-সমান্তরালবাদ।
Passion-আবেগ।
Perpendicular-লম্ব।
Personal authority-ব্যক্তিগত মাহাত্ম্য।
Pessimism-নৈরাশ্যবাদ, দুঃখবাদ।
Phallic symbol-লিঙ্গবাদের প্রতীক।
Phantasy-অবাস্তব কল্পনা।
Phases-রূপ।
Phenomena-ঘটনা, দৃশ্যমান বস্তু, ব্যাপার।
Physics-পদার্থ।
Physiology-শরীরতত্ত্ব।
Postulate-স্বীকার্য, প্রতিজ্ঞা।
Potency-শক্তি।
Pragmatic-প্রায়োগিক, ফলবাদী।
Productive-উপাদানমূলক।

Prophethood-নবুয়ত।
Prophetic-নবীসুলভ।
Prophetic revelation-প্রত্যাদিষ্ট বাণী।
Property-ধর্ম।
Proportion-অনুপাত।
Psychic-আত্মিক।
Psychological-মনস্তাত্ত্বিক।
Pshychology-মনস্তত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান।
Pshychopath-মনোবিকারগ্রস্ত- ব্যক্তি।
Qualitavtive-গুণাত্মক।
Rational-যুক্তিসম্মত।
Rationaslism-যুক্তিবাদ।
Rationalist-যুক্তিবাদী।
Reality-সত্য, সত্তা, বাস্তব সত্তা।
Reason-যুক্তি।
Reflection-প্রতিফলন।
Relational-সম্পর্কমূলক।
Reproduction-প্রজনন।
Resurrection-পুনরুত্থান।
Revelation-ওহী, প্রত্যাদেশ, অভিব্যক্তি।
Reversible-পরিবর্তনযোগ্য।
Scepticism-সংশয়বাদ।
Scholastic-যুক্তিবাদী।
Scientific Specialism-বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যবাদ।
Selective-নির্বাচনমূলক।
Self-খুদী।
Self-existing-স্বয়ংজীবী।
Self-subsistant-স্বয়ংজীবী।
Sensation-ইন্দ্রিয় সংবেদন।
Sense-perception-ইন্দ্রিয়ানুভূতি।
Serial time-আনুক্রমিক কাল।

Sex imager-যৌন প্রতীক।
Solidarity-ঘনত্ব।
Soul-substance-আত্মা-বস্তু।
Space-স্থান, দেশ।
Spatial-স্থানিক, দৈশিক।
Spatial aspect-অবস্থিতিমূলক রূপ।
Speculation-জল্পনা।
Spiritualism-আধ্যাত্মবাদ।
Static-স্থিতিশীল।
Stimulus-সংবেদক, প্রণোদক উপাদান।
Subconscious-অবচেতন।
Subject-জ্ঞাতা, বিষয়ী।
Subliminal-অবচেতন।
Subliminal self-অব্যক্ত অহং।
Succession-পারম্পর্য।
Superman-অতিমানব।
Supernatural-অতিপ্রাকৃতিক।
Symbol-প্রতীক।
Symbolic-প্রতীকধর্মী।
Systematisation-প্রণালীবদ্ধকরণ, বিধিবদ্ধকরণ।
Teleological-উদ্দেশ্যবাদী।
Temporal-অনিত্য, পার্থিব।
Terminology-পরিভাষা।
Theological-ধর্মতাত্ত্বিক।
Theoretical-সিদ্ধান্তমূলক।
Theory of Evolution-ক্রমবিকাশবাদ, বিবর্তনবাদ।
Theory of relativity-আপেক্ষিকতাবাদ।
Theorization-তত্ত্বীকরণ।
Totality-সমগ্রতা।
Trance-ভাবমত্ত অবস্থা।
Trancendence-বিশ্বাতীত অস্তিত্ব।

Trancendent-ইন্দ্রিয়াতীত।
Transmissive-বহনকারী।
Trust-আমানত।
Ultimate ego-পরম খুদী।
Ultimate reality-পরম সত্তা, চরম সত্য।
Unitary-অখণ্ড।
Utilitarian-হিতবাদী।
Vagrant-অস্থির।
Validity - বৈধতা।
Velocity-বেগ।
Void-অবকাশ।
Volition-ইচ্ছা।
World life-জগৎ-জীবন।

IQBAL ACADEMY PAKISTAN Library 29703 LAHORE

আল্লামা ইকবাল সংসদ

00029703

8U1